"নারীর অবস্থার উন্নয়নে ধর্মের ভূমিকা"

THE ROLE OF RELIGION IN THE DEVELOPMENT OF WOMEN

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,

গবেষক

উম্মে হাবিবা বেগম
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
রেজিঃ নং ও শিক্ষাবর্ষঃ ৩৩/১৯৯৬-৯৭ইং।

Dhaka University Institutional Repository

بسم الله الرحمن الرحيم

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী, আল্লাহ্ তায়ালার সবচেয়ে প্রিয় হাবীব,

সর্বশেষ নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম যাঁর পদযুগলের নীচে আমার জান্নাত বলেছেন,

নারী জাতির আদর্শ, আমার প্রথম শিক্ষিকা,

সেই স্নেহময়ী, মায়াময়ী, শ্রদ্ধাভাজন

আমার জান্নাবাসিনী

"মা"

যাঁর সকল মেহনতই ছিল আল্লাহর জন্য।

তার রূহের মাগফিরাতেই

নিবেদন করছি

আমার এ সামান্য হাদিয়া।

436739

Dhaka University Institutional Repository

“নারীর অবস্থার উন্নয়নে ধর্মের ভূমিকা”

THE ROLE OF RELIGION IN THE DEVELOPMENT OF WOMEN

436739

Dhaka University Institutional Repository

<u>ঘোষণাপত্র</u>

এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, **"নারীর অবস্থার উন্নয়নে ধর্মের ভূমিকা"** শীর্ষক এম. ফিল. অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব একক গবেষণা কর্ম। আমার বর্তমান এই অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুর পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও আমি প্রকাশ করিনি।

উম্মে হাবিবা বেগম
০৫/০৫/২০০৮

(উম্মে হাবিবা বেগম)
এম. ফিল. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
রেজিষ্ট্রেশন নং ও শিক্ষাবর্ষঃ ৩৩/১৯৯৬-৯৭ইং।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৯৬৬১৯২০-৭৩/৬২৯০, ৬২৯১

DEPARTMENT OF ISLAMIC STUDIES
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-1000, BANGLADESH
Phone : 9661920-73/6290, 6291

স্মারক নং............................

Date 05-05-08 ....200৮

"প্রত্যয়ন পত্র"

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচেছ যে, উম্মে হাবিবা বেগম নিবন্ধন নং-৩৩/১৯৯৬-৯৭ইং কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত **"নারীর অবস্থার উন্নয়নে ধর্মের ভূমিকা"** শীর্ষক গবেষণা সন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় লিখিত হয়েছে। এটি তার সম্পূর্ণরূপে একক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে, ইতোপূর্বে কোথাও এই শিরোনামে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি।

আমি এই অভিসন্দর্ভটি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের নিমিত্তে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী
প্রফেসর,
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আল্হামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা মহা-পরাক্রমশালী, মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য। **"নারীর অবস্থার উন্নয়নে ধর্মের ভূমিকা"** শীর্ষক গবেষণা কর্মটি একটি যুগোপযোগী গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছি। অধুনা নারী স্বাধীনতার সোচ্চার দাবী উঠেছে। পাশ্চাত্যে নারী স্বাধীতনতার আন্দোলন নারী বাদে রূপান্তরিত হয়েছে। জাতিসংঘ ৮ মার্চ বিশ্বনারী দিবস ঘোষণা করেছে। বিশ্বের নারী সংগঠন সমূহ নারী মুক্তির দাবী নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা দিচ্ছে।

সত্যি সত্যি নারী সমাজ কি মুক্তির অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁচেছে? অনেক গবেষকদের ধারণা নারী মুক্তির নামে এক উৎকট পুরুষবাদীতা অধুনা নারীবাদীদের তাড়িত করছে। মনে হচ্ছে উগ্র নারী সংগঠনসমূহ যা কিছুই পুরুষরা করে তা স্বাধীনভাবে করতে পারার মধ্যেই নারী স্বাধীনতা খুঁজে বেড়াচ্ছে। পাশ্চাত্যের দেশসমূহ এক ধরণের লক্ষ্য বিহীন ব্যক্তি স্বাধীনতার মোড়কে নারী স্বাধীনতার বিকাশ ঘটাতে গিয়ে পরিবার প্রথাকে হুমকীর সম্মুখীন করে তুলছে।

তথাপি প্রশ্ন থেকে যায়, অতীত ইতিহাসে অথবা আমাদের সময়কালে নারী জাতি কি তাদের অধিকার ভোগ করতে পেরেছে? এককালে খ্রীস্টান দুনিয়ার নারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে পুরুষের শত্রু হিসেবে। নারীকে বলা হয়েছে, ডায়নী কিংবা মানুষের চেয়ে নিম্মস্তর একটি প্রজাতি বিশেষ। হিন্দু সামাজে নারীকে বলা হয়েছে শুদ্রাণী। হিন্দু শাস্ত্রকার মনুর মতে শিশু, উম্মাদ এবং নারী এ তিনের কোন স্বাধীনতা কিংবা সম্পদের মালিক হওয়ার অধিকার থাকতে পারে না। এভাবে বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীকে তার সকল অধিকার হতে বঞ্চিত করে তাকে জীব-জন্তুর ন্যায় ক্রয়-বিক্রয় করা হয়েছে। তাকে পাপ-পঙ্কিলতার উৎস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নারীর অর্ন্তর্ণিহিত ও গুনরাজির বিকাশের কোন সুযোগ-সুবিধা তাকে প্রদানকরা হয় নাই।

জগতের বিভিন্ন ধর্ম ও জড়বাদী সভ্যতা নারী জাতির উপর পাপ ও অপবিত্রতার যেই কলঙ্ক লেপন করেছে, ইসলাম এক প্রচন্ড আঘাতে উহা মোচন করে দিয়েছে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলাম ঘোষণা করে, নারী ও পুরুষ একই উৎস হতে উদ্ভূত। এখানে পুরুষেরযতটুকু অধিকার দেয়া হয়েছে, ততটুকু অধিকার দেয়া হয়েছে নারীকেও । ইসলাম ধর্মই প্রথম নারী জাতির অবস্থার উন্নয়নের রোডম্যাপ ঘোষণা করে। "নারীকে পরুষের অর্ধাঙ্গিনী" আখ্যায়িত করে সম্মানিত করা হয়েছে। তাঁকে পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারিণী করলেন, নারীকে মর্যাদা দিলেন জননী, দুহিতা, সহোদরা, সহধর্মিনী রূপে। শোনালেন শান্তির অমোঘ বাণী-"মায়ের পদপ্রান্তে বেহেশ্‌ত।"

এভাবে ইসলাম নারী জাতিকে ফিরিয়ে দিয়েছে তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা। আর আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস দিয়ে চেষ্টা করেছি তা লিখার মাধ্যমে তুলে ধরতে। অভিসন্দর্ভটির স্বচ্ছতা আনয়নে এবং তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশনে আন্তরিক চেষ্টা করেছি।

এছাড়া সন্দর্ভটি রচনা ও তথ্য বহুল করেত বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত সংকলন, স্মরণিকা, সাময়িকী, বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ধ, গ্রন্থ, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, হাদীস সংকলন, কুরআন

Dhaka University Institutional Repository

শরীফ ও এর অনুবাদ গ্রন্থের সহযোগীতা গ্রহণ করেছি। বিশেষ করে আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়কের নিকট থেকে বহু তত্ত্ব, তথ্য এবং দিক নির্দেশনা পেয়েছি।

অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি সর্বপ্রথম আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী স্যারের প্রতি, যিনি অভিসন্দর্ভটি সমৃদ্ধ করে তুলতে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাদান সরবরাহ করেছেন এবং গবেষণার নিয়ম-পদ্ধতি ও দিকনির্দেশনা দিয়ে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তিনি সম্পূর্ণ অভিসন্দর্ভটি পাঠ করে প্রয়োজনীয় ভুল-ত্রুটি সংশোধন করেছেন এবং কোথাও সংযোজন ও সংকোচন করে এর পরিশুদ্ধি ও সৌন্দর্য বর্ধন করেছেন। আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি আরো যে সব শিক্ষক মন্ডলীর কাছ থেকে বিভিন্ন পরামর্শ ও সহযোগীতা পেয়েছি তাদের মধ্যে ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতীফ, প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ড. মোঃ রুহুল আমীন, প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ড. মোঃ শামছুল আলম, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাঃ বিঃ। মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন, সহঃ অধ্যাপক ইসলামি স্টাডিজ বিভাগ, ঢাঃ বিঃ, ড. মাহ্মূদুল হাসান ইউসুফ, প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ এন্ড দ'ওয়াহ্, ধর্ম বিজ্ঞান অনুষদ, দারুল ইহ্সান বিশ্ববিদ্যালয়, মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, সহঃ অধ্যাপক, আরবী ভাষা ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, মোঃ কামরুল হাসান চৌধুরী, পরিবহন কর্মকর্তা ঢাঃবিঃ, অধ্যাপক ডি, এম, ফারুক (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ) ফাতেমা মতিন মহিলা ডিগ্রী মহাবিদ্যালয়, মোঃ ফারুক, সহঃঅধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, ফা, ম, ম,কলেজ, ড. মোঃ সালেহ্ উদ্দীন, সহঃ অধ্যাপক, ইসলাম শিক্ষা বিভাগ, আ, ফ, ম, খোরশেদ আলম, প্রভাষক, ভুগোল বিভাগ, ফাতেমা মতিন মহিলা ডিগ্রী মহাবিদ্যালয় প্রমূখ অন্যতম। এছাড়া ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অন্যান্য শিক্ষক মন্ডলী যাঁদের কাছ থেকে আমি যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করেছি। তাঁদের প্রতিও রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

এছাড়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এম, ফিল, শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা ও সহকর্মীবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সহকর্মীবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গ্রন্থাগার সহকারী, বিভাগীয় অফিস কর্মকর্তা ও সহকারীদের প্রতি যাঁরা আমাকে প্রয়োজনী বই পত্র সরবরাহ করে এবং অন্যান্য সহযোগীতা দিয়ে আমার অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছেন।

পরিশেষে আমি মহান আল্লাহর নিকট আবারও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে সার্থক করেছেন। হে আল্লাহ আমার এই সাধনাকে কবুল করুন। আমীন।

বিনয়াবনত

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্ধর্ভে অনুসৃত আরবী বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণনায়ন

আরবী	বাংলা	আরবী	বাংলা	আরবী	বাংলা
أَ	আ/া	ر	র	ف	ফ
إِ	ই/ি	ز	য	ق	ক্ব
أُ	উ/ু	س	স	ك	ক
ب	ব	ش	শ	ل	ল
ت	ত	ص	স	م	ম
ث	ছ/স	ض	দ	ن	ন
ج	জ	ط	ত	و	ওয়া
ح	হ	ظ	য	ه	হ
خ	খ	ع	‘	ء	’
د	দ	غ	গ	ي	ইয়া/ইয়ে
ذ	য				

পূর্ণ শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যবহার

পূর্ণ শব্দ	সংক্ষিপ্ত চিহ্ন
রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু/আনহুম/আনহা	রা. / রাযি.
রহমতুল্লাহ আলাইহ্	রহ:/ র.
আলাইহি ওয়াসাল্লাম	আঃ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	স. / সঃ / (সাঃ)
মৃত্যু	মৃ.
জন্ম	জ.
ডক্টর	ড.
হিজরী	হি.
অবসর প্রাপ্ত	অব.
সম্পাদক/সম্পাদিত	সম্পা.
অনুবাদক/ অনূদিত	অনু./ অনুঃ
পৃষ্ঠা	পৃ. / পৃঃ/ Page-p. / Pages-p.p
খন্ড	খ.
খ্রীস্টাব্দ	খ্রীঃ
ইংজেরী	ইং
সংস্করণ	সং.
হাদীস	হা.
নম্বর	নং

Dhaka University Institutional Repository

"সূচীপত্র"

		পৃষ্ঠা
আমার কিছু কথা		১
প্রথম অধ্যায়ঃ ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীর স্থান ও মর্যাদা		**৫-৩১**
প্রথম পরিচ্ছেদ		
উপক্রমণিকা	ঃ	৫
বিভিন্ন সভ্যতায় নারী	ঃ	৫
গ্রীক সভ্যতায়	ঃ	৫
রোম সভ্যতায়	ঃ	৭
চীন সভ্যতায়	ঃ	৮
ভারতীয় সভ্যতায়	ঃ	৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ বিভিন্ন ধর্মে নারী		
সনাতন ধর্মে নারী	ঃ	১২
বৌদ্ধ ধর্মে নারী	ঃ	১৫
ইয়াহুদী ধর্মে নারী	ঃ	১৭
পারসিক ধর্মে নারী	ঃ	২০
খ্রীস্ট ধর্মে নারী	ঃ	২২
তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ আরবে নারীদের অবস্থা	ঃ	২৮
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ইসলাম ধর্মে নারীর স্থান		**৩২-৯৫**
প্রথম পরিচ্ছেদ		
নারী অবস্থার উন্নয়নে ইসলাম ধর্মের ভূমিকা	ঃ	৩২
জীবনের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী	ঃ	৩৭
ইসলামে মানবতার সাম্য	ঃ	৩৮
ইসলামে নারী-পুরুষের সাম্য	ঃ	৩৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ বিভিন্ন রূপে নারী		
ইসলামে দুহিতারূপে নারী	ঃ	৪১
ইসলামে বোনের মর্যাদা	ঃ	৪৭
ইসলামে মায়ের মর্যাদা	ঃ	৪৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ পারিবারিক জীবন	ঃ	৬০
ইসলামে স্ত্রী (সহধর্মিণী) হিসেবে নারী	ঃ	৬২
স্ত্রীদের উপর জুলুম অত্যাচার নিষেধ	ঃ	৬৯

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রীদের অপ্রস্তুত অবস্থায় না ফেলার তাগিদ	ঃ	৭৪
স্বামী-স্ত্রীর পারসম্পরিক উপহার বিনিময়	ঃ	৭৬
স্ত্রীদের অধিকারের গুরুত্ব প্রদান	ঃ	৭৮
স্ত্রীর বিপদে সহানুভূতি প্রদর্শণ	ঃ	৮০
স্বামী-স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ না করা	ঃ	৮২
স্ত্রীর খোরপোষ সরবরাহের দায়িত্ব স্বামীর	ঃ	৮৪
নারী প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখার নির্দেশ	ঃ	৮৮
গুরুতর বিষয়ে স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ	ঃ	৮৯
স্ত্রীর ঘরের রাণী	ঃ	৯১
স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর অধিকার	ঃ	৯৩
তৃতীয় অধ্যায়ঃ ইসলামে বিবাহ		**৯৬-১৪১**
প্রথম পরিচ্ছেদ		
ইসলামে নারীর বিবাহের অধিকার	ঃ	৯৬
ইসলামে বিবাহের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব	ঃ	১০০
বিবাহের ক্ষেত্রে ইসলামে নারীর আর্থিক সঙ্গতির দায়মুক্তি	ঃ	১০২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ বিভিন্ন ধর্মে বিবাহ প্রথা	ঃ	১০৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ইসলামে বিবাহের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধনারী	ঃ	১০৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ বিয়েতে প্রস্তাবের ক্ষেত্রে নারীর স্বাধীনতা	ঃ	১০৯
বিয়েতে প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব নিষিদ্ধ	ঃ	১১১
নিজ বিবাহের উদ্দেশ্যে অপরের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানো নিষিদ্ধ	ঃ	১১২
বিয়েতে পূর্বে পাত্র-পাত্রী দেখা	ঃ	১১৩
বিয়ের মতামত জ্ঞাপনের অধিকার	ঃ	১১৫
অভিভাবকের অভিমতের গুরুত্ব	ঃ	১১৮
বিয়েতে মোহর পাওয়ার অধিকার	ঃ	১১৯
একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে সমতাবিধানের অধিকার	ঃ	১২২
স্বামীর একাধিক বিবাহে স্ত্রীর বাধাদানের অধিকার	ঃ	১২৬
স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ না করার শর্ত সম্পর্কে স্ত্রীর অধিকার	ঃ	১২৭
সঠিক পন্থায় যৌন মিলনের দাবিপূরণসহ সন্তান লাভের অধিকার	ঃ	১২৮
বৈধ উপায়ে সঙ্গম লাভের অধিকার	ঃ	১৩০
পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ	ঃ	
তালাক প্রাপ্তি ও প্রদানের অধিকার	ঃ	১৩২

Dhaka University Institutional Repository

অনিয়মে তালাকের শাস্তি ঃ ১৩৮

তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ঃ ১৩৮

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ ঃ

কন্যা বা পুত্র সন্তান জন্মের ব্যাপারে ইসলামে নারীর দায় মুক্তি ঃ ১৩৯

চতুর্থ অধ্যায়ঃ সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকান্ড ১৪২-১৭৪

প্রথম পরিচ্ছেদঃ

নারীর ধর্ম পালনের অধিকার ঃ ১৪২

ইসলামী বিপ্লবে নারীর অংশ গ্রহণের সুযোগ ঃ ১৪৪

জেহাদের ব্যাপারে সমতা ঃ ১৪৮

স্বাধীন মত প্রকাশ ও পরামর্শ দানের অধিকার ঃ ১৫০

নারীর মানসিক অধিকার ঃ ১৫৩

নারীর শিক্ষার অধিকার ঃ ১৫৫

ইসলামে নারীর সামাজিক মর্যদা ঃ ১৫৯

জীবন ব্যবস্থা ও আইনের অভিন্নতা ঃ ১৬২

কর্মক্ষেত্রে নারী ঃ ১৬৩

মহিলাদের স্বতন্ত্র সংগঠন করার অধিকার ঃ ১৬৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ উত্তরাধিকারের পার্থক্য এবং নারীর স্থান ঃ ১৬৭

ইসলামে নারীর মালিকানা অধিকারের মর্যদা ঃ ১৭৩

পঞ্চম অধ্যায়ঃ নারীর পর্দা বা হিজাব ১৭৫-২০১

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামে নারীর শালীনতা ও সম্ভ্রম সংরক্ষণের অধিকার ঃ ১৭৫

নারী শালীনতা সংরক্ষণে ইসলামী ব্যবস্থা (হিজাব) ঃ ১৭৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ইসলামে নারীর সতীত্বের মর্যাদা ঃ ১৭৮

উপসংহার ঃ ২০২

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ২০৩-২০৮

Dhaka University Institutional Repository

আমার কিছু কথা

"সীমাহীন প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যার মেহেরবাণীতে তার রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি যিনি হেদায়াত ও কল্যাণময় পথে নেতৃত্ব নিয়েছে। তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাবাবৃন্দ এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত যত মানুষ তাঁকে অনুসরণ করবে তাঁদের প্রত্যেকের উপর বর্ষিত হোক রহমত-বরকত ও শান্তির অফুরন্ত ধারা"

মানব জাতির অর্ধেক হলো নর আর অর্ধেক নারী। দুই অর্ধেক মিলে মানব সমাজ পূর্ণ হয়। ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে ও তা ঠিক। নর ও নারী একে অপরের পরিপূরক। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে একথা সত্য। বিশেষ করে একটি জাতির উন্নতির গোড়াতেই হলো নারী।

কিন্তু নারীর এ গুরুত্বপূর্ন ভূমিকার স্বীকৃতি পুরুষরা অনেক সময় দেননি। ইতিহাসে নারীর সামাজিক মর্যাদায় প্রচুর উত্থান-পতন লক্ষ্য করা যায়। [মানব সৃষ্টির আদিম পর্যায় হতে বর্তমান পর্যায় পর্যন্ত আসতে বিভিন্ন সমাজ সভ্যতা ও বিভিন্ন ধর্মের ভূমিকা পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, নারীর অবস্থার উন্নয়নে ইসলাম ধর্মের ভূমিকাই অগ্রগণ্য।]

প্রথম পর্যায়ে নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। এ সময় নারীর উপর চলে চরম অবিচার ও অত্যাচার। অত্যাচার এতো লোমহর্ষক ছিল যে, নারীকে মানুষ আত্মাধারী প্রাণী বলে মনে করলে এমন অত্যাচার সম্ভব হতো না। সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীতে রোম নগরীতে নরসমাজ তাদের Council of the wise এর সভায় সিদ্ধান্ত করে "Women has no soul", অর্থাৎ "নারীর কোন আত্মা নেই"। তার মানে, আত্মাহীন আবর্জনাকে যেমন পুড়িয়ে ফেলা যায়, নারীকেও তা করা যায়। ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে দোষী নারীকে অগ্নিদগ্ধ করা আইন সঙ্গত করা হয়। এর ফলে খ্রিষ্টান জগত তাদের নব্বই লক্ষ নারীকে আগুনে পুড়িয়ে বিচার করে।

গ্রীক সমাজে নারীর অবস্থা সক্রেটিসের কথায় ফুটে উঠে। তাঁর ভাষায় নারী হলো জগতে বিশৃংখল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। চীন সভ্যতায় নারীকে Waters of Woe বা "দুঃখের প্রস্রবণ" বলা হতো। নারী ছিল স্বামীর পরিবারের সম্পত্তি। সুতরাং, স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে অন্যের উপপত্নী হিসেবে বিক্রয় করতে পারতো।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতেও নারীর অবস্থা ভাল ছিল না। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে পুড়ে মরতে হতো। মোটকথা, গোটা বিশ্বেই নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। নারী ছিল কাজের দাসী আর ভোগের বস্তু। প্রয়োজনে কাজ নেওয়া যায়, ভোগ করা যায়। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া যায়, অথবা আবর্জনার মতো পুড়িয়ে ফেলা যায়।

নারীর যথাযোগ্য মর্যাদা ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মগুলো দেয়নি। কোন কোন ধর্ম নারীকে "সকল পাপের উৎস" বলে ঘোষণা করেছে। কোন কোন ধর্ম নারীর আত্মা আছে অস্বীকার করে, আবার এমন ধর্মও আছে যা নারীকে মানুষ বলে বিবেচনা করতেও অনিচ্ছুক। খ্রিস্টানদের বাইবেল, ইহুদীদের তৌরাত, বৌদ্ধদের ত্রিপিটক, পারসিকদের জিন্দাবেস্তা, শিখদের গ্রন্থসাহেব আর হিন্দুদের বেদঋগবেদ যা গীতার কোথাও নারীদের অধিকার ও মর্যাদা সংক্রান্ত কোন আইনবিধির অস্তিত্ব নেই। এমন কি নারীদের মর্যাদা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোন আলোচনা পর্যন্ত নেই। এর পরিবর্তে নারী নির্যাতন ও নারীর অবমাননা এবং লাঞ্ছনার অনেক লোমহর্ষক কাহিনী, অথবা যৌন ব্যভিচারের অশ্লীল আলোচনাই পরিলক্ষিত হয়। এভাবে আধুনিক পুঁজিবাদ, সমাজবাদ বলুন বা তথাকথিত ধর্মগুলোর কথা বলুন-কোথাও নারীকে তার স্বাভাবিক অধিকার ও মর্যাদা দেয়া হয়নি।

নারীর যথাযোগ্য মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে মানবতার মুক্তিদূত হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই প্রথমবার নারী জাতির পূর্ণ মানবিক অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন। আর ইসলামে সার্বজনীন বিপ্লবী আদর্শে সবার আগে বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপনের পরম সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন একজন নারী উম্মুল মো'মেনিন হযরত খাদীজাতুল কোবরা রাজীয়াল্লাহু তায়ালা আন্হা। এরপর থেকে ইসলামের গোটা ইতিহাসে মুসলিম নারী তার নিজ দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্রে বরাবরই গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে আসছে।

ইসলামী আদর্শ মোতাবেক মুসলিম পরিবার ও মুসলিম সমাজে নারীর অধিকার ও মর্যাদা এতই সুপ্রতিষ্ঠিত যে, সেখানে অমুসলিম পরিবার ও সামাজের নারীদের মতো অপমান, বঞ্চনা ও নিরাপত্তাহীনতার কথা ভাববারও অবকাশ থাকে না। তাই দেখতে পাচ্ছি যে আজ সারা বিশ্বের অমুসলিম নারী সমাজ যখন তাদের ন্যায্য অধিকারের দাবি তুলছে তখন

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম মহিলা সমাজ তাদের যথার্থ মুক্তির জন্যে ইসলামী আদর্শের পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানাচ্ছে।

নারী সমাজের সাথে প্রাচীন ও আধুনিক শোষক গোষ্ঠীর নিষ্ঠুর দূর্ব্যবহার ইসলামের দৃষ্টিতে এক জঘন্য এবং অমার্জনীয় অপরাধ। ইসলাম নারী ও পুরুষকে, মানব অস্তিত্বের দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি পা আর দুটি হাতের মতই সমগুরুত্বের অধিকার বলে মনে করে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমমর্যাদা, সমগুরুত্ব ও সমঅধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করে। শারীরিক ও মানসিক গুনবৈশিষ্টের বিভিন্নতার জন্যে ইসলাম নারী ও পুরুষের দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র বির্ধারণ করে দিয়েছে। যাতে কেউ কারো উপর অন্যায় অত্যাচার বা শোষণ করতে না পারে।

পবিত্র কোরআনে নারীদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা, আইনবিধি ও সিদ্ধান্তপূর্ণ আদেশ রয়েছে। কোরআন শরীফের পূর্ণ একটি সূরার নামই হচ্ছে 'নিসা' অর্থাৎ 'নারীগণ' এ ছাড়া কোরআনের অন্যান্য সূরাতে ও নারী সংক্রান্ত আইন-কানুন রয়েছে। এসব কোরআনী আইন ও আদেশে নারীদের যাবতীয় স্বাভাবিক অধিকার ও চাহিদার আলোকে সব রকমের সমস্যাবলীর সুষ্ঠু ও বিচারপূর্ন সমাধান পেশ করা হয়েছে।

ইসলাম ও বিশ্বমানবাতার দরদী প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কোরআনের এক একটি আইনবিধিকে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করেন। মহিলাদের অধিকার এবং মর্যাদা কিভাকে প্রতিষ্ঠিত হবে; তিনি নিজেই তার বাস্তব দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। প্রিয়নবী (সাঃ) ব্যক্তিগতভাবে ও মহিলাদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। নারীদের জানমাল ও মর্যাদার নিরাপত্তার ব্যাপারে তিনি যে কতবেশি সজাগ ও সচেষ্ট ছিলেন তাঁর বাণী ও ভূমিকাতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। নারী জাতির অধিকার ও মর্যাদা দান সম্পর্কিত তাঁর অসংখ্য হাদীস রয়েছে। বিশেষ করে বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি নারীদের জন্যে ও স্থায়ী মুক্তিসনদ ঘোষণা করেন। তিনি পুরুষদের অন্যায় কর্তৃত্ব, নির্যাতন ও শোষনের হাত থেকে নারী জাতিকে চিরদিনের জন্যে মুক্তিদান করেন। নারীরাও যে আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্রী এবং পুরুষের মতোই স্বাধীন বিবেক বুদ্ধির মালিক হতে পারে, একথা বিশ্বের মানুষ প্রথম বার প্রিয় নবী (সাঃ) এর কাছেই শুনতে পেয়েছেন। তিনি স্বামী, পিতা ও সন্তানের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতে মহিলাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই ঘোষণা করলেন যে, "মায়ের পদতলে

Dhaka University Institutional Repository

সন্তানের বেহেশ্‌ত।" তিনি নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যে শিক্ষা অর্জনকে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেন এবং নিজ কর্মক্ষেত্রে নারীদের আয় উপার্জনের অধিকার দান করেন।

এভাবে জীবনের সকল দিক ও বিভাগে নারী ও পুরুষের অধিকার, মর্যাদা এবং দায়িত্বের স্পষ্ট পন্থা-নির্দেশ করে ইসলাম একটি সুখী-সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করে। আজকের এই জড়বাদী যুগে যেখানে জীবনের সর্বত্র অশান্তি, অসন্তোষ, বৈষম্য, ভেদাভেদ আর বিশৃংখলার জয়জয়কার চলছে, সেখানে সামগ্রিকভাবে ইসলামী জীবনাদর্শের বাস্তবায়ন করে সঠিক সমস্যাবলীর সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধান করা যেতে পারে।

বিশেষ করে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার আলোকে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বিভেদ-বৈষম্য দূর করে দাম্পত্য জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, জাতীয় জীবন এবং তার আর্ন্তজাতিক জীবনের সর্বত্র সমমর্যাদা, সম-অধিকার ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করা যেতে পারে।

নারীর অবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন ধর্মের তুলনায় ইসলাম ধর্মের ভূমিকাই মূখ্য এবং অনস্বীকার্য। তাই নারীদের অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার এবং ইসলামী আদর্শের পতাকাতলে মহিলাদের সংঘবদ্ধ হওয়া একান্তই আবশ্যক।

এ উদ্দেশ্যে আমি **"নারীর অবস্থার উন্নয়নে ধর্মের ভূমিকা"** শিরোনামের এ থিখিস খানিতে ইসলাম নারীর যে মার্যাদা ও অধিকার দিয়েছে সে সর্ম্পকে বিস্তারিত আলোচনা এবং নারী সংক্রান্ত ইসলামের যাবতীয় আইন-বিধি ব্যাখ্যাসহ পেশ করার প্রয়াশ চালিয়েছি মাত্র।

আমার এ থিসিস খানি নারী সমস্যা সংক্রান্ত ইসলামী নীতি সম্পর্কে যাবতীয় ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তির অপনোদন এবং নারীদের অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা প্রচারে বিরাট অবদান রাখবে বলেই আমার বিশ্বাস।

আল্লাহ্‌ সকল মহৎ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

ঢাকাঃ ৫ মে, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

উম্মে হাবিবা বেগম

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের আর্বিভাবের পূর্বে নারীর স্থান ও মর্যাদা

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের আর্বিভাবের পূর্বে নারীর স্থান ও মর্যাদা
বিভিন্ন সভ্যতায় নারী

উপক্রমণিকাঃ

সামাজিক জীবনে নারী-পুরুষের সম্পর্কের উপরই নির্ভর করে মানব-সভ্যতা, মঙ্গল ও উন্নতি। এই সম্পর্কে সামান্যতম ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও সভ্যতার ভিত্তি শিথিল হয়ে পড়ে এবং মঙ্গল ও উন্নতির পথে বিঘ্ন ঘটে। কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সর্বত্র এই সম্পর্কের ব্যাপারে নানাবিধ ত্রুটি বিচ্যুতিই পরিলক্ষিত হয়। কোথাও নারী পুরুষের অর্ধাঙ্গিনীরূপে জীবনের চলার পথে তাকে সাহায্য করেছে। আবার অপরদিকে এ নারীকেই অধম দাসীতে পরিণত করা হয়েছে। সকল অধিকার হতে বঞ্চিত করে তাকে জীব-জন্তুর ন্যায় ক্রয়-বিক্রয় করা হয়েছে। তাকে পাপ পঙ্কিলতার উৎস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নারীর অন্তর্নিহিত ও গুণরাজি বিকাশের কোন সুযোগ-সুবিধা তাকে প্রদান করা হয় নাই। আবার কোন সময় এ সুবিধা প্রদান করা হলে ও সঙ্গে সঙ্গেই উচ্ছৃঙ্খলতা ও চরিত্রহীনতায় নিমজ্জিত করে তাকে পাশবিক প্রবৃত্তির ক্রীড়নকে পরিণত করা হয়েছে। এরূপে বংশীয় শৃঙ্খলা ও সভ্যতার ভিত্তি ধ্বসে পড়েছে।

এ বর্ণনা অতি বিস্তৃত কিন্তু থিসিসের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় নিম্নে এর মাত্র কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদান করব।

বিভিন্ন সভ্যতায় নারীঃ

গ্রীক সভ্যতায়ঃ

গ্রীক সভ্যতায় নারী কি মর্যাদার অধিকারী ছিল তা সক্রেটিসের ভাষায় বেশ সুন্দররূপে পরিস্ফূট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেনঃ Woman is the greatest source of chaose and disruption in the world. She is like the Dafali Tree which outwardly looks very beautiful, but if sparrows eat it they die without fail.

নারী জগতে বিশৃঙ্খল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। সে দাফালি বৃক্ষের ন্যায়,যা বাহ্যত খুব সুন্দর দেখায়। কিন্তু চড়ুই পাখি ইহা ভক্ষণ করলে ইহাদের মৃত্যু অনিবার্য।

গ্রীক সভ্যতায় নারী সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে যেয়ে এন্ডারস্কি (Anderosky) বলেনঃ "Cure is possible for fireburns and Snake-bite; but it is impossible

to arrest woman's charms." অগ্নিতে দগ্ধ রোগী ও সর্পদংশিত ব্যক্তির আরোগ্য লাভ সম্ভব। কিন্তু নারীর জাদু প্রতিরোধ করা সম্ভব নহে।[১]

প্রাচীন গ্রীসে বিবাহে নারীর সম্মতি আবশ্যক বলে মনে করা হত না। মাতা-পিতার ইচ্ছানুসারে তাকে বিবাহে বাধ্য হতে হত। বর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকলেও মাতাপিতার নির্দেশে নারী তাকে স্বামী ও প্রভূরূপে বরণ না করে পারত না। নারীদেরকে নিতান্ত তুচ্ছ বলে গণ্য করা হত এবং সর্বদা তাদিগকে তাদের পুরুষ আত্মীয়-স্বজন, পিতা, ভ্রাতা এবং চাচা, মামা ও খালুকে মেনে চলতে হত।

প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে নারীর কোন ভূমিকা ছিল না এবং নারী ছিল সম্পূর্ণরূপে সমাজ বিচ্ছিন্ন। নারীকে একান্ত অর্থহীন দ্রব্যের মতো ঘরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রাখা হতো। এমনকি বড় বড় গ্রীক দার্শনিক ও চিন্তাবিদরাও মনে করতেন যে, নারীর অস্তিত্বের মতো নারী নামটাকেও যেন বদ্ধঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়।[২] তারা নারীকে নিছক সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বলে মনে করতো। এছাড়া নারীর অন্য কোন কাজ থেকেই থাকে তাহলে তা এই যে, সে স্বামী এবং অন্যান্য পুরুষদের সেবা করবে। "স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা" একথাটি ছিল গ্রীকদের জন্যে একান্ত দুর্বোধ্য কথা। অবশ্য প্রেম ভালবাসার জন্যে তাদের আলাদা ব্যবস্থা ছিল। এ ব্যাপারে চমৎকার চিত্রাংকন করেছেন প্রখ্যাত গ্রীক চিন্তাবিদ ডেমোস্তিন। তিনি বলেনঃ

"আমরা যৌনতৃপ্তি অর্জনের জন্যে বেশ্যালয়ে যাই এবং আমাদের দৈনন্দিন কর্মসূচী তৈরী করে থাকে বালিকা বন্ধুরাই আর আমরা কেবল আইনগত ভাবে সন্তান উৎপাদনের জন্যেই স্ত্রী গ্রহণ করি।"[৩]

এথেন্সীয় নারী সর্বদা থাকত কিছু পুরুষের পদানত। বিয়ের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ তার অনুমতির গুরুত্ব দেয়া হত না।[৪]

---

১. Mazhat Afza and khurshid Ahmad: The position of woman in Islam, Islamic Book Publishers, kuwait 1982, (p.p. 9-10).
২. গ্রীক ইতিহাস, পৃষ্ঠা-১১৪-১১৭।
৩. আলবাহি আল খাওলী (মিশর) অনুবাদক, মোহম্মদ নুরুলহুদা (ভারত)ঃ নারী ইসলামের দৃষ্টিতে, ২য় সংস্করণ, সিন্দাবাদ প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯০, পৃষ্ঠা-৫।
৪. The Encyclopaedia Britannica, 11th edition, Vol-28, P-782.

Dhaka University Institutional Repository

এজন্যে বিয়ের পর মেয়েরা পিতৃগৃহ ছেড়ে স্বামীর ঘরে চলে আসে। কিন্তু তা এজন্যে নয় যে, সে স্বামীর ঘরের কর্ত্রী হবেন। তা নয় বরং স্বামীর ঘরে তাকে আসতে হয় শুধু সে সেবিকার দাযিত্ব পালন এবং সন্তান পালন এবং সন্তান উৎপাদন ও তার লালন পালনের জন্যেই।

গ্রীক সভ্যতার গৌরবোজ্জল যুগে সতী সাধ্বী নারী মহামূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত ছিল। সেকালে তারা পর্দা প্রথা মেনে চলত। পরবর্তী যুগে বারবনিতালয় গ্রীসের সর্বস্তরের লোকদেরকে আকর্ষণ করে এবং তখন জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণে ও পতিতাদের প্রভাব প্রতিফলিত হত। পতিালয় যেন তখন একপ্রকার উপাসনালয়ে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছিল। কারণ, তাদের মতে পতিতা ছিল প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী এফ্রোডাইটের প্রতিনিধি। সে তার স্বামীদেরকে পরিত্যাগ করে অপর তিন দেবতার সহিত অবৈধ প্রেমে নিমজ্জিত হয়েছি।[১]

রোম সভ্যতায়ঃ

রোমান সভ্যতাকে পাশ্চত্য পদ্ধতির গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয়। সেখানে পরিবারের প্রাচীন পুরুষই ছিল ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরু; সব সম্পদ, ক্ষমতা এবং অধিকারের একচ্ছত্র মালিক হতো সে'ই।সব রকমের বেচা-কেনা মামলা, চুক্তি ইত্যাদি তারই ইক্তিয়ারাধীন ছিল।

রোমান সমাজেও নারীর কোন গুরুত্ব, অধিকার বা মর্যাদা স্বীকৃত ছিল না। কোন রকমের আইনগত অধিকার থেকেও নারী ছিল বঞ্চিত। অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু আর পাগলের মতো নারীকে ও মনে করা হতো অযোগ্য ও অক্ষম। নারী হয়ে জন্ম নেয়াই ছিল তার অযোগ্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এমন কি যা বাবার কাছ থেকে বিয়ের যৌতুক বা পিতার হিসেবে পাওয়া সম্পত্তিতেও নারীর কোন অধিকার ছিল না। স্বামীর ঘর করার সাথে সাথে স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পদও স্বামীর মালিকানায় চলে যেতো। রোমান নারী আদালতে বিচার প্রার্থনার অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল, এমন কি তার সাক্ষী দেবার অধিকারও ছিল না। একজন নারী সরকারী-বেসরকারী কোন পদ গ্রহণ করতে পারতো না .... হতে পারতো না জামিন, শিক্ষক অথবা অভিভাবক ..... উইল বা চুক্তিবদ্ধ হয়ার অধিকার তার ছিল না।[২]

---

১. Sail Abdullah Seif Al-Hatimy: Woman in Islam, Islamic Publication Ltd. Lahore, Pakistan, October-1979, pp. 2-3.

২. The Encyclopaedia Britannica, 11th edition, Vol-28, p-783.

Dhaka University Institutional Repository

রোমান সমাজে অন্য এক ধরণের বিয়েশাদীরও প্রান ছিল। এই বিয়েকে "সর্দারী বিয়ে" বলা হতো। এর মাধ্যমে যে কোন নারী সর্দারের স্ত্রী বলে গণ্য হতো এবং একবার কেউ সর্দারী বিয়ের কবলে পড়লে তাকে তার সাবেক পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যেতে হতো এবং কখনো তার উপর কোন অভিযোগ লাগানো হলে তাকে সর্দারের সামনে পেশ করা হতো যেন নিজ হাতে তার শাস্তি দিতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে তো সর্দার অভিযুক্ত নারীকে মৃত্যুদন্ড দেওয়ার অধিকার রাখতো, যেমন বিশ্বাস ঘাতকতার অভিযোগে।[১]

এছাড়া কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রী ছেলেদের উত্তরাধিকারে পরিণত হতো, যদি পুত্র সন্তান না থাকতো তাহলে বিধানটি স্বামীর ছোটভাই বা চাচার অধিকারে চলে যেতো।

চীন সভ্যতায়ঃ

দুনিয়াতে চীন দেশেই নারীদের মর্যাদা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। চীনের ধর্ম গ্রন্থে নারীকে Waters of woe (দুঃখের প্রস্রবণ) হিসাবে বর্ণিত হয়েছে যা সকল সৌভাগ্য ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নারী কখনো কোন সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত না। এমন কি তা সন্তানের উপরও কোন অধিকার থাকত না। স্বামী যখন ইচ্ছা, তখনই তাকে তালাক দিতে পারত এবং অপরের উপপত্নীরূপে তাকে বিক্রয় ও করতে পারত। বিধবা হলে তাকে স্বামীর পরিবারের সম্পত্তিরূপে জীবন যাপন পরতে হত এবং পুনর্বিবাহ তার জন্য প্রায় অসম্ভব ছিল।

চীনদেশের নারীদের অবস্থা বর্ণনা করতে যেয়ে জনৈকা উচ্চপর্যায়ের এক চীনা মহিলা লিখেনঃ-

"মানব সমাজে নারীদের স্থানই সর্বনিম্নে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারী হতে নিকৃষ্ট আর কিছুই নাই। এজন্যেই আমাদের অংশে এসেছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কর্ম।"

তারই এক নীতিকথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে-

"নারী কতো হতভাগিনী! পৃথিবীতে তার মতো মূল্যহীন দ্রব্য আর কিছুই নেই। ছেলেরা দোরমুখে এমন ভাবে দাঁড়ায় যেন তারা আকাশ থেকে আগত কোন দেবতা কিন্তু মেয়েদের

[১]. মোহাম্মদ নুরুল হুদা, (অনুঃ) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬.

জন্ম মূহুর্তেও আনন্দের শানাই বাজে না। যখন তারা বড় হয়ে উঠে তখন তাদের বদ্ধ ঘরে লুকিয়ে রাখ হয় যেন কোন মানুষ তাকে দেখতে না পায়। আর যখন সে নিজ গৃহে থেকে মৃত্যুবরণ করে তখন তার জন্যে দুফোঁটা অশ্রু ফেলার মতো কেউ থাকে না।"[১]

চীনদেশে ব্যভিচারের ন্যায় অপরাধে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারত। তার মাতা-পিতা তাকে গ্রহণ করতে সম্মত হলে সে তাদের নিকট চলে যেত। অন্যথায় তাকে রাস্তায় বের করে দেয়া হত।[২]

অবিবাহিতা নারী পিতার পরিবারের সদস্য থাকত। বিয়ের পর সে স্বামীর পরিবারে চলে যেত এবং স্বামীর মাতা-পিতা ও মুরুব্বীদের কর্তৃত্বাধীন থাকত। অলংকারাদি ও নিজস্ব ব্যবহারের জিনিস ব্যবহারের জিনিজ পত্র ব্যতীত বধূ যে সম্পত্তিই সঙ্গে আনত, এর সকলি স্বামীর পরিবারের সম্পত্তিতে পরিগণিত হত। বধূর অবস্থা নিতান্ত অসহায় ছিল এবং কেবল পিতার বংশের বলেই সে স্বামীর পরিবারে টিকে থাকতে পারত। পুত্রসন্তান প্রসব ও স্বামীর ও মুরুব্বীদের মৃত্যুতে শোক পালনের স্ত্রীর অবস্থা কিছুটা সবল হয়ে উঠত।[৩]

ভারতীয় সভ্যতায়ঃ

ভারতীয় উপমহাদেশেও ইসলামের আর্বিভাবের পূর্বে নারী জাতির অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। নারী পাপ এবং নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা ধ্বংসের মূল উৎস বলে বিবেচিত হত। সুতরাং তাকে সর্বদা শাসনাধীনে রাখাই ছিল আসলরীতি। মনু'র মতে তাকে দিবা-রাত্র অবশ্যই পুরুষের কড়া শাসনে রাখা আবশ্যক। কারণ, নারী জন্মগতভাবে দুশ্চরিত্রা ও লম্পট। অথএব তাকে কঠোর শাসনে না রাখলে সে অবশ্যই বিপথগামী হবে।[৪]

নারী সম্পর্কে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে মনুস্মৃতির অধ্যয়নে জানা যায় যে, মনু যখন নারী সৃষ্টি করে তখন সে নারীকে পুরুষের প্রতি প্রেম, রূপচর্চা, যৌন ব্যাভিচারে লিপ্ত থাকা এবং ক্রোধের প্রবণতা দান করে এবং মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে নারীকে নিকৃষ্টতম ব্যবহারের উপযুক্ত বলে ঘোষণা করে। সুতরাং হিন্দু সমাজে এই খ্যাতি অর্জন করে যে, নারী

---

১. V.V.Kant. অনুবাদক Mohammad Badran. কিস্সাতুল হামারা (চীন সভ্যতা শীর্ষক অধ্যায়), পৃষ্ঠা-২৮৩।
২. Said Abdullah Seif Ali-Hatimy: Ibid, P. 7
৩. Encyclo paedia Britanica, Vo-4, p-409.
৪. Amer Ali: The Spirit of Islam; P. 30, Ramesh Chandra Mazumdor: "Ideal and position of Indian Women in Domestic life;" Great Women of India (ed) Swamei and Mazumdar. P-19.

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে নোংরামীর জড় এবং তার অস্তিত্ব হচ্ছে আগাগোড়া নরক।[১] মনু শাস্ত্রে এও বলা হয়েছে যে,

"অনুগত স্ত্রী হলো সে, যে তার স্বামীর সেবা এই ভাবে করে যেন সে তার প্রভূ। তার ব্যাপারে এমন কোন কথা না বলে যা তার জন্যে দুঃখজনক হয়,-তা তার স্বামী বড় লম্পট আর বদমাইশ হোক না কেন। কেননা, কেবল ঐ জন্যেই নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে আর যখন সে তার স্বামীকে ডাকবে তখন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে 'হে আমার উপাস্য' বলে ডাকবে। কিছু দুরত্ব বজায় রেখে তার পিছু পিছু চলবে এবং স্বামী তার সাথে বেশি থেকে বেশি একটি মাত্র কথা বলবে। নারী স্বামীর সাথে খাবার গ্রহণ করবে না, বরং স্বামীর উচ্ছিষ্ট সে খাবে।[২]

নারী সম্পর্কে উপরোক্ত ধারণাই সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু উচ্চ শ্রেণী ও রাজবংশের মহিলাদেরকে অধিকতর সাবধানতার সাথে ভিন্ন পুরুষের নিকট হতে দূরে রাখা হত। রাজবংশের মহিলাগণের আবাসস্থল কড়া প্রহরাধীনে রাখা হত। কোন কারণেই তাদের গৃহের বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। আকস্মিক বিপর্যয় বা অপরিহার্য কারণে উচ্চ বংশের কোন মহিলা জীবিকা অর্জনে বাধ্য হলে এ কার্যে যাতে তার সতীত্ব নষ্ট না হয়, সেজন্য অতি কঠোর সাবধানতা অবলম্বন করা হত। বস্ত্রশিল্প কারখানায় নারীকে যেতে হলে অতি প্রত্যূষে অন্ধকার থাকতে তাকে যেতে হত। যেন সহজে সে কোন লোকের চোখে পতিত না হয়। তার বয়নকৃত বস্ত্র যে কর্মচারী গ্রহণ করত, তাকে অন্ধকারেই বাতির সাহায্যে তা পরীক্ষা করে নিতে হত। সে যদি মহিলার মুখমন্ডলের দিকে তাকাত অথবা তার সংশ্লিষ্ট কাজ ব্যতীত অন্য কোন কথা তার সহিত বলত, তবে তাকে জরিমানা দিতে হত।[৩]

উপরোক্ত বর্ণনা হতে প্রমাণিত হয়, প্রাচীন ভারতে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সমাজে কিছুটা পর্দা প্রথা প্রচলিত ছিল; যদিও পূর্ণ পর্দা প্রথা ইসলামের আবির্ভাবের পরই প্রবর্তিত হয়।

সতীদাহ প্রথা প্রাচীন ভারতে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। এ প্রথা অনুযায়ী স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রজ্বলিত চিতায় আত্মবিসর্জন দিতে হত। এখনও এ বর্বর প্রথা ভারতের কোন কোন স্থানে

---

[১]. বিশ্ব ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৩৯৪।
[২]. হামারাতুল হিন্দু, পৃষ্ঠা-১৭৯।
[৩]. A.L. Bashau; 'The Wandar That was India,' Fontana, 1971, P.191.

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলিত আছে। মাত্র কিছুদিন পূর্বেও ভারতকে এ প্রথা রহিত করে আইন প্রণয়ন করতে হয়েছে।

হিন্দু সমাজে নারী অতীব অশুভ প্রাণী বিশেষ। এজন্যই সতীদাহ প্রথানুসারে বিধবা নারী স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন করাকেই অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন যাপন অপেক্ষা শ্রেয় মনে করত।

There is no creature more sinful than woman. woman is burning fire. She is the sharp edge of the razor. She is verily all these in a body.

নারীর ন্যায় এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণী আর নাই। নারী প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্বরূপ সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এসমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট।[১]

"Men should not love them"-নারীদেরকে ভালবাসা পুরুষদের উচিত নহে।[২]

পুত্র সন্তান জন্মিলে পরিবারে আনন্দ ধরত না। কিন্তু কন্যা সন্তান জন্মিলে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে আসত।

The birth of a girl grant if else-where, here grant a boy.

হে দেবতা! নারী সন্তান অন্যত্র দান কর। আমাদের পুত্র সন্তান দাও।[৩]

এখানে গ্রন্থকার হিন্দু সমাজের অন্তরের আশা আকাঙ্খারই অভিব্যক্তি করেছেন।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, প্রাচীন ভারতেও নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। বৈদিক সাহিত্যে ও অন্য প্রাচীন সাহিত্যে রয়েছে এর যথেচ্ছ দৃষ্টান্ত। সে সব থেকে উদ্ধৃত করা হল কিছু বৈদিক উক্তি-"কন্যা অভিশাপ' (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬/৩/৭/১৩); 'নারী মিথ্যাচারিনী, দুর্ভাগ্য স্বরূপিণী, সূরা বা দ্যূতক্রীড়ার মত একটি বাসনা মাত্র।' (মৈত্রায়ণী সং ১/১০/১১) ইত্যাদি।[৪]

---

১. Professor Indra: Statues of woman in Mohabharat P.16.

২. Ibid, as above, P.17

৩. Ibid, as above, P.21.

৪. সুকুমার ভট্টাচার্য, 'প্রাচীন ভারতঃ সমাজ ও সাহিত্য,' আনন্দ পাঃ লিঃ কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন ধর্মে নারীঃ

সনাতন ধর্মে নারী (হিন্দু ধর্ম)

সনাতন ধর্ম বহু পুরনো ধর্ম। বহুকাল থেকেই লক্ষ লক্ষ মানুষ এই ধর্মের অনুসরণ করে আসছে। এও হতে পারে যে, এই ধর্ম কোন এক সময় আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিতই ছিলো, কিন্তু কালের অবক্ষয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ধর্মের ঐশী ব্যাপার গুলো পরিবর্তিত হয়ে আজকের এই শিরকে আবর্তিত হয়েছে। এই মানবরচিত পরিবর্তনশীল হিন্দু ধর্মেও প্রাচীনত্বেও খ্যাতিতে প্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নারীর অধিকার ও মর্যাদা সর্ম্পকে কখনো মনোযোগ দেয়া হয় নি। সতীদাহের মতো নির্মম অমানুষিক বিধান হিন্দু ধর্মেরই দান।

পুরুষ একই সময়ে একাধিক বিয়ে অথবা স্ত্রী বিয়োগের পর আবার বিয়ে করার অনুমতি লাভ করতে পারে, কিন্তু নারী স্বামী বিয়োগের পর বেঁচে থাকাতো দূরের কথা, আরেক বিয়েতো আরো দুরের কথা, স্বামীর সঙ্গে জীবন্ত দগ্ধ না হলে, মৃত স্বামীর সঙ্গে ছটফট করে পুড়ে মরতে না পারলে তার স্বর্গ লাভই হবে না; যদি কোন নারী কোন প্রকারে এই সতীদাহ থেকে বেঁচেও যেতো, তবে ঘরে, সমাজে কিংবা আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুর কাছে তার কোন সম্মানই থাকত না। তাকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার শরে এমন ভাবে বিদ্ধ করা হতো যে, তখন বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াটাই তার কাছে শ্রেয় বলে বিবেচিত হতো।

প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত অসুর বিবাহ পিতা কর্তৃক কন্যা বিক্রয় স্বরূপই ছিল। হিন্দুনারী কোন সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত না। সেই যুগে বালিকাদেরকে দেবতার নামে উৎসর্গ করে দেয়া হত। দেবতাগণ তাদেরকে বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করতে পারত। এই বালিকাগণ অবশেষে মন্দিরের পুরোহিত ও ধর্মকর্তাদের অধীনে চলে যেত এবং পুরোহিত ও মন্দিরের কর্মচারীদের উপরি পাওনারূপে পরিগণিত হত।

বৈদিক যুগে হিন্দু সমাজে স্বামী স্ত্রীকে সেবাদাসীরূপে ব্যবহার করত। কন্যা সন্তান প্রসব কারিণী স্ত্রী সর্বক্ষেত্রে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হত। ব্যাভিচার, পতিতাবৃত্তি ও এবংবিধ কোন অপরাধের কারণে, এমনকি স্বামীর মৃত্যুতেও বিবাহ ভঙ্গ করা যেত না। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অমিল, রেষারেষি, শত্রুতা ও ঘৃণা বিরাজ করলেও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো যেত না।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে দুনিয়ার কোন দেশেই নারী স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কোথাও নারী সম্পত্তির মালিক ও উত্তরাধিকারী হতে পারত না।[১]

বৈদিক যুগ এবং ইহার পরবর্তীকালেও ভারতে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। একজন পুরুষ একই সময়ে যত ইচ্ছা, স্ত্রী গ্রহণ করতে পারত।[২]

সনাতন ধর্মে পুরুষের জন্য একই সময়ে দশ দশটি স্ত্রী রাখার ও অনুমতি আছে। হিন্দুদের খ্যাতনামা মনীষী ও প্রধানদের মধ্যে এর বহু নযীর পাওয়া যায়। রাজাদশরথের তিন স্ত্রী ছিল। মহারাজা ধ্রুবের পাঁচজন, পান্ডুর দুই ও অর্জুনের তিন স্ত্রী ছিলো। হিন্দুরা তালাক শব্দের সাথে পরিচিত নয়। নারীরতো কথাই নেই, পুরুষ ও তালাক দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। অথচ এতে নারীর ক্ষতি ছাড়া উপকার খুব কমই হয়েছে। কারণ কোন মেয়ে পুরুষের কাছে ভালো নাও লাগতে পারে, কিন্তু এই ভলো না লাগার পরও ঐ পুরুষটিকে ঐ মেয়ে লোক নিয়েই ঘর করতে হবে। এতে করে পুরুষটি স্ত্রীলোকটিকে বহুভাবে কষ্টদেয়ার সুযোগ পায় এবং নারীকে যুগ যুগ ধরে এই নির্যাতন সয়ে আসতেই হচ্ছে হিন্দু সমাজে। আর এ নির্যাতন থেকে নারীকে মুক্তিদেয়ার কোন পথ হিন্দু ধর্মে নেই, এমন কি পুরুষকেও বলে দেয়া হয়নি যে, স্ত্রীর সাথে অসদ্ব্যবহার করা পাপ, বরং বলা হয়েছে, "নারী দিনরাত্রির কোন সময় স্বাধীন থাকতে পারে না। সমস্ত ক্ষমতা স্বামীর অধিকারে থাকবে"। (মনু $\frac{৯}{২}$) নারী স্বাধীন হওয়ার উপযুক্ত নয়।(মনু $\frac{৫}{৪}$) নারী জীবনে কখনো নিজ ইচ্ছা মতো কোন কাজ করতে পারবে না। (মনু $\frac{৫}{২৭}$) বাবা মেয়েকে যার সাথে বিয়ে দেবেন সেখানেই আজীবন থাকতে হবে এবং স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য কোন পুরুষের অংকশায়িনী হতে পারবে না অর্থাৎ সবসময় বিধবা হয়েই থাকবে। (মনু $\frac{৫}{৫১}$) আরো বলা হয়েছে, শয্যাপ্রিয়তা, অলঙ্কারাসক্তি, পাপাভীপ্সা, আত্মগর্ব, রাগ, এক্ষগুঁয়েমি ও বিরক্তি করণ নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য,গর্হিত কাজ করা তাদের অভ্যাস। মিথ্যা বলা তার স্বভাবজাত কাজ। (মনু $\frac{৮}{১৮}$) নারীর সঙ্গে পরামর্শ করতে নেই,

[১]. Flda Hassain Malik "Wives of the prophet"(4th ed), Ashraf Publications, Lahore, 1983, pp.-12-15.
[২]. Indra Status of woman in Ancient India, P.66.

Dhaka University Institutional Repository

এমন কি পরামর্শের সময় নারীকে কাছেও রাখতে নেই। (মনু $\frac{৮}{১২৯}$) পুরুষরা বদকারীর ফলস্বরূপ পর জন্মে নারীত্ব লাভ করে। (সত্যার্থ প্রকাশ)।

সনাতন আইনে লিখিত আছে, "অদৃষ্টনরক, বন্য ও বিষধর সর্প, এর কোনটিই নারীর সমান ক্ষতিকর নয়।" হিন্দু নারীরা তাদের ধর্মীয় পুস্তকে নারী জাতির প্রতি লেখা ঘৃণা ও যুলুমের অধ্যায়গুলো পাঠ করে দঃখ প্রকাশ করছে। আর এর প্রতিবাদ করে জনৈক শিক্ষিতা হিন্দু নারী পত্রিকায় লিখেছেন," হিন্দু গ্রন্থগুলোতে কিভাবে নারী জাতিকে হীন, পাপমুর্তি এবং বিশ্বাসের অযোগ্যা" বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে তা দেখে আমি আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হই। মহারাজামনু তার এক গ্রন্থে নারীকে দাস সম্প্রদায়ভূক্ত করে নারীর সংগত অধিকার কেড়ে নিয়েছেন। একটি সংস্কৃত শ্লোকে বলা হয়েছে, "যদি কোন শতাবর্ষী হাজার রসনা বিশিষ্ট ব্যক্তি দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে দিয়ে কেবল নারীর দোষক্রুটি বর্ণনা করতে থাকে তবুও সে তা বলে শেষ করতে পারবে না।" লেখিকা আরো লেখেন, তুলসী রামায়ণেও নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাষায় বলা হয়েছে যে, নারী জাতির অন্তরে সবসময় ৮টি দোষ বিদ্যমান থাকে, যেমন- ঔদ্ধত্য, মিথ্যা, চালাকি, শঠতা, ভয়, বুদ্ধিহীনতা, কর্কশতা ও দয়াহীনতা। আবার তিনি লিখলেন, "স্ত্রী ও শূদ্রকে লেখা পড়া শিক্ষা দিও না। বিয়ে ছাড়া অন্য সময় নারী সাজসজ্জাও করতে পারবে না।"[১]

মহারাজা মনু তার এক গ্রন্থে লিখেছেন, "ধনের ওপর নারী ও চাকরের কোন অধিকার নাই। ঋণে ডুবা ব্যক্তি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে পরজন্মে নারী বা পশু হয়ে জন্ম গ্রহণ করে।"[২]

ঐ মহিলাই আরো লিখেছেন, "আজও হিন্দুয়ানী শিক্ষার প্রভাব হিন্দু নারীদের অবস্থা যেই তিমিরে সেই তিমিরেই রয়েছে। পুরুষ যতো বড় দুস্কৃতিকারী আহমক বা খারাপ লোকই হোক না কেন, সে স্ত্রীর মোক্ষদাতা। সে বিরাট পাপ করেও অপবিত্র হয় না, নারীর সাধারণ ভূল বা স্বামীর সঙ্গে তার সাধারণ অপরাধ ও ক্ষমার উপযুক্ত নয়। রান্নাকরা, কাপড় ধোয়া, পাত্র মাজা এবং দিবারাত্রি সেবা করাই তার কর্তব্য। পরামর্শস্থলে নারীর কোন স্থান নেই। নারী স্বামীর আমোদফুর্তির উপকরণ মাত্র। স্বামীর সাথে সমতার দাবি করা, স্বামীর সমস্থানে

---

[১]. আর্য্য গেজেট এর "সমাজে নারীর স্থান" শীর্ষক প্রবন্ধ, ২২ শে নভেম্বর, ১৯৩০। (ইন্ডিয়া)
[২]. মহারাজামনু: মনুস্মৃতি এর ৮ম অধ্যায়, ৪১৬ নং শ্লোক।

Dhaka University Institutional Repository

বসা বা স্বামীর কাজে হাত দেয়ার অধিকার হিন্দু নারীর নেই। পুরুষ কোনদিনই স্ত্রীকে সম্পত্তির অংশীদার করেনি, ধন দৌলতের মালিকানা পুরুষদেরই এক চেটিয়া।

যে কোন ধর্মই হোক, যতদিন পর্যন্ত নারী জাতিকে সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় নিমজ্জিত করা হবে এবং তার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বও অধিকার স্বীকৃত না হবে, ততোদিন পর্যন্ত নারীকে পাপের প্রতি মূর্তি ও ক্ষতিকর জীব বলেই বিবেচনা করা হবে এবং নারীর মুক্তি ও শান্তিরপথ অজ্ঞাতই থাকবে। যতোদিন এই হিন্দুয়ানী শিক্ষা বিদ্যমান থাকবে, ততোদিন হিন্দু নারীর মর্যাদা উঁচু হওয়ার কোন আশাই করা যায় না।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতি দ্বারা নারী জাতির প্রতি হিন্দু ধর্মের সদাচরণ সম্পর্কে বুঝতে বাকি নেই। এস্থানে উল্লেখ্য যে, "বর্তমানে হিন্দুনারীদের যে স্বাধীন চলাফেরা ও স্বাধীনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা তাদের ধর্মমতে বৈধ নয়।"[১]

বৌদ্ধধর্মে নারীঃ

পুরনো ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম। গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীতে একজন বড় সংস্কারকের খ্যাতি অর্জন করে গেছেন। তিনি শুধু সংস্কার ও মুক্তির আবেগেই রাজ সিংহাসন পর্যন্ত তুচ্ছ বলে জেনে ছিলেন। দয়া ও সাম্যের মূর্ত প্রতীক এই বুদ্ধও নারী জাতির জন্য কিছু করে যাননি বা কিছু করার প্রয়োজনও বোধ করেন নি। একদিন বুদ্ধের এক শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "নারী জাতির সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে?" বুদ্ধ উত্তর করলেন, নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া ও মানবীয় পবিত্রতার পরিপন্থী।"

বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা হল-"নারীর সাহচর্যে নির্বাণ লাভ করা চলে না।" এ থেকেই বৌদ্ধধর্মে নারীর মর্যাদা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায়।

"বিবাহ ও ইহার আনুসঙ্গিক যাবতীয় কার্য কলাপ বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষ্যের পরিপন্থী। এ ধর্মের লক্ষ্য হল সকল বাসনা কামনার বিলোপ সাধন। সুতরাং এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার সাধনার ক্ষেত্রে চির কৌমার্য নিতান্ত আবশ্যক।"[২]

বৌদ্ধ ধর্মালম্বীর মতে নারী হল সকল অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ।এর বর্ণনা দিতে যেয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়েস্টারমার্ক (Westermark) বলেনঃ Women are, of all the

---

১. ইসহাক ওবায়দী "যুগে যুগে নারী", ২য় প্রকাশ, শান্তিধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-২১।
২. U.May OUNG: Buddrist Law, Purt 1, p.2

Dhaka University Institutional Repository

snares which the tempter has spread for men, the most dangerous, in women are embodied all the powers of infatuation which blind the mind of the world.

মানুষের জন্য প্রলোভন যতগুলি ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে যা সমগ্র বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়।[১]

নারী সম্পর্কে এক বিখ্যাত বৌদ্ধ পন্ডিতের ধারণা ব্যক্ত করতে যেয়ে বেটনী (Bettany)তাঁর World's Religions গ্রন্থে বলেনঃ

Unfathomably deep, like a fish's course in the water is the character of woman, robed with many artifices,with whom truth is hard to find, to whom a lie is like the truth and the truth is like a lie.

"পানিতে মাছের গতিপথের গভীরতা যেমন নির্ণয় করা সম্ভব নয়, নারীর চরিত্র হল তেমনি নিবিড় যা বহুবিধ ছলনায় আচ্ছাদিত। তার মধ্যে সত্য পাওয়া দুস্কর, তার নিকট মিথ্যা সত্যসদৃশ এবং সত্য মিথ্যাসম"

গৌতম বুদ্ধের শিক্ষার সারমর্ম এই যে, নারীর সঙ্গে বসবাসকারী পুরুষ পরকালের মুক্তি হতে বঞ্চিত থাকবে। যে ধর্ম বলে, "নারীর সঙ্গে বাস করা অপেক্ষা বাঘের মুখে চলে যাওয়া কিংবা জল্লাদের ছুরির নীচে মাথা পেতে দেওয়া উত্তম," সেই ধর্ম কখনো নারীকে শান্তি ও মর্যাদা দান করতে পারে না। গৌতম বুদ্ধের দৃষ্টিতে নারীরা পুরুষের মোক্ষ লাভের অন্তরায়, তাদের সাহচর্যে থেকে আত্মিক উন্নতি লাভ করা সম্ভবপর নয়। এজন্যেই গৌতম বিয়ে প্রথার বিরোধী থেকে লোকদের সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাসব্রতের দিকে আহ্বান করে ছিলেন।

উপরোক্ত আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে যে, বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে অপবিত্রা তথা নারী সঙ্গকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। তাদেরকে ছলনাময়ী ও মিথ্যার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর এ থেকেই বুঝা যায় বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে তার কোন মর্যাদাই প্রদান করেনি।

---

১. Nazhat Afza and khurshid Ahmad: Ibid, pp.12-13.

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াহুদী ধর্মে নারীঃ

বনি ইসরাঈলদেরকে সৎ পথ প্রদর্শণ ও ফিরআউনের অত্যাচর থেকে মুক্তি দানের নিমিত্ত হযরত মুসা (আঃ) রসুল হিসেবে প্রেরিত হন এবং তাঁর ওপরই তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ হয়।আজকাল যে তাওরাতের অস্তিত্ব দেখা যায় সঠিক মতে তা প্রকৃত তাওরাত নয়। তৎকালীন ভন্ড ইয়াহুদী রাজাদের কল্যাণে প্রকৃত তাওরাত ভস্মীভূত ও বিনষ্ট হয়ে গেছে। তখন তাওরাত রাখা বা পাঠ করা অন্যায় বলে গণ্য হতো। এর তিনশত বছর পর মানুষের মুখ থেকে শুনে শুনে (যার কোন মজবুত ভিত্তি ছিল না) বর্তমান তাওরাত সংকলন করা হয়, তাই এই তাওরাত সত্য-মিথ্যার এক সমাবেশে পরিণত হয়। এ ধরণের মনগড়া তাওরাতে নারীদেরকে পণ্যদ্রব্যের মতো উল্লেখ করা হয়েছে।

"ইয়াহূদী ধর্মমতে নারীর উপর সৃষ্টিকর্তার চিরন্তন অভিশাপ রয়েছে। এই ধর্ম মতে নারী হতেই পাপের সূত্রপাত হয় এবং তার কারণেই সকলের ধ্বংস অনিবার্য। কারণে, নারীই সকল দুর্নীতির উৎস। ইয়াহূদী সমাজে নারীর কোন মর্যাদা দেয়া হত না এবং সে পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তিরূপেই পরিগণিত হত।

ইয়াহূদী সমাজে নারী পুরুষ হতে অতি নিকৃষ্ট, এমনকি মর্যাদায় নারী চাকরদের অপেক্ষাও নিম্নস্তরের বলে গণ্য হত। ভ্রাতা থাকলে সে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কা অবস্থায় কন্যাকে বিক্রয় করার পূর্ণ অধিকার পিতার ছিল। বিবাহিতা স্ত্রীর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হত স্বামী।"[১]

ইয়াহুদী সমাজে পূর্ব হতেই পিতা কর্তৃক মেয়েদের কেনা-বেচার প্রচলন বিদ্যমান ছিল। বরের কাছ থেকে কনেকে দাসীত্বের মূল্যস্বরূপ এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নেয়া হতো। ইয়াহূদী ধর্মে-ভাইদের মৃত্যুর পর ভ্রাতৃজায়াকে বিয়ে করা এক অপরিহার্য নীতি, তাতে মেয়েদের মতামত নেয়ার কোন প্রশ্নই উঠেনা। [২]

ইয়াহুদী সমাজে নারীর প্রতি যুলুমের সীমা ছিল না, ছেলের বর্তমানে স্ত্রী কিছুই পেতো না। নারীদের দান প্রতিদান বা সাক্ষ্য দেয়ার কোন অধিকারণ ছিলো না। নারীর শপথও নিরর্থক বলে বিবেচিত হতো। ইয়াহুদীদের বিশ্বাস্য কিতাব "আহাদ নামায়ে আতীক" গ্রন্থে নারী

---

১. Encylopaedia Britanca, Vol-V, P.732.
২. Lods, Adolphe, 'Israel,' London-1948, P.191.

Dhaka University Institutional Repository

জাতি সম্পর্কে লিখিত আছে, "নারী সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য পুরুষকে আরাম পরিবেশন করা, নারী পাপের প্রস্রবন। পূর্ণ্যজনক কাজ করায় কোন যোগ্যতা নারীর মধ্যে নেই বলে সে মান-সম্মানের যোগ্য হতে পারে না।" কারণ ইয়াহুদীদের সাধারণ বিশ্বাস এই যে, একমাত্র হাওয়া (আঃ) এর ফুসলানিতেই হযরত আদম (আঃ) গন্দম আস্বাদন করেছিলেন এবং সেই হাওয়ারই কারণে হযরত আদম (আঃ) বেহেশত হতে দুনিয়ায় নিক্ষিপ্ত হয়ে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে জীবনকে বিপদাপন্ন করতে বাধ্য হয়ে ছিলেন। এ থেকেই ইয়াহুদীরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, নারী জাতি প্রথম থেকেই অন্যায় ও পাপের উস্কানীদাত্রী হয়ে আছে। অতএব সে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার হতে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য। শুধু এই একটি মাত্র কারণ থেকেই ইয়াহুদীরা নারী বঞ্চিত থাকতে বাধ্য। শুধু এই একটি মাত্র কারণ থেকেই ইয়াহুদীরা নারী জাতির অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছে। মনগড়া তাওরাতের হুকুম ছিল, "দুইজন পুরুষের মধ্যে ঝগড়া বা লড়াই আরম্ভ হলে কোন নারী যদি তার স্বামীর সাহায্যে এগিয়ে আসে তবে তা অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং এই অপরাধে ঐ নারীর উভয় হাত কেটে দেয়া হবে। এতে তার প্রতি কোন রকম দয়া প্রদর্শণ করা যাবে না।"

স্বামীকে অপর মহিলার সহিত শায়িত দেখলে ইয়াহুদী স্ত্রীকে অভিযোগ না করে চুপ থাকতে হত। কারণ, স্বামীর যা ইচ্ছে তাই করার অধিকার তার ছিল।

সামাজিক প্রার্থনায় দশ জন পুরুষের উপস্থিতি ছিল। কিন্তু নয়জন পুরুষ এবং বহু নারী উপস্থিত থাকলেও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হত না। কারণ, নারী মানুষরূপে পরিগণিত ছিল না।[১]

ইয়াহুদী সমাজে বিবাহ ছিল ব্যক্তিগত ব্যাপার। সুতরাং এজন্য রাষ্ট্র ও ধর্মের অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। বাস্তবে ইহা ছিল একপ্রকার ব্যবসা এবং যৌতুকের গুরুত্ব ইহা খুব বেশী ছিল।[২]

খ্রীস্টান জগতের শ্রেষ্ঠ অবতার খ্রীস্টধর্মের রচয়িতা সেন্ট পল বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পবিত্র ধর্মীয় বন্ধন বলে স্বীকার করে না। আর ইহাকে তিনি স্বাভাবিক এবং সামাজিক জীবনের সম্মানজনক ও আনন্দদায়ক কিছু বলেও বিশ্বাস করেন না।[৩]

---

১. Shaner, Donald W, "A christian View of Divorce," Leiden 1969, P.31.
২. Report of the commission, Mrriage, Divorce and the church, Lindon-1971, P.9-80.
৩. Klansner, Joseph: From Jesus to Paul, London, 1964, pp.571-572.

তালাকের ব্যাপারেও ইয়াহুদী ধর্মে হৃদয়হীনতার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। নারীর ছোট ঘাট দোষ-ত্রুটিতো দূরের কথা দোষ ত্রুটি না পেয়েও পাপহীন তালাকের অধিকার পুরুষদের জন্য ছিলো। আরো বিপদ এই যে, ইয়াহুদী সমাজে তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে আর কেউ বিয়ে করতে সম্মত হয় না।

ইয়াহুদী সমাজে সন্তান উৎপাদনই ছিল বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য। কাজেই সন্তান জন্মদান ব্যতীত দাম্পত্য জীবনের দশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত বা সে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারত। বিবিধ প্রকার বিবাহ তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং কয়েক প্রকার ব্যতীত সবগুলিরই বিচ্ছেদ হতে পারত।[১]

বিবাহের পূর্বে কৌমার্য ও বিবাহের পর দাম্পত্য জীবনে সততা সাধুতা ছিল বিবাহের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নারীদের উপর সতীত্ব রক্ষার জোর তাকিদ ছিল এবং বিবাহের সময় সতীত্ব প্রমাণ করতে না পারলে বালিকাদের প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলা হত।[২]

বাগদত্তা বা বিবাহিতা নারী পরপুরুষ দ্বারা বলপূর্বক ধর্ষিতা হলে ধর্ষনের সময় সাহায্য চেয়ে চিৎকার না দিলে সে নারী জীবনের অধিকার হারিয়ে ফেলত এবং প্রস্তরাঘাতে হত্যাই ছিল তার শাস্তি, ধর্ষিতা কুমারী হলে ধর্ষণকারীর সহিত বিবাহই ছিল ইহার বিধান।[৩]

মাতাপিতা কন্যাদিগকে বিবাহে বাধ্য করত না। কিন্তু তাদিগকে বিবাহ দেওয়া বা কারো নিকট বিক্রয় করে ফেলার আইন সঙ্গত অধিকার পিতার ছিল।[৪]

ইয়াহুদী সমাজে বহু বিয়ের এতো প্রাণ ছিলো যে, যার যা ইচ্ছা তাই বিয়ে করতে পারতো, এতে তাদের ধর্মীয় কিতাবে কোন রকম বিধি নিষেধ ছিল না। ইহা ছাড়াও স্বামী যত ইচ্ছা, উপপত্নী রাখতে পারত। তদুপরি অবিবাহিতা দাসী, এমনকি চুক্তিতে আবদ্ধা বিবাহিতা নারীদের সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অধিকারও তার ছিল। এসব কাজ করেও সে ব্যভিচারী বলে গণ্য হত না।[৫]

---

১. Bible Deutero-nomy 22:21
২. Ibid, 22:23-25, 28, 29.
৩. The Jewish Encyclopaedia, Vol. XII. P.556.
৪. Pospishil, Victor, "Divorce and Marriage," London, P.38.
৫. Shanar, Donald W: Ibid, P.31.

Dhaka University Institutional Repository

একই সময়ে একজন ইয়াহুদী পুরুষ কয়েকজন স্ত্রী রাখতে পারত, ইয়াহুদী ধর্মে এর সংখ্যা নির্ধারিত ছিল না। তবে একাধিক স্ত্রী গ্রহনের রীতিই সাধারণত প্রচলিত ছিল।[১]

ইয়াহুদী স্বামীর তালাক দেয়ার অধিকার ছিল। কিন্তু স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ করলে সে চিরকালের জন্য সেই স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ক্ষমতা হতে বঞ্চিত হত। বিধবা বা তালাক প্রাপ্তা হলে নারী অপর স্বামী গ্রহণ করতে পারত।[২]

ইয়াহুদী সমাজে কারণে অকাণে যেমন তরকারীতে লবন একটু বেশী হলো বা কাপড় ধোয়া ভালো হয়নি অথবা কোন সুন্দরী নারী লাভের আশা পাওয়া গেলে অথবা এ ধরণের কোন তুচ্ছ ভুল নারী থেকে প্রকাশিত হলো, অমনি স্বামী তাকে পাপহীন তালাক দিতে কোনরকম দ্বিধা করতো না। তালাকতো নয়, যেন নারীর জীবনটাকেই ধ্বংস করে দেয়া। ঐ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর দিকে আর কেউ ফিরেও তাকাবে না। তাই প্রত্যেক ইয়াহুদী পুরুষ তার ইবাদতের সময় এই বলে দোয়া করে, হে সৃষ্টিকর্তা তুমি যে আমাকে নারী করে সৃষ্টি করনি এজন্য তোমার শুকরিয়া ও তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

উপরোক্ত আলোচনা হতে আমরা সম্যক ধারণা লাভ করলাম যে ইয়াহুদী ধর্মেও নারীদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত শোচনীয় ও জঘন্য পর্যায়ের যা মানবতার পরিপন্থী বৈকি।

ইয়াহুদী ধর্মের কিতাব মোকাদ্দাস (বাইবেলে) নারী সম্পর্কে অভিমত ছিল এই সে কে? যে নাপাক থেকে পাক বের করবে? নেই কেউ। (আইউব-অধ্যা-১৪) অন্যত্র রয়েছে, এমন মানুষ কে, যে পাক হতে পারে? যে নারী থেকে জন্ম নিয়েছে সে কি করে সত্যবাদী হতে পারে?

অর্থাৎ, ইয়াহুদী ধর্মের দৃষ্টিতে-(১) নারী নাপাক (২) নারী সত্তার মধ্যে সত্যবাদিতা নেই (৩) মানুষ যেহেতু নারী থেকে জন্ম তাই সে পবিত্র হতে পারে না।

পারসিক ধর্মে নারী (অগ্নিপূজক)ঃ

কথিত আছে যে,ইরানের অগ্নি পূজকদের ধর্মীয় নেতা ছিলো যারোয়েষ্টি। তার ধর্মেও নারী জাতি সম্পর্কে লজ্জাস্কর বিধান দেখতে পাওয়া যায়। যরোয়েষ্টি বলতেন, "সন্তানবিহীন নারী

---

১. Said Abdullah Zeif Hatimy: Ibid, P.61

২. Bible-Deuternomy 24:1, 22:19;
Moscati, Sabatino: Ancient Semitic Civilisation, London, 1957. P.159.

Dhaka University Institutional Repository

পুলসিরাত পার হতে বা বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবে না। কাজেই বেহেশ্তের অভিলাষিনী নারী যেনো অন্ততপক্ষে অপর কারো সন্তান পালন করে হলেও মাতৃপদ লাভ করে।" এই ধর্মে ঋতুমতী নারীর প্রতি যুলুমের শেষ ছিলো না। যরোয়েষ্টির হুকুম ছিল, "কোন পুষ্পবতী নারী যেনো সূর্য না দেখে, কোন পুরুষের সঙ্গে কথা না বলে । আগুনের দিকে দৃষ্টি না দেয়, পানিতে অবতরণ না করে,অন্য কোন পুষ্পিতা নারীর সঙ্গে একত্রে শয়ন না করে, খাদ্য স্পর্শ না করে, কোন পাত্র ধরতে হলে হাত যেন কাপড় দিয়ে জড়িয়ে নেয়। কোন ঋতুমতী নারী এর বিপরীত করলে তার জন্য বেহেশ্ত হারাম।"

প্রসূতি ঘরের নিয়ম ও অনুরূপ কঠোর ছিল। প্রসবের পর নিয়ম ও অনুরূপ কঠোর ছিল। প্রসবের পর চল্লিশ দিনের মধ্যে যেন প্রসূতি নারী মাটি বা কাঠের পাত্র স্পর্শ করার অনুমতিও পেতো না। ঐ সময়ের মধ্যে প্রসূতি নারী ঘরের বারান্দায় পা দিতে পারত না। ঋতুকাল একটি পাপকাল বলে বিবেচিত হতো, এমন কি ঐ সময়ের পাপ থেকে তওবা করার জন্য বছরে একটি মাস নির্ধারিত ছিল। সেখানকার দুর্ভাগা নারী জাতিকে নিজের জীবনকে বোঝা বলে মনে করতো। নারী ছিল স্বামীর দাসী স্বরূপ, আল্লাহর ইবাদত থেকে তাদেরকে মুক্তি দিয়ে স্বামীর দাসত্বে নিয়োজিত করা হতো।

যরোয়েষ্টির ধর্ম প্রাচীন ধর্ম। হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্মের পঁচিশ বছর আগের যুগটি যরোয়েষ্টির যুগ। তবে এই ধর্মে বিভিন্ন রকমের যৌন উম্মদনা থাকায় কায়খসরু, গষ্টাসপ ও কায়কোবাদের মতো প্রতাপশালী রাজারাও এই ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলো। যার ফলে তাঁদের প্রভাব ও প্রচারণার এই ধর্ম দূরদূরান্ত পর্যন্ত প্রসার লাভ করে। এই ধর্মের অন্য নাম ছিলো মজুসিয়াত। সম্রাট পারভেজও মজুসী ছিলো। একই সময় সে বার হাজার স্ত্রীর স্বামী ছিলো। এই বার হাজার স্ত্রীর মধ্যে একশরও অধিক ছিলো তার মা, খালা, ফুফু, বোন ইত্যাদি নিকট আত্মীয় স্বজন পারভেজ এই বার হাজার স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট ছিলো না। যখন তার ইচ্ছা মতো বিশ পঞ্চাশ জনকে তালাক দিতো অথবা হত্যা করতো, আবার পছন্দমতো স্ত্রী সংগ্রহ করে নিতো, এমন কি সে তার বিবিদেরকে বিক্রি করতে বা অন্য কারো অঙ্কশায়িতা করতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করতো না। সে সময় নারী জাতি পণ্যদ্রব্য হিসাবে সাধারণ ভাবেই বেচাকেনা হতো। সতীন পুত্রের সাথে সৎ মায়ের সংগম করাও চলতো। এতে কোন লাজ-লজ্জার বালাই ছিলো না। এভাবে মা-বোন বা মেয়ের পার্থক্য উঠিয়ে দেয়ার ফলে মজুসী ধর্ম

Dhaka University Institutional Repository

বহু দূর দেশেও পরিচিতি লাভ করেছিলো। এই ধর্মের সংস্কার হিসাবে তথাকথিত দার্শনিক মযুক এসে আরো বহু বিধি বিধানের পরিবর্তন ঘটিয়ে এ নতুন ধর্মের সৃষ্টি করে যার অনুসারী হয়ে ছিলো শাহ কাবাদ এর মতো প্রতাপশালী রাজাও। মযুকের মতে ধন ও নারী সকল অন্যায়ের মূল তাই সে ধন ও নারীকে স্বাধীন করে দিলো অর্থাৎ ধন ও নারী কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি না হয়ে সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হলো। মযুকের এই নীতি শাহ্ কাবাদের প্রচারণায় রাজ্যের সর্বত্র প্রতিপালিত হতে শুরু করলো। এক ব্যক্তির ধন সমস্ত দেশবাসীর ধনে এবং এক ব্যক্তির স্ত্রী সমস্ত দেশবাসীর স্ত্রীতে পরিণত হলো।

"এই বিশৃঙ্খলার যুগে নিজের ধন বা নিজের স্ত্রীকে অপরের উপভোগ থেকে নিষেধ করার মতো সাহস কারো ছিলো না। প্রত্যেক মানুষের যে কোন নারী বা কারো স্ত্রীর সাথেই মেলামেশা করার অধিকার ছিলো, এমন কি শাহ্ কাবাদ এই মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে তার শাহী মহলের পাহারা ও বিধি-নিষেধ উঠিয়ে দিয়েছিলো। শহরের জনসাধারণ নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে বেগম মহলে প্রবেশ করে শাহযাদী ও বেগমদেরকে ভোগ করে মযুসী মতবাদকে কার্যতরূপ প্রদান করত। সকল মানুষই একে অপরের ঘরে প্রবেশ করে "সমবায় কার্যক্রম" এর রূপদান করতো।"[১]

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে পারসিক ধর্মেও নারীকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত করা হতো। এখানেও নারী পায়নি তার যথাযোগ্য মর্যাদা।

খ্রীস্ট ধর্মে নারীঃ

খ্রীস্টধর্মে ধর্মের নামে নারী জাতির উপর অতীব নিষ্ঠুর ও নিদারুণ নৃশংস আচরণ করা হয়েছে। পোপ শাসিত! "পবিত্র" রোম-সাম্রাজ্যে তাদের দেহে গরম তৈল ঢেলে দেয়া হয়েছে; দ্রুতগামী অশ্বের লেজের সহিত তাদিগকে বেঁধে হেঁচড়ানো হয়েছে এবং মজবুত স্ত ম্ভেবেঁধে তাদেরকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়েছে। এতে ও নারী জাতির নির্যাতনের পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ এর এক অধিবেশন রোম নগরীতে অনুষ্ঠিত হয় এই অধিবেশনের সর্বসম্মতিক্রমে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

"Woman has no soul-নারীর কোন আত্মা নেই।"

---

[১]. যুগে যুগে নারীঃ ইসহাক ও বায়দী। (শান্তিধারা প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৭ইং), পৃষ্ঠা-২৫.

Dhaka University Institutional Repository

ড. এসপ্রিঙ্গ (Dr. Aspring) তাঁর গ্রন্থে মধ্যযুগে নারী জাতির উপর জঘন্য নির্যাতনের বিশদ বর্ণনা প্রদান করেছেন। তিনি বলেনঃ

"১৫০০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে নারী জাতির বিচারের জন্য একটি পরিষদ গঠিত হয়। ইহা নারীদের উপর নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন চালাবার নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করে। এই আইনের বলে খ্রীস্টানগন নব্বই লক্ষ জীবন্ত নারীকে অগ্নিতে দগ্ধ করে হত্যা করে। খ্রীস্টান সাম্রাজ্যে নারীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অবিচার বর্ণনাতীত।"

নারীজাতিকে অতীবহীনও তুচ্ছ প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে ইয়াহূদী ও খ্রীস্টধর্মের প্রবল ভূমিকা রয়েছে। উভয় ধর্মই নারীকে পাপের আদি কারণরূপে আখ্যায়িত করেছে। বাইবেলে পরিস্কারভাবে বর্ণিত আছে-"নারীর পাপের দরুণই পুরুষকে তাঁর উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার প্রদত্ত হয়েছে।[১]

I will greatly multiply your pain in child-bearing; in pain you shall bring forth children; yet your desire shall be for your husband, and he shall rule over you.[২]

গর্ভধারণে তোমাদের ব্যথা আমি অত্যন্ত বৃদ্ধি করে দিব। এ ব্যথায়ই তোমরা সন্তান প্রসব করবে। তথাপি তোমরা তোমাদের স্বামীর সংসর্গ কামনা করবে এবং ।সে তোমাদের উপর শাসন করবে।

খ্রীস্টান ধর্মমতে নারীই গোটা মানবতার দুর্দশার কারণ। অতীতের বহু বিখ্যাত পাদ্রী প্রকাশ্যে নারী জাতির উপর দোষারোপ করেছে এবং নারীকে দরকারী আপদ (Necessary evil) বলে অভিহিত করেছেন। আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেন্ট বলেঃ "নারী বলে তার লজ্জায় অভিভূত হয়ে থাকা উচিত।"[৩]

খ্রীস্ট জগতে সেন্ট বার্নার্ড, সেন্ট সিপ্লিল, সেন্ট গ্রেগরী, সেন্ট জিরাম প্রভৃতি মধ্যযুগীয় মনীষীদের এক বিশেষ স্থান আছে। তাঁদের বাণী ঈসায়ীরা বিশেষভাবে পালন করে থাকে। এই মনীষীরা নারী চরিত্রের যে লজ্জাকর ছবি একেঁছেন, তা নিতান্তই দুঃখজনক। তাঁরা একই

---

১. Bible: Genesis 3:16, New youk, 1973.

২. Libra: womanhood and the Bible, New your p.18; cleugh, james: Love lockedout, London 1963, P.264-265.

৩. Nazhat Afza and khurshid Ahmand: Ibid P.4.

Dhaka University Institutional Repository

মর্মে লিখেছেন, "নারী শয়তানের শক্তি অজগর সাপের মতো রক্তপিপাসু তার মধ্যে সাপের বিষ নিহিত আছে, সমস্ত নৈতিক ক্রটির মূল উৎস শয়তানের বাদ্যযন্ত্র, দংশণোন্মুখ বিচ্ছু এবং প্রকৃতপক্ষেই আমাদের মনের ওপর শয়তানের রাজ্য প্রতিষ্ঠায় নারী শয়তানের সাহায্যকারিণী।" উক্ত ধর্মযাযকরা অন্যত্র লিখেছেন, "তোমাদের আশা-আকাঙ্খা ও ইচ্ছা প্রবৃত্তি সব সময়ই পুরুষদের অধীনে থাকবে এবং পুরুষরাই তোমাদের উপর প্রভূত্ব করবে।"

চার্চের আইনে স্ত্রীজাতি নাপাক পদার্থ বলে বিবেচিত হতো। এ জন্যই নারীরা চার্চের "কুরবান গাহ" স্পর্শ করতে পারতোনা, যদি তাও নাপাক হয়ে বসে।

এরূপে শতাব্দীর পর শতাব্দী খ্রীস্টান জগত নারী জাতির হীনতা ও অমর্যাদা প্রচার করে আসছে। নারী সম্পর্কে খ্রীস্ট ধর্মের অনুভূতি তারতুলীনের নিম্ন বর্ণিত বক্তব্য দ্বারা অনুমান করা যায়।

"হে নারীকূল, তোমরা জানোনা যে, তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন হাওয়া। তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র যে ফতোয়া ছিল তা যদি এখনো বর্তমান থাকে তা হলে উক্ত অপরাধ প্রবনতাও তোমাদের মধ্যে বর্তমান আছে। তোমরাতো শয়তানের দরজা। তোমরাই অতি সহজে খোদার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ পুরুষের ধ্বংস করেছো।"[১]

"খ্রীস্টান ধর্মে বিবাহ ছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্থায়ী পবিত্র বন্ধনে যা আমৃত্যু বলবৎ থাকবে।"[২]

কিন্তু খ্রীস্টান পবিত্র ধর্মীয় বন্ধন বলে স্বীকার করে না। আর ইহাকে তিনিস্বাভাবিক এবং সামাজিক জীবনের সম্মানজনক ও আনন্দদায়ক কিছু বলেও বিশ্বাস করেন না।[3]

It is well for aman not to touch a woman. It is well for a person to remain as he is. Do not seek marriage. But if you marry, you do not sin and if agil marries she does not sin. Yet those who marry will have wordly troubles. I want you to be free from anxieties. The unmarried man is anxious about the affairs of the Lord, how to please the Lord; but the married man is anxious about wordly

---

১. ইসলাম ও নারী (ইসলামী গবেষণা পত্রিকা) সম্পাদকঃ আবুরিদা, লেখা প্রকাশনী, ১ম সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৪২।

২. Pospishil, Victor: Ibid, P.49.

৩. Kiansner, Joseph: From Jesus to Paul, London 1964, pp.571-572.

Dhaka University Institutional Repository

affairs, how to please his wife.I saythis for your own benefit, not to lay any restraint upon you, but to promote good order and to secure your undivided devotion to the Lord.[1]

কোন নারীকে স্পর্শ না করাই পুরুষের জন্য ভাল। সে যেমন আছে, তদ্রুপ থাকাই তার জন্য উত্তম। বিয়ে করতে চেও না। কিন্তু তুমি বিয়ে করলে তোমার পাপ হয় না এবং কোন বালিকা বিয়ে করলে সেও পাপ করে না। তবে যারা বিয়ে করে, তারা পার্থিব দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়। সাংসারিক উদ্বেগ হতে মুক্ত থাক, ইহাই আমি কামনা করি। অবিবাহিত পুরুষ ঈশ্বরের কাজে উদ্বিগ্ন, কিরূপে তাঁকে সন্তুষ্ট করা যাবে। কিন্তু বিবাহিতা ব্যক্তি পার্থিব বিষয়ে উদ্বিগ্ন, কিরূপে তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করবে। আমি তোমার নিজ কল্যাণের জন্যই এই উপদেশ দিচ্ছি, তোমার উপর কোন বাধা আরোপের জন্য নহে; বরং শৃঙ্খলা স্থাপন এবং প্রভূর প্রতি তোমার অবিভক্ত অনুরক্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই আমি ইহা বলছি।

খ্রীস্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থ বাইবেলে আরও উল্লেখ আছে-

He that giveth her not is marriage, doeth better. [2]

যে ব্যক্তি তার কন্যাকে বিয়ে দেয় না; সেই উত্তম কাজ করে।

তালাক ও পুনর্বিবাহঃ

খ্রীস্টান ধর্মের অনুসারে তালাকের অনুমতিই নাই।

.... that the wife should not separate from her husband and that the husband should not divorce his wife.[৩]

.........স্ত্রী তার স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন হবে না; আর স্বামীও তার স্ত্রীকে তালাক দিবে না। মার্ক বলেন, যিশু তালাকের প্রতি ঘৃণা এভাবে প্রকাশ করেনঃ

Who ever divorces his wife and marries another, commits adultery against her; and if she divorces her hushand and marries another, she coummits adultery. [৪]

---

১. Bible-1, Corinthians, 7:1, 26, 28, 29, 32, 35.

২. Bible Crinthians, VII-38.

৩. Bible, Ibid, 7: 10-11.

৪. Bible, Mark 10:11-12.

Dhaka University Institutional Repository

যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অপর স্ত্রী গ্রহণ করে, সে তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে। আর যে স্ত্রী নিজ স্বামীকে বর্জন করে অপর স্বামী গ্রহণ করে সে ব্যভিচার করে।

কিন্তু মতান্তরে খ্রীস্টান ধর্মে তালাক ও পুনর্বিবাহ অবৈধ নহে।[১]

খ্রীস্টধর্মে গৃহ অভ্যন্তরে ও সমাজে স্ত্রীর স্থানঃ

খ্রীস্টান ধর্মমতে নারী পাপের উৎস, এ ধারণা তার মর্যাদার উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। নারীর জীবনের পরম অবদান হল পরিবারের প্রতি দরদ ও সতর্ক দৃষ্টি এবং সহজে স্বামীর প্রতি বশ্যতা স্বীকার। স্বামীর একান্ত অধীন হয়ে থাকা ও নিজেকে স্বামী হতে হীন বলে মেনে নেয়া ছিল তার পরম সাফল্য।

The head of every man is Christ; the head of a woman is her husband.[২]

"প্রত্যেক পুরুষের অধিকর্তা হল যিশু; নারীর অধিকর্তা তার স্বামী।"

নারী সমাজের বর্হিভূত ছিল এবং তাকে একান্তভাবেই স্বামীর অনুগত হয়ে থাকতে হত। বাইবেলে উল্লেখ আছে-

Let a woman learn is silance withe all submissi veness. If permit no woman to teach or to have authority over men; she is to keep silent. For Adam was formed first, then Eve; and Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a trangrssor.[৩]

"পূর্ণ আনুগত্যের সাথে নীরবে নারী শিক্ষা লাভ করবে, পুরুষকে শিক্ষা দান অথবা তার উপর কতৃত্ব করার অনুমতি আমি কোন নারীকেই দেই নাই; সে নির্বাক থাকবে ঃ কারণ সর্বপ্রথমে আদম সৃষ্ট হয়েছিলেন তার পর হাওয়া এবং আদম প্রতারিত হন নাই বরং হওয়াই প্রতারিত হয়েছিলেন ও নির্দেশ ভঙ্গ করেছিলেন।"

---

১. Pospishil, Victor: Ibid, p-38; Bible-1, Corinthiaus 7:39-40.
২. Bible-1: Corinthiaus, 11:3.
৩. Bible: Tomothy, 2:11-14.

Dhaka University Institutional Repository

জনৈক পাদ্রীর মতে "নারী হচ্ছে শয়তানের প্রবেশস্থল। তারা ইশ্বরের মান-মর্যাদার প্রতিবন্ধক, ইশ্বরের প্রতিরূপ মানুষের পক্ষে তারা বিপজ্জনক।" তাই নির্জনে থেকে নারী সূতা কাটবে, বস্ত্র বয়ন ও রঞ্জন করবে। কিন্তু অপরিহার্য কারণে তাদিগকে বের হতে হলে তারা অবশ্যই পর্দা পরিধান করবে।

Let her wear a veil. For a man ought not cover his head, since he is the image and glory of God; but woman is the glory of man. For man was not made from woman, but woman from man. Neither was man created for woman, but woman for man. That is why a woman ought to have a veil. [১]

"নারী পর্দা পরিধান করবে। যেহেতু পুরুষ ইশ্বরের প্রতিমূর্তি ও গৌরব। এজন্য তার মস্তক আবৃত করা উচিত নহে। কিন্তু নারী পুরুষের গৌরব। কারণ, পুরুষ নারী হতে সৃষ্টি হয় নাই; বরং নারী পুরুষ হতে সৃষ্ট হয়েছে। আর পুরুষ নারীর জন্য সৃষ্টি হয় নাই; কিন্তু নারী পুরুষের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। এজন্যই নারীকে পর্দা পরিধান করতে হবে।"

সেন্ট পলের শিক্ষা নারীদেরকে ধর্মানুষ্ঠান হতে বহির্গত করেছে এবং এজনই গীর্জায় গমন তাদের উচিত নহে। সেন্টপল নারীদেরকে কলরবকারী ও মূর্খ্য বলে ধারণা করতেন। এ জন্যই তিনি তাদেরকে ধর্ম প্রচার ও ধর্ম বিষয়ে অভিমত প্রদানের অনুমতি দেন নাই।

The woman should keep silince in the churches. For they are not permitted to speak; should be subordinates as even the law says, If there is anything they desire to know, let them ask their husbands at home. For it is shameful for a woman to speak is church.[২]

"নারীরা গীর্জায় নীরব থাকবে। কারণ, তাদিগকে কথা বলার অনুমতি প্রদান করা হয় নাই; তারা অধীন হয়ে থাকবে। ইহাই আইনরেও নির্দেশ। তারা কোন কিছু জানতে চাইলে বাড়ীতে তাদের স্বামীদিগকে জিজ্ঞাসা করে নিবে। কারণ, গীর্জায় কথা বলা নারীর পক্ষে লজ্জার বিষয়।"

---

১. Bible: Corinthous, 11:6-9.
২. Bible 1: Corinthiaus, 14:34-35.

Dhaka University Institutional Repository

চার্চের আইনে স্ত্রী জাতি নাপাক পদার্থ বলে বিবেচিত হতো। এই জন্যই নারীরা চার্চের "কুরবান গাহ" স্পর্শ করতে পারতোনা,যদি তাও নাপাক হয়ে বসে।

খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে খ্রীস্টানদের এক ধর্মীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এতে সাব্যস্ত হয়, নারীর আত্মা নাই (Woman has no soul) এবং দোজখ হল তার বাসস্থান। এর ব্যতিক্রম হল কেবল হযরত ঈসা (আঃ) এর মাতা হযরত মরিয়ম (আঃ)।

খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে জেরুযালেমের যে পাদ্রীদের মধ্যে এক ধর্মীয় কাউন্সিলে নারীদেরকে নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে নারী জাতির "আত্মা আছে কিনা, এবং নারী মানব জাতির অন্তর্ভূক্ত কিনা? এতে অনেকেই রায় পেশ করেছিলো যে, নারীর প্রাণ থাকলেও 'আত্মা' নেই। কাজেই সে মানুষ নয়। আবার কিছু সভ্য রায় পেশ করলেন, যদিও নারীকে মানব সীমার বাইরে ফেলা যায় না, তবুও সে সকল দোষের আধার। পুরুষের কল্যাণ ও দাসত্বের জন্যই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

যে ধর্মের নেতারা ধর্মকে মনগড়া করে নারীকে মানব সীমার বাইরে এক প্রাণবন্ত পশুর পর্যায়ে ফেলতে পারে, সেই ধর্ম বা সমাজ নারী জাতিকে কতোটুকু শ্রদ্ধাও ভালবাসা দান করতে পারে?

উপরোক্ত আলোচনা হতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আলোচিত ধর্ম সমূহের কোনটিই নারীকে তার অবস্থার উন্নয়নের জন্য সহায়কতো ছিলই না বরং প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছে।

আরবে নারীদের অবস্থাঃ

ইসলামের আর্বিভাবের অব্যবহিত পূর্বে আরবে নারীদের অবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক ছিল। তারা মানবরূপে পরিগণিত ছিল না। পুরুষ ও জীব জন্তুর মধ্যস্থলে ছিল তাদের অবস্থান। কন্যা-সন্তানের জন্ম সে দেশে এক চরম অভিশাপ বলে গণ্যহত।

আল-ইসলাম রুহুল মাদানিয়্যাহ গ্রন্থে শায়খ মুস্তফা আল-গালায়ীনী বলেনঃ

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পুরুষের অধিকৃত বিষয়-সম্পদের মধ্যে নারীর সহিত পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হত। নারীর মর্যাদা এত নীচ ছিল যে, তাদের তুলতায় পশুর প্রতি অধিকতর সুনজর দেয়া হত। সে অমন নিদারুণ অবস্থায় নিপতিত ছিল যে, দুনিয়ার অপর কোন জাতিই আরবদের ন্যায় নারীদিগকে এত অধিক অপমানিত ও নির্যাতিত করত না। কন্যা

Dhaka University Institutional Repository

সন্তান জন্মকে আরবগণ কুলক্ষণ ও অপমান জনক বলে মনে করত। নবজাত কন্যা সন্তান হত্যার নীতি বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। তাকে জীবন্ত বকর দিয়ে হত্যা করা হত। পণ্যদ্রব্যের মত তাদিগকে বিক্রয় ও করা হত এবং পশুর বদলে তাদিগকে বিনিময় করা হত। আরবদের সমাজে যেখানে যুদ্ধবিগ্রহ', তাদের নিত্যদিনের প্রধান কর্ম,সেখানে মেয়েদের ব্যাপারে তাদের এই বিরুপ মনোভাব ছিল স্বাভাবিক, কারণ যুদ্ধ বিগ্রহের ধকল সইবার ক্ষমতা শুধু পুরুষেরই থাকতে পারে এবং পুরুষের বীরত্বের মাধ্যমেই গোত্রীয় মানমর্যাদা ছিল নির্ভরশীল। রইলো নারীদের ব্যাপারে, তা তারাতো এ ধরণের কোন কাজেই আসতো না। বরং তারা ছিল শত্রুর লোভনীয় লক্ষ্য বস্তু। শত্রুরা তাদের মেয়েদের ক্রীতদাসীতে পরিণত করে তাদের সেবা এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহারও করত। এভাবে মেয়েরা ছিল গোত্রের জন্যে এক স্থায়ী বোঝা। কেননা সব সময় মেয়েদের নিরাপত্তার বিষয়টি তাদের দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। কেননা, তাদের মেয়ে শত্রুর অধিকারে যাওয়াটা ছিল গোত্রের জন্যে চরম অবমাননার বিষয়। এতে তাদের মাথা হেট হয়ে যেতো।

"নবজাত কন্যা সন্তানকে বিভিন্ন প্রকারে হত্যা করা হত। কেহ কেহ গর্ত খনন করে উহাতে জীবন্ত পুঁতে তাদিগকে হত্যা করত; কেহ খুব উচ্চস্থান হতে তাদেরকে নীচে নিক্ষেপ করত; আবার কেহ কেহ্ পানিতে ডুবিয়ে মারত বা কেটে ফেলত। এ সকল নির্যাতনের কারণে নারী মৃত্যুর নিকট আত্মসমর্পন করত যেন এরূপ মৃত্যুবরণের জন্যই তার জন্ম হয়েছে। স্ত্রী কন্যা-সন্তান জন্ম দিলে আরবগণ সমাজের ভয়ে ইহা গোপন রাখত, যেন ইহা ভীষণ পাপ অথবা স্থায়ী অমর্যাদার কারণ ছিল। এমন নৃশংস ও বর্বর ব্যবহারে নারীদের অধিকার অপহরণ করা হত যেন তারা কসাই খানায় নীত হওয়ার উপযোগী নির্বাক পশু ছিল।[১]

এমনিভাবে নারী পুরুষের নিকট হস্তচালিত যন্ত্রের ন্যায় ছিল-যা সে নিজ খেয়াল-খুশি মত ব্যবহার করে থাকে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর পয়গাম: ও পবিত্র কুরআনের অমিয় বাণী লয়ে আগমনের পূর্ব পর্যন্ত নারীদের উপর এরূপ অমানুষিক নির্যাতন চলছিল। ইহার পূর্বে কোন পুরুষ তার স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হলে তার কোন পুরুষ আত্মীয় তাকে স্বীয় চাদর দ্বারা ঢেকে ফেলত যেন লোকে তাকে দেখতে না পায়। বিধবাটি

---

[১]. আব্দুল খালেক, "নারী" (দ্বিতীয় প্রকাশ) দীনী পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৬।

Dhaka University Institutional Repository

সুন্দরী হলে সে আত্মীয় তাকে বিয়ে করত। আর সুন্দরী না হলে তাকে যাবজ্জীবন কারাগারে রাখা হত এবং কারাগারে মৃত্যুর পর সে তার সম্পত্তি দাবি করত।

কোন পুরুষ দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের ইচ্ছা করলে প্রথম স্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাত। ফলে তাকে প্রদত্ত সকল সম্পদ স্বামীকে দিয়ে সে তার নিকট হতে নিস্তার লাভ করত। এ সম্পদ সে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণে ব্যবহার করত।

"মদীনা শরীফে মৃত ব্যক্তি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তার বিধাবা স্ত্রীরও অধিকারী হত। বিধবা তার নিকট আমানত স্বরূপ গচ্ছিত থাকত এবং মুক্তিপণ না দেয়া পর্যন্ত সে তাকে অন্য স্বামী গ্রহণে বাধা প্রদান করত।"[১]

"সুমৃঙ্খল সমাজে জীবন সম্পর্কে প্রাচীন আরবদের কোন জ্ঞান ছিল না। তারা বিভিন্ন গোত্রে ও বংশে বিভক্ত হয়ে যাযাবররূপে বসবাস করত। গোত্রে গোত্রে তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। এ সকল যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষ বিজিত পক্ষের নারীদিগকে ধরে নিয়ে বিয়ে করত। এজন্যই আরবগণ কন্যা সন্তানদের জন্মকে ভয় ও ঘৃণা করত এবং পুত্র সন্তান জন্মকে পছন্দ করত। কারণ পূত্র সন্তান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও যুদ্ধের ময়দানে সাহায্যকারী হত। এ কারণেই আরবগণ কন্যাদিগকে জীবিত কবর দিয়ে হত্যা করত।"[২]

"This revolting custom prevailed extensively until it was supresyed by Muhammad peace be on him."[৩]

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দমন না করা পর্যন্ত এই নিদারুণ ঘৃণা প্রথা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল।

"অজ্ঞতার যুগে পিতার মৃত্যুর পর তার পুত্র মাতার উত্তরাধিকারী হত। সে নিজেই তাকে বিয়ে করতে পারত। অথবা নিজ ইচ্ছানুসারে যে কোন লোকের নিকট বিয়ে দিতে পারত আর সে তার বিয়ে বন্ধও করতে পারত। মাতা অন্য স্বামী গ্রহণ করতে চাইলে, পুত্রকে মুক্তিপণ দিতে হত।[৪]

---

১. Nazirah Zein Ed-Din, Edited by Aziah Al-Hibri: Wimen adn Islam, Pergamonpress, oxford, England. P.222.
২. Rustum and Zurayk: History of the Arabs and Arabic culture, Beirut, 1940, P.36.
৩. O'lerry, De lacy: Arabia Before Muhammad, London 1927, P.202.
৪. Said Abdullah Seif Al-Hatimy, Ibid, P-15.

Dhaka University Institutional Repository

আরব রমণীদের স্বামী নির্বাচনের কোন অধিকার ছিল না। পিতা বা তার কোন পুরুষ আত্মীয়ের তার স্বামী নির্বাচনের পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। মুতআ-বিয়ে (নারী পুরুষের মধ্যে চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের জন্য বিয়ে) এবং বহুপতি গ্রহণের প্রথা ও তৎকালে আরবে প্রচলিত ছিল। আরববাসী তার বৈমাত্রেয় বোন, বিমাতা, এমনকি তার বিধবা পুত্র বধূকেও বিয়ে করতে পারত। ভ্রাতার মৃত্যুর পর ভ্রাতৃবধূকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করতে পারত।[১]

বস্তুত স্ত্রীর উপর স্বামীর অপ্রতিহত কর্তৃত্ব নারীর মর্যাদা একেবারে হীন করে দিয়েছিল এবং নারী ভূ-সম্পত্তি ও লাখেরাজ সম্পদরূপেই পরিগণিত হত। জগতের তৎকালীন সভ্যতায় যেমন বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তদ্রুপ আরবেও বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। একজন পুরুষ কজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে সরকারী আইন, সামাজিক রীতি নীতি ও ধর্মের বিধানে এর কোন সীমা নির্ধারিত ছিল না; বরং সামর্থ্য থাকলে যে যত খুশি, বিয়ে করতে পারত।[২]

তখনকার আরবে প্রতিষ্ঠিত প্রতিতালয় না থাকলেও নারী পুরুষের মধ্যে শর্তাধীনে ও অস্থায়ীভাবে নির্দিষ্টকালের জন্য পতি-পত্নী সম্পর্ক অবাধেই স্থপিত হতে পারত। এতদ্ব্যতীত সমাজে নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে পেশাধারী, নর্তকী ও গায়িকা ছিল। তারা অবাধে পুরুষদের সহিত মেলামেশা করত এবং তারা মর্যাদাপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত আছে বলে জনগণ মনে করত।[৩]

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জাহেলিয়াতের যুগে তৎকালীন আরব সমাজেও নারী জাতি ছিল অবহেলিত ও লাঞ্ছিত। প্রাচীন অতীতে কোন সভ্যতায়ই নারীর আইনগত মান বা মর্যাদা ছিল না। ছিল না তাদের অর্থনৈতিক বা মানবিক অধিকার। রোমান ইতিহাস থেকে এটাও জানা যায় যে, নারীর নারীত্বই ছিল তার সবচেয়ে বড় অপরাধ এবং এই নারীত্বই তার অযোগ্যতা প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট ছিল।

জগতের বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীদের সহিত কি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে এবং কি নির্দয়ভাবে তাদের অধিকার অপহরণ করেছে, উহা অতিসংক্ষেপে উপরে বর্ণিত হল। এর সাথে তুলনা করলে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারব যে, ইসলাম নারীর মর্যাদা দানে কি বিরাট অবদান রেখেছে।

---

১. Jones Beven: Woman in Islam, Luck no; 1951, P.23, 28, 18-21, Smith, W: Kinshipant marriage in Early Arabia, London 1907, P.91-92; katrak, Jamshid: Marriage in Ancient Iran, Bombay, 1965, P.36; Thomas, Bertram: The Arabs, London 1937, P.16.

২. O'leary Delacy: Ibid P.191; Thomas, Bertram, Ibid. P.16.

৩. Ameer Ali: Ibid: Pp.24-25.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলাম ধর্মে নারীর স্থান

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে নারীর স্থান ও মর্যাদাঃ

(নারীর অবস্থার উন্নয়নে ইসলাম ধর্মের ভূমিকা)

জগতের বিভিন্ন ধর্ম ও জড়বাদী সভ্যতা নারীজাতির উপর পাপ ও অপবিত্রতার যে কলঙ্ক লেপন করেছে, ইসলাম এক প্রচন্ড আঘাতে উহা মোচন করে দিয়েছে। ইসলাম ঘোষণা করে, নারী ও পুরুষ একই উৎস হতে উদ্ভুত। অতএব, নারী পাপী বলে পরিগণিত হলে পুরুষ ও পাপী বলে গণ্য হওয়া উচিত। আর পুরুষের মধ্যে মহত্বের কোন স্ফুলিঙ্গ থাকলে নারীর মধ্যেও উহা থাকা আবশ্যক।

খ্রীস্টানগণ বলেন, নারী হৃদয়হীন জন্তু এবং তাকে যৌন অনুভূতিহীন ভাবেই সারাজীবন অতিবাহিত করতে হবে। ইসলাম তাদের এ দাবিও খন্ডন করেছে। পবিত্র কুরআন দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেঃ

بسم الله الر حمن الرحيم

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيما

যার অর্থ এই-

"নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী তাদের সকলের জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেণ।[১]

[১] . আল-কুরআন, ৩৩:৩৫,

Dhaka University Institutional Repository

"নারীই সর্বপ্রথম প্রতারিত হয়েছিল। সুতরাং নারীই হযরত আদম (আঃ) এর পতনের জন্য দায়ী।" বাইবেলের এই উক্তি ও খন্ডন করে ইসলাম। ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে, হযরত আদম (আঃ) এবং হযরত হাওয়া (আঃ) উভয়েই যুগপৎভাবে প্রতারিত হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁরা উভয়েই পতনের জন্য সমানভাবে দায়ী। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَـــذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ ० فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ

আর আমি বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গী বেহেশতে বসবাস কর এবং যা ইচ্ছা আহার কর। তবে এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না। হলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভূক্ত হবে। কিন্তু শয়তান ইহা হতে তাদের পদস্খলন ঘটাল এবং তারা যেখানে ছিল, সেখান হতে তাদিগকে বহিস্কার করল।[১]

"না পুরুষ নারীর জন্য এবং নারী পুরুষের জন্য সৃষ্টি হয়েছে।" খ্রীস্টধর্মের এই ঘোষণার প্রতিবাদে পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক ঘোষণা করেনঃ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের পোশাক এবং তোমরা (স্বামীগণ) তাদের পোশাক।"[২]

অর্থাৎ পোশাক ও দেহের মধ্যে যেমন কোন আবরণ থাকে না; বরং উভয়ের পরস্পর সম্পর্ক ও মিলন একেবারে অবিচ্ছেদ্য, তদ্রুপ সম্পর্কই তোমাদের ও তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্যে বিরাজমান রয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক আরও বলেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء.

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন ও তাদের দুজন হতে বহুনর-নারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করেছেন।"[৩]

---

১. আল-কুরআন, ২:৩৫-৩৬
২. আল-কুরআন, ২:১৮৭
৩. ঐ, ৪:১

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে মাটি দ্বারা হযরত আদাম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন। পরে তাঁর দেহ হতে আদি নারী হযরত হওয়া আলায়হাস্-সালামকে পয়দা করেন। অতঃপর তিনি তাঁদিগকে স্বামী-স্ত্রীরূপে বিবাহে আবদ্ধ করেছেন। হাদীস শরীফে আরও উক্ত আছে, নারী পুরুষের জমজ জোড়ার অর্ধাংশ।

ইসলাম নারীকে পুরুষের সমমর্যাদা প্রদান করেছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে যে ব্যবধান, রয়েছে, তা কেবল দৈহিক ও সৃষ্টিগত কারণে। ইসলাম শ্রম বিভাগের নীতিতে বিশ্বাসী। কঠোর শ্রমসাধ্য এবং গৃহের বাইরের রূঢ় ও কর্কশ কর্ম সম্পাদন ও জীবিকা অর্জনের দায়িত্ব ইসলাম পুরুষের উপর ন্যস্ত করেছে। ইসলাম গৃহকেই নারীর সর্বপ্রথম কর্মস্থল বলে মনে করে এবং গৃহের ব্যবস্থাপনা, সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও শিশুদের শিক্ষা দান কার্য নারীদের ওপর সমর্পণ করেছে। ইসলাম নারীকে বিদ্যার্জনে বিশেষভাবে প্রণোদিত করে এবং প্রয়োজনে জাতির উন্নয়নমূলক ও জাতি গঠন কার্যে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করে। অফিস ও কল-কারখানার কার্যাবলী ইসলাম নারীর রুচি ও প্রকৃতি বিরুদ্ধবলে মনে করে এবং নারী ও পুরুষকে তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে উভয়ের সমন্বয়, সহানুভূতি ও প্রেম-প্রীতির সহিত কার্য সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে।

পারিবারিক বিষয়াদি পরিচালনার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব কার উপর ন্যস্ত থাকবে, এ সমস্যা এড়ানো যায় না। ইহা অনস্বীকার্য সত্য যে, কর্ম পন্থার ঐক্য না থাকলে সুস্থ পরিচালনা সম্ভব নহে এবং একাধিক ব্যক্তির উপর চূড়ান্ত কতৃত্ব ন্যস্ত থাকলে কর্মপন্থায় ঐক্য থাকতে পারে না। এ জন্য একজনের উপরই চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকা নিতান্তই আবশ্যক।

মুসলিম পরিবারে মাতাকে পিতা অপেক্ষা অধিক, ভগ্নিকে ভ্রাতা অপেক্ষা অধিক এবং কন্যাকে পুত্র অপেক্ষা অধিক মর্যদা দান করা হয়েছে। কিন্তু পরিচালনার ব্যপারে স্ত্রীর উপর নহে; বরং স্বামীর উপরই চূড়ান্ত কর্তৃত্ব অর্পিত হয়েছে। এতদসঙ্গে স্বামীর উপর স্ত্রীর যাবতীয় সুখ-সুবিধা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে এবং স্ত্রীর উপর কোন প্রকার অন্যায় সাধনে স্বামীর প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হযেছে। অন্যায় করলে স্বামীকে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও শাস্তির ভীতি প্রদর্শণ করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dhaka University Institutional Repository

"নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষের কিছুটা মর্যাদা আছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১]

কোন কোন ধর্মে নারীকে "An organ of Satan" (শয়তানের অঙ্গ) বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামে নারী শয়তানে অঙ্গ নহে; বরং ইসলাম তাকে 'মুহ্সানহ' (সংরক্ষিত দূর্গ) বলে আখ্যায়িত করেছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "মাতার পদতলে সন্তানের বেহেশত।"[২]

"ইহাতে মাতৃজাতিক অতীব উচ্চ মর্যদা প্রদান করা হয়েছে। তিনি বিদ্যা অর্জনকে নর-নারী উভয়ের জন্যই ফরয (অবশ্য কর্তব্য) বলে ঘোষণা করেছেন।"[৩]

নারী-পুরুষের বিবাহ্ বন্ধনকে কোন কোন ধর্মে ও সভ্যতায় অগ্রাহ্যের দৃষ্টিতে অবলোকন করা হয়েছে এবং ইহাকে ক্ষতিকর ও অপমানজনক মনে করা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) চিরকালের জন্য ঘোষণা দিয়ে বলেছেনঃ "বিবাহ্ আমার সুন্নত এবং যে ব্যক্তি আমার সুন্নত পরিত্যাগ করে, সে আমার দলভূক্ত নহে।"[৪]

তিনি আরও বলেনঃ "যে ব্যক্তি বিবাহ করল, সে ধর্মের অর্ধেক সম্পন্ন করল।"(বায়হাকী) এরূপে তিনি বিয়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

তিনি নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে আরও বলেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলা নারীদের প্রতি সম্মানের সহিত আচরণ করতে আমাদিগকে আদেশ করেছেন। কারণ, তারা আমাদের মাতা, কন্যা, ফুফু, খালা, মামী ইত্যাদি দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুর মূল্য আছে। কিন্তু জগতে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হল ধার্মিকা নারী।[৫]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

"আর তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে অপর একটি নিদর্শন এই, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সাঙ্গীদিগকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও

---

১. আল-কুরআন,২:২২৮
২. আবূ আবদিল্লা মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ ইবন মাজা, সুনান, বৈরত, দরুল ইহ্দাউত তুরাম, ১ম সং. (কিতাবুল জিহাদ) পৃষ্ঠা-৯২৯।
৩. আবূ আবদিল্লা মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ ইবন মাজা, সুনান, রিয়াদ, তারিখ বিহীন, ইলম অধ্যায়, হাদীস নং-২২৪।
৪. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বীন ইসমাইল, সহীহুল বুখারী, বৈরুত, তারিখ বিহীন, ২য় খন্ড, হাদীস নং-৪৬৭৫।
৫. ইমাম মুসলিম, সহিহ মুসলিম, বৈরুত, দারুল ইহইদাউত তুরাস, তারিখ বিহীন, ২য় খন্ড, كتاب الرضاع এর باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة অধ্যায়ের ২৬৬৮ নং হাদীস।

Dhaka University Institutional Repository

এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বও ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।”[১]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনুসারীদিগকে তাদের স্ত্রীদের সহিত উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে বলেনঃ

ক) প্রেম-প্রীতির সহিত তাদের সঙ্গী হয়ে থাক। তোমরা তাদিগকে ঘৃণা করলে হতে পারে যে, তোমরা যে বস্তু ঘৃণা কর। তাতেই আল্লাহ তা'আলা অনেক কল্যাণ রেখেছে।

খ) তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা তাদের স্ত্রীদের সহিত উত্তম ব্যবহার করে।

গ) মুসলমান অবশ্যই তার স্ত্রীকে ঘৃণা করবে না। সে যদি তার কোন মন্দ স্বভাবের জন্য অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে, তবে সে যেন তার মধ্যে যে সৎ স্বভাব রয়েছে, তাতে সন্তুষ্ট থাকে।

ঘ) যে মুসলমান তার স্ত্রীর সহিত যত ভদ্র ও সদাশয়, তার ঈমান ততই পূর্ণতা লাভ করেছে।(তিরমিযী)

ঙ) নারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় কর।[২]

চ) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নারীদিগকে তাদের গৃহের কর্ত্রী বলে আখ্যায়িত করেছেন।(বুখারী)

তিনি আরও বলেনঃ

যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমজান শরীফের রোযা রাখে, সতীত্ব রক্ষা করে এবং স্বামীর অবাধ্য হয় না, যে কোন দরজা দিয়ে বেহেশ্তে প্রবেশ করার জন্য তাকে বলে দাও।

তাক্ওয়ার পর মু'মিনের সর্বোত্তম সম্পদ হল ধার্মিকা স্ত্রী, যে স্বামীর আদেশ মেনে চলে।(তিরমিযী)

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে নারী পুরুষ হতে স্বতন্ত্র কোন স্বাধীন সত্তার অধিকারী ছিল না। ইসলামেই তার স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত হয়েছে। সে স্বাধীন ভাবে কোন ব্যবসায়ে অনুপ্রবেশ করতে পারে এবং তার স্বনামে নিজ দায়িত্বে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে পারে। মাতা, স্ত্রী, বোন ও কন্যা হিসাবে সে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে। ইসলামই তাকে স্বীয় স্বামী গ্রহণের অধিকার দিয়েছে। ইসলামের পূর্বে কোন, ধর্ম, আইন ও সভ্যতাই নারীকে এই সকল অধিকার প্রদান করে নাই।

---

[১]. আল্-কুরআন, ৩০:২১

[২]. আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়্যাযীদ ইবন মাজা, সুনান, রিয়াদ, তারিখ বিহীন, খন্ড ২, كتاب المناسك হা. নং-৩০৭৪, পৃ.১০২৫।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিঃ (মানব-সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য)

সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লয়ে মহান আল্লাহ্ মানব সৃষ্টি করেছেন। এই প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে তিনি বলেনঃ

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً

মহিমান্বিত তিনি, যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। যিনি মৃত্যু ও জীবন তোমাদিগকে পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম।[১]

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ اللّهِ حَقّاً إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ.

তাঁরই নিকট তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সৃষ্টিকে তিনি অস্তিত্বে আনেন। অতঃপর তার পুনরাবর্তন ঘটান-যারা বিশ্বাসী ও পূণ্যশীল, তাদিগকে ন্যায়বিচারের সহিত কর্মফল প্রদানের জন্য। আর যারা অবিশ্বাসী, তারা অবিশ্বাস করত বলে তাদের জন্য রয়েছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।[২]

وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً.

যখন তাঁর আরশ পানির উপর ছিল, তখন তিনিই আকাশ মন্ডল ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেন, তোমাদের কে আচরণে শ্রেষ্ঠ, তা পরীক্ষা করার জন্য।[৩]

উপরোক্ত আয়াতসমূহ প্রমাণ করে যে, আত্মিক উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হওয়ার সুযোগ-সুবিধা করেই আল্লাহ্ তা'আলা মানব সৃষ্টি করেছেন এবং আত্মীক উন্নতিই তার পরম কাম্য। সে নির্জনবাস অবলম্বন করবে না; বরং আত্মীয়-স্বজন, স্বজাতি ও বৃহত্তর মানব-সমাজে বসবাস করবে। নিছক ব্যক্তিগত কর্তব্য ছাড়াও আপনজন, বন্ধু-বান্ধব এবং সমগ্র মানব-সমাজের প্রতি তার উপর আরোপিত কর্তব্য তাকে অবিরত পরীক্ষার সম্মুখীন করে রাখবে। এই কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমেই তাকে মানব-জীবনের পরম ও চরম লক্ষ্য,

---

১. আল-কুরআন, ৬৭:১-২
২. আল-কুরআন, ১০:৪
৩. আল-কুরআন, ১১:৭

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতে হবে। এই মানবীয় কর্তব্যের প্রতি কে কতটুকু সাড়া দিতে পারল, ইহা দ্বারাই প্রতিটি ব্যক্তির জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা নিরূপিত হবে।

পার্থিব উন্নতি ও অগ্রগতিকে ইসলাম নিন্দনীয় বলে না; বরং উহাকে উৎসাহিত করে; তবে পরকালকে বিসর্জন দিয়ে নহে। মানবীয় সম্পর্ক অটুট ও শান্তিপূর্ণ রেখে দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণলাভের পথই ইসলাম প্রদর্শণ করে। সুতরাং নারী পুরুষের সম্বন্ধে ইসলামের শিক্ষা বিষয়ে কোন উক্তি করতে হলে এদিকে লক্ষ্য রেখেই বলতে হবে।

ইসলামে মানবতার সাম্যঃ

ইসলাম সমগ্র মানবতার সাম্য ঘোষণা করেছে। বর্ণ, ভাষা ভৌগোলিক সীমারেখা এই সাম্যে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। সাদা-কালো, ইংরেজ বাঙ্গালী, চীনা মালয়েশীয়, আমেরিকান-এশিয়াবাসী, আরব-অনারব-দুনিয়ার সকল মানুষই একই গোষ্ঠীর আন্তর্ভূক্ত। জাতি ধর্ম-বর্ণ, ভাষা-ভৌগোলিক সীমার পার্থক্য এখানে একেবারে বিলীন হয়ে গিয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"হে মানব আমি তোমাদিগকে এক পুরুষ এবং এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি। পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহ তায়ালার নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী-সাবধানী। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।"[১]

ব্যাখ্যাঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "সকল মানুষই চিরুনীর শলাকার ন্যায় সমান। আরবের অনারবের ওপর, সাদা কালোর উপর পুরুষের নারীর উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। কেবল মুত্তাকী লোকদের জন্য তাঁর নিকট অধিক মর্যাদা রয়েছে।"[২]

এখানে বুঝায় যে-ইহাও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, ইসলামের আর্বিভাবের সঙ্গে সঙ্গে নীতি অস্বীকার করে চলে আসছিল বলে তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সহিত

---

১. আল-কুরআন, ৪৯:১৩

২. আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বলৎ, "মুসনাদে দারিমী," কায়রো, ষষ্ঠ খন্ড, ১৯৩০, পৃষ্ঠা-৪১১।

Dhaka University Institutional Repository

তর্ক-বিতর্ক করত-"আপনি কিরূপে বলতে পারেন যে, আমাদের নারী ও দাস-দাসীগণ আমাদের সমমর্যাদা সম্পন্ন?"[১]

আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অতীব সুন্দর ভাবে তাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ কারো প্রতি পক্ষপাত দুষ্ট নন। আল্লাহর নিকট নারী-পুরুষ, দাস আমীর সবাই সমান।

ইসলামে নারী-পুরুষের সাম্যঃ

নারী-পুরুষের সাম্য ঘোষণা করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেনঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

"ঈমানদার অবস্থায় যে কেহ্ সৎকর্ম সম্পাদন করবে, পুরুষ হউক বা নারী হউক, তাকে আমি অবশ্যই পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাদিগকে দিব।"[২]

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ

"অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের কর্মনিষ্ঠ পুরুষ বা নারীর কর্ম বিফল করি না, তোমরা পরস্পর সমান।"[৩]

وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً

"পুরুষ যা উপার্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা উপার্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ।"[৪]

لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً

"মাতাপিতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং মাতাপিতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীর ও অংশ আছে। উহা অল্পই হউক বা বেশিই হউক, (তাদের জন্য) এক নির্ধারিত অংশ (রয়েছে)।"[৫]

---

১. Alfred Guillaume, "The life of Muhammad," Oxford University Press, 1955, P.199.

২. আল্-কুরআন, ১৬:৯৭

৩. আল্-কুরআন, ৩:১৯৫

৪. আল্-কুরআন, ৪:৩২

৫. আল্-কুরআন, ৪:৭

Dhaka University Institutional Repository

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"ঈমানদার নর-নারী পরস্পর বন্ধু। তারা সৎকার্যের নির্দেশ দেন এবং অসৎকার্য প্রতিরোধ করে, যথাযথভাবে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করে। তাদিগকেই আল্লাহ্ কৃপা করেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[১]

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী, তাদের প্রত্যেককে একশ কশাঘাত করবে। আল্লাহ্ তা'আলার বিধান কার্যকর করণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদিগকে অভিভূক্ত না করে, যদি তোমরা আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাসী হও।[২]

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হস্তচ্ছেদন কর। ইহা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর নির্ধারিত আদর্শ দন্ড। বস্তুত আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৩]

নারী-পুরুষের সাম্যের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক আরও বলেনঃ

"ঈমানদার পুরুষদিগকে আপনি বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং তাদের যৌন-অঙ্গ সাবধানে সংযত রাখে। ইহাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে, আল্লাহ্ সে বিষয়ে অবহিত। ঈমানদার নারীদিগকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে। তারা যা সাধারণত প্রকাশ করে থাকে, তা ব্যতিত তাদের আভরন প্রদর্শণ না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে।"[৪]

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً.

---

১. আল্-কুরআন, ৯:৭১
২. আল্-কুরআন, ২৪:২
৩. আল্-কুরআন, ৫:৩৮
৪. আল্-কুরআন, ২৪:৩০-৩১

Dhaka University Institutional Repository

"নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী , ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী তাদের জন্য আল্লাহ তা"আলা ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন।"[১]

উপরোক্ত আয়াত সমুহে নারী-পুরুষ উভয়কেই কর্মের দায়িত্বশীল করা হয়েছে। তাহাদিগকে সমভাবে আইনের অনুগত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সৎকর্মের পুরস্কার ও অসৎকর্মের শাস্তি প্রদানের ওয়াদা করা হয়েছে। নর-নারী উভয়কেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। পুরুষ যাহা উপার্জন করে, ইহা তার প্রাপ্য ও নারী যা উপার্জন করে, ইহা তার প্রাপ্য এবং মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উভয়ের উত্তরাধিকার ঘোষণা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন হাদীসে এই সকল অধিকারের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে এবং উৎসসমূহ অবলম্বনে ফিকহ্শাস্ত্রে এইগুলির বর্ণনা আরোও বিস্তৃত। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতেও অধিকার এবং উহা ভোগ দখল ও হস্তান্তরের পর হতে বহু শতাব্দী যাবত নারী-পুরুষ উভয়েই এই অধিকার সমভাবে ভোগ করে আসছে।

নারী-পুরুষ একই মৌলিক উপাদানে সৃষ্ট বলে উভয়েই আইনের চোখে, নৈতিক ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারে সঙ্গতভাবেই সমতা দাবি করতে পারে। কিন্তু এ কথা সত্য যে, তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট দৈহিক পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে-যা উভয়ের শারিরীক ও মানবিক ধাত-প্রকৃতি ও মেজাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। আর এজন্যই বাস্তব কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষরে ভূমিকা কিছুটা হলেও বিভিন্নতা রয়েছে।

ইসলামে দুহিতা রূপে নারীঃ

ইসলামে নারীকে মর্যাদা দেয়া হেয়েছে। নারীকে প্রথম মর্যাদা দেয়া হয়েছে কন্যারূপে। পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত এলোমেলোভাবে কোন শিশুই নারী বা পুরুষ হয়ে ধরা ধামে আগম করে না; বরং নভোমন্ডলের একচ্ছত্র অধিপতি মহাপরাক্রমশালী ও পরম কৌশলী মহান আল্লাহ্ই শিশুটি নর হবে কিংবা নারী হবে, নির্ধারণ করে দেন। সে নর বা নারী যাই হয়ে থাকুক না কেন, ঈমানদারের পক্ষে এতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। নারী ও পুরুষ উভয়ের উপরই মহান

[১]. আল্-কুরআন, ৩৩:৩৫

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। এ দায়িত্ব উভয়কেই সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদন করতে হবে। ছেলে বা মেয়ে যাহাই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, ইহা লয়েই আল্লাহ তায়ালার নিকট কৃতজ্ঞ থাকা আবশ্যক। কন্যা-সন্তান জন্মে অনীহা ছিল প্রাক ইসলামী যুগের মানসিক বিকৃতি। এই জন্যই কন্যা সন্তানকে জীবিতাবস্থায় প্রোথিত করা হত অথবা সামাজিক অবজ্ঞার শিকার হয়ে তাকে জীবিত থাকতে দেয়া হত। এ অবজ্ঞা প্রসূত দৃষ্টিভঙ্গিতে অবমাননার মনোভাব ইসলাম সফলতার সাথে রহিত করে দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ○ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ○ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

"আকাশ মন্ডল ও ভূ-মন্ডলের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্রই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা তিনি কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দিয়ে থাকেন। অথবা দান করেন পুত্র-কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।"[১]

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ○ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

"তাদের কাকেও যখন কন্য-সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখমন্ডল কাল হয়ে পড়ে এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়ে। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, ইহার গ্লানিহেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। (সে চিন্তা করে) হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে, না মাটিতে পুঁতে দিবে। সাবধান,তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট।"[২]

ইসলাম মানবতা-বিরোধী ভাবধারার প্রতিবাদ করেছে। এ কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং কন্যা-সন্তানকে পুরুষ ছেলের মতই জীবনে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে। আর কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রেথিত করা হলে কাল কিয়ামতের দিন যে তার পিতাকে আল্লাহর দরবারে কঠোর ভাবে জবাব দিহি করতে হবে, তা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছেঃ

وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ ○ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ

---

১. আল্-কুরআন, ৪২:৪৯-৫০
২. আল-কুরআন, ১৬:৫৮-৫৯

Dhaka University Institutional Repository

যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কি অপরাধে তোমাকে হত্যা করা হয়েছিল?[১]

এ কারণে নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ "যে লোকের কোন কন্যা-সন্তান রয়েছে এবং সে তাকে জীবন্ত প্রোথিত করেনি এবং তাকে ঘৃণার চোখেও দেখেনি, তার উপর নিজের পুত্র সন্তানকে অগ্রাধিকারও দেয়নি, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশত দান করবেন।[২]

আরব জাহেলিয়াতের সমাজে নারী ও কন্যাকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চরমভাবে পঙ্গু করে রাখা হত। তাকে পিতার মীরাস লাভের অধিকার মনে করা হত না। বরং সেখানে মীরাস দেয়া হত সেসব পুত্র-সন্তানকে, যারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর সঙ্গে মুকাবিলা করতে পারত। নারীদের মীরাসের অংশ দেয়াতো দূরের কথা, স্বয়ং এই নারীদের ও মীরাসের মাল মনে করা হত এবং পুরুষরা তাদের নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিত। কন্যা সন্তানের প্রতি চরম অমানবিক অবজ্ঞা এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও সভ্যতার চরম উন্নতির যুগেও যত্রতত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আধুনিক চীনের দুজন নারীকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে শুধু এ অপরাধে যে, তারা কেবল কন্যা সন্তানই প্রসব করেছে, স্বামীকে কোন পুত্র সন্তান উপহার দিতে পারেনি।

কন্যা সন্তানের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ.

"দারিদ্রের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদিগকে হত্যা করবে না। আমিই তোমাদের ও তাদের জীবিকা দিয়ে থাকি।"[৩]

ইসলাম মানবতা বিরোধী অনেক অবমাননাকর রীতি চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে। কুরআনে নারীকে কন্যাকে ও পুরুষের মতই মীরাসের অংশীদার করে দেয়া হয়েছে। যদিও পুরুষদের তুলনায় তাদের অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব কম বলে পুরুষদের অপেক্ষা তাদের অংশ অর্ধেক রাখা হয়েছে।

---

১. আল-কুরআন, ৮১:৮-৯

২. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ'আস, সুনান, ৫ম খন্ড, কিতাবুল আদব, সিরিয়া দারুল হাদীস, ১ম সং ১৯৭৩, হা. নং-৪৪৮০, পৃ.৩৫৪

৩. আল্-কুরআন, ৬:১৫১

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

"আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদের বিশেষ অর্থনৈতিক বিধান দিচ্ছেন। তিনি আদেশ করেছেন, একজন পুরুষ দু'জন মেয়েলোকের সমান অংশ পাবে। কেবল মেয়ে-সন্তান দুজন কিংবা ততোধিক হলে তারা পরিত্যাক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি একজন মাত্র কন্যা হয়, তাহলে সে মোট সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।"[১]

এ আয়াতে মেয়েদেরকেও পুরুষছেলেদের সমান সম্পত্তির অংশীদার বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাধারণ লোক এ আইনকে ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা বলল, এদের মধ্যে কেউতো এমন নয় যে, যুদ্ধে গিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করতে পারে। এ মনোভাবের প্রতিবাদ করে কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতে কন্যা-সন্তানকে বিয়ের পূর্বেই এমন পরিমাণ মীরাস লাভের অধিকার দেয়া হয়েছে, যা তার জন্যে যথেষ্ট হতে পারে।

কন্যা সন্তানদের প্রতি জাহেলী যুগে বড় অত্যাচার করা হতো। কন্যা শিশুদেরকে জিন্দা করব দেয়া হতো, নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হতো অথবা পাহাড়ের চূড়া থেকে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হতো। ইসলাম এ অত্যাচার ও যুলুম বরদাশত করেনি। ইসলামের শিক্ষা হলো- "কন্যা প্রতিপালনে অনেক পূণ্য।" হাদীস শরীফে আছে-"যে ব্যক্তি দুটি কন্যা সন্তানকে বয়োপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন পালন করবে সে ও আমি কেয়ামতের দিন এতটুকু কাছা কাছি থাকবো," এই বলে হুযুর (সাঃ) ইশারায় তার দুই আঙ্গুলকে মিলিয়ে নৈকট্যের পরিমাণ প্রদর্শণ করলেন।[২]

আর একবার নবীকরীম (সাঃ) বলেছেন-"যে ব্যক্তি তিনিটি কন্যা বা তিনজন বোনকে প্রতিপালন করে তাদেরকে ইসলাম আদব কায়দা শিক্ষা দেবে এবং তাদের প্রতি স্নেহ-মমতা প্রদর্শণ করবে, তাদের বিয়ে দিয়ে আত্মনির্ভরশীলতা করে দেবে, সে ব্যক্তির জন্য বেহেশশত নির্ধারিত হয়ে আছে।"[৩]

---

১. আল-কুরআন, ৪:১১

২. ইমাম আহম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, মুসনাদে আহম্মদ, মক্কা, দারুল হায, ২য় সং. ১৯৭৮ ইং, খন্ড-৩য়, পৃ.১৪১, হা.নং-১২০৪১

৩. ইমাম আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ বিন 'ঈসা তিরমিযী, সুনান, মিশর, মাতবা'আ, মুস্তাফা, তারিখ বিহীন, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩১৮, কিতাবুল বির, হাদীস নং-১৮৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

এ ধরণের আরেকটি হাদীস আছে, তাতে রয়েছে মেয়েদের লালন-পালন তার জন্য দোযখে যাওয়া হতে প্রতিবন্ধক হবে।

من ابتلى من البنات بشىء فاحسن اليهن عن له سترامن النار–

"যাকে মেয়েদের দ্বারা পরীক্ষা করো হয়েছে,-অতপর সে উত্তমভাবে লালন-পালন করল, তবে এ মেয়েরা তার জন্য দোযখ থেকে প্রতিবন্ধক হবে।"[১]

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর চার কন্যা ছিলেন। তিঁনি তাঁহাদিগকে অতি স্নেহযত্নে লালন-পালন করে। তাঁদের বিবাহিত জীবনেও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। কনিষ্ঠা কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) ব্যতীত তিন কন্যাই তাঁর জীবদ্দশায় ইনতিকাল করেন। তাঁদের ইনতিকালে তিনি নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেন। বিয়ের পর হযরত ফাতিমা (রাঃ) স্বামীর সহিত দূরে চলে গেলে তিনি একটি নিকটবর্তী বাড়ী ভাড়া করে তাঁদিগকে তাঁর সান্নিধ্যে নিয়ে আসেন। তিনি কন্যা ফাতিমা (রা) সম্বন্ধে বলতেন, "ফাতিমা আমারই অংশ বিশেষ। যে ব্যক্তি তার প্রতি অন্যান করে, সে আমার উপরই অন্যায় করল এবং যে তাঁকে সন্তুষ্ট করল সে আমাকে সন্তুষ্ট করল।"[২]

"একদা জনৈক ব্যক্তি তার মেয়ের মৃত্যু কামনা করল, এতে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ) রেগেগিয়ে বললেন, তুমি কি তাকে রিয্ক দাও।"

সাহাবায়ে কিরাম প্রতিটি বিষয়ে চেষ্টা করতেন রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাতের অনুসরণ করতে। এ কারণেই তাদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আসে। কেননা তারা রাসূল (সাঃ) কে দেখেছেন স্বীয় মেয়েদেরকে আদব-স্নেহ, মায়া-মমতা করতে।

একদিন যে আরব সমাজ মেয়েদের জীবিত রাখাও তাদের লালন-পালনকে লজ্জার বিষয় মনে করত, এখন তারাই ইসলামের পরশে আবাার ইয়াতীম মেয়েদের লালন-পালন নিয়ে প্রতিযোগীতা আরম্ভ করেছে।

"হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রাযিঃ) হযরত হামযা (রাযিঃ)-এর মেয়েকে মক্কা থেকে যখন মদীনা নিয়ে এলেন, তখন আলী (রাযিঃ) ও জাফর (রাযিঃ)-এর মাঝে মতানৈক্য শুরু হয়। হযরত জাফর (রাযিঃ) বললেনঃ মেয়েটি আমার লালন পালনে দেয়া হোক। আমি তার

[১]. ইমাম বুখারী, সহীহ, বৈরুত, খন্ড-২, কিতাব-যাকাত, পৃষ্ঠা-৫১৩; ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী: ২য় খন্ড, পৃষ্টা-৩৩০, হা, নং-৪৭৬৩।

[২]. ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

যোগ্য। কেননা, সে আমার চাচাত বোন এবং তার খালা-যে তার মায়ের মত আমার বিবাহ বন্ধনে আছে।

হযরত আলী (রযিঃ) বললেনঃ মেয়েটি আমার ও চাচাত বোন এবং আমার বিবাহ বন্ধনে স্বয়ং রাসূল (সাঃ)-এর মেয়ে আছে, সে মেয়ের সবচেয়ে বড় অধিকারিণী। হযরত যায়েদ (রাযিঃ) বললেনঃ যেহেতু মেয়েটিকে আমিই মক্কা থেকে নিয়ে এসেছি। তাই আমি তার অধিক হকদার, আমার লালন-পালনে সে থাকবে। সবার বক্তব্য শ্রবণ করে রাসূল (সাঃ) হযরত জা'ফর (রাযিঃ)-এর পক্ষে ফয়সালা দিলেন যে, মেয়েটি তার তত্ত্বাবধানে থাকবে।"[১]

রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর অভ্যাস ছিল-যখন কোন সফরে যাওয়ার ইচ্ছে করতেন, তখন সবশেষে হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) এর নিকট গমন করতেন। তাকে দেখতেন। যখন আবার সফর থেকে আসতেন, তখন তিনিই আবার রাসূল (সাঃ) এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হতেন। যখন তিনি পিতার নিকট যেতেন, তখন পিতার আদর করে তাঁর কপালে চুমুখেয়ে আবার আপন স্থানে এসে বসতেন।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা হযরত যয়নব (রাযিঃ) এর দুহিতা হযরত ওসামা (রাঃ)-কে প্রায়ই তাঁর কোলে দেখা যেত। অনেক সময়, এমনকি নামাজে লিপ্ত থাকলেও তিনি রাসূল (সাঃ) এর কাঁধে চড়ে বসতেন। সিজদা দেয়ার সময় তিনি তাঁকে মেঝোয় বসিয়ে দিতেন এবং সিজদা হতে উঠলেই তিনি পুনরায় তাঁর কাঁদে যেয়ে বসতেন।

পিতা জীবিত থাকতে ছেলের বালেগ হওয়া পর্যন্ত তার লালন পালন করা যেমন পিতার কতর্ব্য, মেয়ের বিয়ে হওয়া পর্যন্ত তার জন্যেও পিতার অনুরূপ কর্তব্য রয়েছে। উপরন্তু ছেলে বড় হলে পিতা তাকে আয়-রোজগার করার জন্যে বাধ্য করতে পারে; কিন্তু কন্যা সন্তানকে তা পারে না।

ইসলাম ধর্ম পিতার দৃষ্টিতে মেয়েকে শুধু প্রিয়-ই করেনি, বরং আইনগত তার অধিকার ও দিয়েছে যে, ছেলের মত পিতার সম্পত্তিতে মেয়ের ও নির্দিষ্ট অংশ আছে। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মেয়ের অংশ যা ইসলাম দান করেছে, এ ধরণের অধিকার প্রদানের দৃষ্টান্ত নতুন পুরাতন কোন ধর্মে পাওয়া যায় না। এদিক থেকে তার উপর ইসলামের অনুগ্রহ একক প্রশংসার দাবিদার।

---

[১]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ২য় খন্ড

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে বোনের মর্যাদা (বোন রূপে নারী)ঃ

ইসলাম মেয়েদের ব্যাপারে যে ঘোষণা ব্যাপকভাবে দিয়েছে, তা প্রভাব আত্মীয়-স্বজন মহিলাদের উপরও পড়েছে। পাশাপাশি নিকট আত্মীয়দের সাথে বিশেষ সদাচরণ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ)-এর বিশেষ বাণী সমূহ এবং আল-কুরআনে নিকট আত্মীয়দের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলী সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে "বোনের" ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) এর ঘোষণা সাহাবায়ে কিরামের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তাব করেছে যে, "বোনের লাল-পালন বেহেশতে প্রবেশ করার মাধ্যম।"[১] এ হাদিসটির বর্ণকারী হলেন আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিঃ)।

অন্যএক হাসিসে বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি দুটি বোনের ভার গ্রহণ করেছে এবং সে তাদের সঙ্গে ধৈর্যের সহি সদ্ব্যবহার করে, সে এবং আমি বেহেশতে এই ভাবে থাকব।"

এই বলে রাসূল (সাঃ) স্বীয় তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলীর দিকে ইঙ্গিত করলেন।[২]

ইসলামে উক্ত গুরুত্বারোপের পাশাপশি আইনগত ভাবে ভাইয়ের উপর কানুন করেছে যে, যদি কোন মেয়ের বাবা-মা বেঁচে না থাকে, তবে তার লালন পালন, শিক্ষা-দীক্ষা ও সকল ব্যয়ভারের দায়িত্ব ভাইয়ের উপর।

রাসূল (সাঃ)-এর উক্ত অনুপম আদর্শের প্রভাব সাহাবায়ে কিরামের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করেছেন। যখন সাহাবায়ে কিরাম হুনাইন যুদ্ধে রাসূল (সাঃ)-এর আপন স্বীয় দুধবোনের সাথে দেখলেন যে, হুনাইনের যুদ্ধে বন্দী ছিল কয়েক হাজার। তন্মধ্যে রাসূল (সাঃ)-এর বোন "শীমা" ও ছিলেন। সবাই যখন তাকে গ্রেফতার করে তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের পয়গাম্বরের বোন। সাহাবায়ে কিরাম সত্যায়নের জন্য রাসূল (সাঃ)-এর খেদমতে নিয়ে এলে মহব্বতের আতিশয্যে রাসূল (সাঃ)-এর চোখে অশ্রুভরে যায় এবং তাঁকে বসার জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন। তাঁর সাথে হৃদ্যতা পূর্ণ আলোচনা করলেন ও কয়েকটি উট এবং ছাগল দান করলেন। তারপর বললেন-"আপনার যদি মনে চায় আমার সাথে থাকেন, অন্যথায় আপনার ঘরেও চলে যেতে পারেন।" তিনি ঘরে যাওয়াকে পছন্দ করেন। রাসূল (সাঃ) পূর্ণ ইজ্জত ও সম্মানের সাথে তাঁকে পৌঁছিয়ে দেন।"

---

[১]. ইমাম তিরমিযি, সুনান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ.৩১৮
[২]. ইমাম আহম্মদ, আল-মুসনাদে, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

শুধু এ নয়, বরং রাসূল (সাঃ)-এর উক্ত অনুপম চরিত্র দেখে একজন সম্মানিত দূত রাসূল (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে সকল যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দিতে আরয করল। মুক্তির কারণ দর্শাতে গিয়ে সে দূত একটি হৃদয় কাঁপানো দলীল পেশ করেঃ

"যে সকল মহিলা বন্দী আছে, তাদের মধ্যে আপনার ফুপু এবং খালাগণ ও রয়েছে। (কেননা হালীমা সা'দীয়া ছিলেন সে গোত্রের)। আল্লাহর কসম! যদি আরব বাদশাহদের মধ্যে কেউ আমাদের বংশের কারো দুধ পান করত, তবে তার নিকট অনেক কমই আশা করতাম কিন্তু আপনার নিকট তার চেয়ে আরো অনেক বেশি কামনা করি।"

এমন চিত্তাকর্ষক আপিল শুনে রাসূল (সাঃ) উদ্যেলিত হয়ে বললেনঃ আব্দুল মুত্তালিবের বংশের যে অংশ রয়েছে। সব তোমার তারপর এর উপর যথেষ্ট নয়, বরং ব্যাপক মুক্তি লাভের জন্য শিখিয়ে দিলেন যে, নামাজের পর যখন সবাই উপস্থিত থাকবে তখন সবার সম্মুখে দরখাস্ত করবে। যোহরের নামাজের পর যখন আবেদনটি পেশ করা হয়, তখন রাসূল (সঃ)বললেনঃ আমার একমাত্র নিজের বংশের উপর ক্ষমতা আছে। কিন্তু আমি সকল মুসলমানের নিকট তার জন্য সুপারিশ করছি।

অবস্থা এমন হল যে, মুহাজির এবং আনসার সবাই এক সুরে বলে উঠলঃ আমাদের ও অংশ আছে। এভাবে ছয় হাজার বন্দী এক সাথে মুক্তি পেয়ে গেল।"

ইসলাম ধর্মে সাহাবায়ে কিয়ামের বাস্তব জীবনে আমল ছিল এই তাঁরা নিজের লাভকে বোনের লাভের সামনে দ্বিতীয় স্থানে রাখতেন এবং বোনদের লাভকে প্রথম স্থান দিতেও নিজেদের আরাম-আয়েশকে ভুলে যেতেন।[১]

ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে এসে মানব সমাজে চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে একটি তুলনাহীন বিপ্লবের সৃষ্টি করে ছিল তৎকালীন আরব জাহানে। সে কালের উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হচ্ছেঃ "বিশিষ্ট সাহাবী হযরত জাবির (রা) তাঁর সাতটি পিতৃহীনা বোনের লালন-পালনের জন্যে কোন যুবতী কুমারী মেয়ে বিয়ে না করে একজন বয়স্ক বিধবাকে বিয়ে করে আনলেন; অথচ তিনি ছিলেন অল্প বয়স্ক যুবক। রাসূল (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কুমারী মেয়ে বিয়ে করনি কেন?

[১]. আল্লামা আব্দুস সামাদ রাহমানী, নারী মুক্তি কোন পথে? ভোষান্তর-মুফতী মঈনুদ্দীন তৈয়বপুরী, বাড পাবলিকেশন, ঢাকা-২০০০, পৃঃ ১১০

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরয করলেনঃ আমার সম্মানিত পিতা শাহাদাত বরণ করেন এবং কম বয়সী অনেক সন্তান রেখে যান। আমি যদি কুমারী মেয়ে বিয়ে করি, তবে সে তাদেরকে না শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে পারবে, না তাদের তত্ত্বাবধান করতে পারবে। তাই আমি এমন এক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মহিলা বিয়ে করেছি, যে তাদেরকে ধমক-টমক দিয়ে ভীতি প্রদর্শণ করতে পারবে। তাদের চুলগুলো আঁচড়িয়ে দিবে। তাদের চুল থেকে উঁকুন বের করতে পারবে। তাদের কাপড় ছিঁড়ে গেলে সেলাই করে দিতে পারবে এবং তাদের সকল কর্ম আঞ্জাম দিতে পারবে।(মুসলিম, বুখারী, আবূদাউদ)

এভাবে ইসলাম বোনের সাথে শুধু সদাচরণের প্রতিই গুরুত্বারোপ করেনি বরং বোনের জন্য মীরাসে তথা ত্যাজ্য সম্পদের অংশ নির্ধারণ করেছে। যেমনঃ মৃত ব্যক্তি একটি মেয়ে ও একজন বোন রেখে গেলে অর্ধেক মেয়ে পাবে অপর অর্ধেক বোন পাবে। এমনি ভাবে যদি একজন স্ত্রী ও একজন বোন রেখে যায়, তবে তখন স্ত্রী পাবে চার আনা আর বোন পাবে বার আনা।

ইসলামে মায়ের মর্যাদাঃ (জননী-রূপে নারী)

ইসলাম "মা" হিসেবে নারীর মর্যাদা এত বেশী উঁচু করেছেন যে, পুরুষ কোনভাবেই সে ইজ্জত পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। "পিতা-মাতা হিসেবে তার মধ্যে সন্দেহ নেই যে, মায়ের সাথে বাবার ও হক আছে। অধিকাংশ স্থানে তাদের আলোচনা একসাথে করা হয়েছে কুরআন ও সুন্নাতে। উভয়ের সাথে সৎ ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল-কুরআনের এক স্থানে তাওহীদের হুকুম ও শিরক হতে নিষেধাজ্ঞার পর মা-বার সাথে সৎ ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً

"আল্লাহর উপাসনা কর ও শরীক করোনা তাঁর সাথে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর।"[১]

অন্যত্র রয়েছে-

أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً

[১]. আল্-কুরআন-৪:৩৬

"তার সাথে শরীক করোনা এবং মাতা-পিতার সাথে সদয় ব্যবহার কর।"[১]

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً

পবিত্র কুরআনে ময়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কঠোর নির্দেশ রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের সঙ্গে গর্ভে ধারণ করে এবং বেদনার সঙ্গে প্রসব করে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং তার সন্তান স্তন ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস।"[২]

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

"আমি মানুষকে তো তার মাতা পিতার সহিত সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। মাতা সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার স্তন্যপান ছাড়াতে দু'বছর অতিবাহিত হয়। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমারই নিকট তো প্রত্যাবর্তন।"[৩]

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ○ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً

"তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছে যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধ্যক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে "উহ" শব্দটি ও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সাথে শিষ্টাচার পূর্ণ কথা বলো। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে নম্র ভাবে মাথানত করে দাও এবং বলঃ হে পালনকর্তা! তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন পালন করেছেন।"[৪]

---

১ . আল্-কুরআন- ৬:১৫১
২ . আল্-কুরআন-৪৬:১৫
৩ . আল্-কুরআন-৩১:১৪
৪ . আল্-কুরআন-১৭:২৩,২৪,

Dhaka University Institutional Repository

এই পবিত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মাতা-পিতার আনুগত্য, তাঁদের সাথে সুন্দর ব্যবহার এবং তাদের সেবায় যত দিক ও পর্যায় থাকতে পারে তার সব দিকেই ইঙ্গিত করেছেন এবং তিনি এ সব কিছুকেই নিজ এবাদতের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। মনীষী ফখরুদ্দীন রাজী বলেন, "মাতা পিতার আনুগত্য এবং আল্লাহর এবাদতের দিকে এই তীব্র তাগিদের আসল কারণ হচ্ছে মানব সৃষ্টির আসল কর্তা হচ্ছেন আল্লাহ এবং তার সৃষ্টির বাহ্যিক মাধ্যম হচ্ছে পিতা-মাতা। এজন্যে আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম তাকেই সম্মান দান এবং তারই ইবাদত করার হুকুম দিয়েছেন এবং এরপরই মাতা পিতার প্রতি সম্মান দেখাতে বলেছেন। এতে করে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় পিতা-মাতার আনুগত্য করা বস্তুতঃ আল্লাহর ইবাদতেরই এক পবিত্রতম অঙ্গ।"

নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেন-

اَكْبَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَ امِ الْاُ مَّماتِ.

"বেহেশত মা'দের পায়ের তলে অবস্থিত।"[১]

অর্থাৎ মাকে যথাযোগ্য সম্মান দিলে, তার উপযুক্ত খেদমত করলে এবং তার হক আদায় করলে সন্তান বেহেশত লাভ করতে পারে, অন্যকথায় সন্তানের বেহেশত লাভ মা'য়ের খেদমতের উপর নির্ভরশীল। মা'য়ের খেদমত না করলে কিংবা মা'র প্রতি কোনরূপ খারাপ ব্যবহার করলে, মা'কে কষ্ট ও দুঃখ দিলে সন্তান যত ইবাদত বন্দেগী আর নেকের কাজেই করুক না কেন, তার পক্ষে বেহেশত লাভ করা সম্ভবপর হবে না। তার পিতা অপেক্ষা মাতার অধিকার এ ক্ষেত্রে অনেক বেশি বলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে।

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেনঃ নবী করীম (সাঃ) এর সময়ে আল-কামা নামক এক যুবক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। তার রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত সেবা-শুশ্রুষাকারীরা তাকে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কলেমা পাঠ করার উপদেশ দেয়। কিন্তু শত চেষ্টা করেও সে তা উচ্চারণ করতে পারে না। রাসূলে করীম (সাঃ) এই আশ্চর্য ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরে জিজ্ঞেস করলেনঃ তার মাকি জীবিত আছে? বলা হল, তার পিতা মারা গেছে, মা জীবিত আছে, অবশ্য সে খুবই বয়োবৃদ্ধা। তখন তাকে রাসূল (সাঃ) এর

[১]. ইমাম আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজা, সুনান, বৈরুত, দারু ইহদাইত তুরাস, ১ম সং. খ.-২, কিতাবুল জিহাদ, পৃ.৯২৯, হা. নং-২৭৮১

Dhaka University Institutional Repository

দরবারে উপস্থিত করা হল। সে বলল, আল-কামা বড় নামাযী, বড় রোযাদার ব্যক্তি এবং বড়ই দানশীল। সে যে কত দান করে, তার পরিমাণ কারো জানা নেই। রাসূল করীম (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার সাথে তার সম্পর্ক কিরূপ? উত্তরে বৃদ্ধা মা বলল, 'আমি ওর প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট।'

তার অসন্তুষ্টির কারণ জিজ্ঞেস করায় সে বলল, "সে আমার তুলনায় তার স্ত্রীর মন যোগাত বেশী, আমার উপর তাকেই বেশী অগ্রাধিকার দিত এবং তার কথামতই কাজ করত।' তখন রাসূলে করীম (সাঃ) বললেন, "ঠিক এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তার মুখে কালেমার উচ্চারণ বন্ধ করে দিয়েছেন।" অতঃপর রাসূলে করীম (সাঃ) হযরত বিলালকে আগুনের একটা কুন্ডলি জ্বালাতে বললেন এবং তাতে আল-কামাকে নিক্ষেপ করার আদেশ করলেন।

আল-কামার মা একথা শুনে বলল-"আমি মা হয়ে তা কেমন করে হতে দিতে পারি! সে যে আমার সন্তান, আমার কলিজার টুকরা।"

রাসূলে করীম (সাঃ) বললেন-"তুমি যদি চাও যে, আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দিন তাহলে তুমি তার প্রতি খুশি হয়ে যাও। অন্যথায় আল্লাহর শপথ, তার নামায, রোযা ও দান খয়রাতের কোন মূল্যই হবে না আল্লাহ্র দরবারে।"

অরঃপর আল-কামার জননী বলল-"আমি আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রাসূলকে স্বাক্ষী রেখে বল্ছি, আমি তাকে মাফ করে দিলাম।"-এর পর খবর দিয়ে জানা গেল যে, আল-কামা অতি সহজেই কালেমা উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়েছে।"[১]

এ একটি ঘটনা এবং নির্ভুল বর্ণনা ভিত্তিক বলে এর সত্যতায় কোনই সন্দেহ নেই। যদিও বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিতে এর সত্যতা স্বীকৃত নয় এবং এ সব ঘটনার কোন মূল্যও নেই। কিন্তু ইসলাম যে নৈতিক ও আদর্শিক বিধান উপস্থাপিত করেছে, তাতে এ ধরণের ঘটনা মানুষের চোখ খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

নবী করীম (সাঃ) উপেক্ষিত বঞ্চিত নারী সমাজের অবস্থার উন্নয়ন ও সঠিক মর্যাদায় তাদের প্রতিষ্ঠিত করা প্রসঙ্গে যে উন্নত মানের শিক্ষা পেশ করেছেন, নারী মুক্তির কোন উচ্চ কণ্ঠ

---

১. ইমাম মুনযিরী الترغيب والترهيب গ্রন্থে বর্ণনাটি করেছেন, ৩/৩৩১-৩৩২ পৃষ্ঠা।

Dhaka University Institutional Repository

সমর্থকই আজ পর্যন্ত সেই মানের শিক্ষা পেশ করতে পারেনি। একটি ঘোষণায় রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেনঃ

ان الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ لاُ مُّهَاتِ وَمَنَعًا وَهَّاتٍ وَأْدَ الْبَنَاب.

"আল্লাহ্ তা'আলা মায়েদের নাফরমানী, তাদের অধিকার আদায় না করা, চার দিক থেকে ধন-সম্পদ লুণ্ঠন ও সঞ্চিত দ্বারা এবং মেয়ে সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করাকে তোমাদের জন্য চিরতরে হারাম করে দিয়েছেন।"[১]

এ ধরণের আরো অনেক আয়াত ও হাদীস আছে, যে গুলোর মধ্যে মাতা-পিতার সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ রয়েছে। তা সত্ত্বেও মায়ের মর্যাদা ইসলামে বাবার মর্যাদার উর্ধ্বে।

হাদীস শরীফে আছেঃ

عن عبى هريرة (رض) قال جل رجل الحى رسول الله (ص) فقال من احق اناكى عيسن صحى بىَ قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك.

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সৎ ব্যবহারের সবচেয়ে বড় হকদার কে? রাসূল (সাঃ) বললেনঃ তোমার মা। সে বললঃ তারপর কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা। সে বললঃ তারপর কে? রাসূল (সাঃ) বললেন তোমার মা। সে বলরঃ তারপর কে? তখন রাসূল (সাঃ) চতুর্থবার বললেনঃ তোমার বাবা। তারপর যে তোমার নিকটে, অতঃপর যে তোমার নিকটে।"[২]

এই হাদীসে মায়ের স্থান বাবার তিনগুন উর্ধ্বে বলে প্রমাণিত হয়েছে। তার কারণ প্রত্যেক মা বাবার চেয়ে তিনগুন বেশি কষ্ট করে থাকেন।

ইসলাম মায়ের জাতকে কতোখানি সম্মান দিয়েছে তার পরিমান নিম্নে বর্ণিত হাদীস দ্বারা ও বুঝা যায়,-"এক ব্যক্তি হুযুর (সাঃ) এর কাছে এসে বললেনঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একটি বড় গুনাহ করে বসেছি। আমার কি তওবা আছে? হুযুর (সাঃ) বললেনঃ তোমার কি মা আছেন? লোকটি বললঃ না। হুযুর (সাঃ) আবার বললেনঃ তোমার তওবা আল্লাহর কাছে কবুল করবার জন্য তোমার খালার সেবা করো।

---

[১]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, খন্ড-৫, কিতাবুল আদাব, হা. নং-৫৫১৮, পৃ.-২২২৯,
[২]. মুহাম্মদ ইসমাঈল ইবনে বুখারী, প্রাগুক্ত, বির ও সিলা অধ্যায়, হা. নং-৫৬২৬, পৃ.-২২২৭,

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত,-"রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন-আমি জান্নাতে প্রবেশ করে কিরাআতের আয়াত শুনলাম। তখন জিজ্ঞেস করলামঃ কে? জবাব এল, হারিস বিন নু'মান। রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমিও এরূপ নেকী কর? হারিস বিন নু'মান (রাযিঃ) তার মায়ের সাথে অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করতেন।"(বায়হাকী, মিশকাত)

অপর এক হাদীসে রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেনঃ "যে লোক তার পিতামাতা দুজন কেউ কিংবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল অথচ খেদমত করে জান্নাত বাসী হওয়ার অধিকার হল না, তার মত হতভাগ্য আর কেউ নয়। (মুসলিম)

নারীর প্রতি অতি উচ্চ মর্যাদা প্রদর্শণ করেছে একমাত্র ইসলাম। এ প্রসঙ্গেরই একটি লম্বা হাদীসের শেষ ভাগে রাসূলে করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

بابان معجلان عقو بتهما فى الدنيا البغى والعقوق.

"দুটি পথ এমন রয়েছে, যেখানে থেকে পৃথিবীতে খুব শীঘ্র ও দ্রুতগতিতে আযাব নাজিল হয়ঃ একটি জুলুম ও সীমালংঘন এবং দ্বিতীয়টি পিতা-মাতার নাফরমানী ও তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা।"(তিরমিযী)

কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ন। এই কথায় এক অতীব উচ্চ ও নিগুঢ় তত্ত্বের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বস্তুতঃ জুলুম ও সীমালংঘন এমনিতেই বেশি দিন চলতে পারে না। কিন্ত তা যদি হয় নিজেরই জন্মদাতা মা-বাবার ওপর, তাহলে মজলুমের বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসের পূর্বেই জালেমের আয়ুকাল ফুরিয়েযেতে বাধ্য।

হযরত আবূ তোফায়েল (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত" রাসুল (সাঃ) যখন "জাইররানা" নামক স্থানে গোশত বন্টন করছিলেন, তখন জনৈক মহিলা এসে রাসূল (সাঃ) এর কাছে চলে গেল। রাসূল (সাঃ) তাঁকে দেখামাত্র চাদর বিছিয়ে দিলেন। সে তাতে বসে পড়ে। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ মহিলাটি কে? তখন সবাই বললঃ রাসূল (সাঃ) এর দুধমাতা (হালিমা)"[১]

নারী জাতির এতো সম্মান আরকে দিয়েছে? আর একটি হাদীসে আছে, "জনৈক সাহাবী হুযুর (সাঃ) এর কাছে এসে বললো, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি জিহাদে (ধর্ম-যুদ্ধে) যাওয়ার সংকল্প করেছি। এখন আপনার নিকট পরামর্শ চাচ্ছি। এতে হুযুর (সঃ) বললেনঃ তোমার মা

[১]. ইমাম আবু দাউদ, সুনান, প্রাগুক্ত, খন্ড ৪, কিতাবুল আদব, হাদীস নং-৪৪৭৮, পৃষ্ঠা-৪৫৮

Dhaka University Institutional Repository

জীবিত আছে? লোকটি উত্তরে বললো হ্যাঁ। তখন রাসূল(সঃ) বললেন, তাহলে এখন তুমি তোমার মায়ের সেবা করো। কেননা জান্নাত তাঁর পদযুগলের নীচে" ।[১]

ধর্মযুদ্ধ অনেক সময় ফরয হয়ে থাকে, বিশেষ করে ইসলামের প্রাথমিক যুগে এর প্রয়োজনীয়তার কথা কে না জানে । কিন্তু নবী করীম (সঃ) সেই যুদ্ধ থেকে ও মায়ের সেবার গুরুত্ব বেশী দিয়েছেন। মা না থাকলে মায়ের বোনের সেবা করলেও গুনাহ্ মাফ হবে বলেছেন। ইসলামী বিশেষজ্ঞরা একটি বিশেষ দিক নির্দেশ এই দিয়েছেন যে, মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হচ্ছে আনুগত্যের খোদায়ী পদ্ধতি; এর মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে মাতা-পিতার সেবার দয়িত্ব পালিত হয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম রাজী (রহঃ) তাঁর তাফসীরে লিখেছেন- "আল্লাহ তায়ালা তার ছাড়া অন্য কারও উপসনাকে নিষিদ্ধ করেছেন কিন্তু সেবার অনুমতি দিয়েছেন। সেবা হচ্ছে উপাসনার পরবতী স্থান এ থেকে দেখা যায় যে সেবা কেবল বৈধই নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে জরূরীও। যেমন মাতা পিতার সেবা করা ওয়াজিব বা জরুরী । ইসলামই নারীদেরকে এক হিসাবে পুরুষের চাইতে ও বেশী সম্মান দিয়েছে। আর কোন মতবাদ বা মতাদর্শই নারীকে এতোটুকু সম্মান বা মর্যদা দিতে সক্ষম হয়নি।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন ।

لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً

"আল্লাহ ছাড়া আর কারো দসত্ব করোনা পূজা উপাসনা করোনা এবং পিতা মাতার সাথে অবশ্যই ভাল ব্যবহার করবে।"[২]

সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বলেছেন, "পিতামাতার সাথে কথা বল, যেমন করে অপরাধী ক্রীত দাস কথা বলে রূঢ় ভাষী মনিবের সামনে।"

আল মুজাহিদ বলেছেনঃ

"পিতামাতা তোমার সামনে বার্ধক্যে পৌছলে তাঁদেরকে ময়লার মধ্যে ফেলে রাখবে না এবং যখন তাদের পায়খানা পেশাব সাফ করবে তখনো তাঁদের প্রতি কোন রূপ ক্ষোভ দেখাবেনা। অপমানকর কথা বলবেনা-যেমন করে তাঁরা তোমায় শিশু অবস্থায় তোমার পেশাব পায়খানা সাফ করত, ঠিক তেমনি দরদদিয়ে করবে। সূরা আল-আনকাবুত-এ বলা হয়েছেঃ

---

১ . ইমাম ইবনে মাযাহ, সুনান, বৈরুত, দারু ইহয়াইত তুরাম, ১ম সং. খন্ড-২, কিতাবুল জিহাদ, পৃষ্ঠা-৯২৯, হাদীস নং-২৭৮১

২ . আল-কুরআন-২:৮৩

Dhaka University Institutional Repository

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

"মানুষ সাধারণকে তাদের পিতা মাতার সঙ্গে ইহ্সান করতে নির্দেশ দিয়েছি।" এখানে ইহ্সান শব্দের মূল হচ্ছে হুসনুন, মানে চরম পর্যায়ের ও পরম মানের সর্বোত্তম ভাল কাজ করা, ভাল ব্যবহার করা ও তাঁদের হক আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সব জায়গাতেই প্রথমে আল্লাহর প্রতি কর্তব্যে এবং তারপরই পিতা মাতার প্রতি কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে ।

রাসুল করীম (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ

হে রাসুল (সাঃ), সন্তানের উপর তাদের পিতামাতার অধিকার কি?

জবাবে তিনি ইরশাদ করলেনঃ তারা দু জনই হচ্ছে তোমার জান্নাত এবং তোমার জাহান্নাম।

অর্থাৎ মানে জান্নাত কিংবা জাহান্নাম তাদের কারণেই লাভ হওয়া সম্ভব হবে।

রাসুল করীম (সাঃ) বলেছেনঃ যে লোক পিতা মাতার ব্যপারে আল্লাহর অনুগত হয় তার জন্য বেহেশতের দুটি দ্বার উম্মুক্ত হয়ে যাবে-একজন হলে একটি দ্বার উম্মুক্ত হবে আর যদি কেউ পিতা মাতার ব্যপারে আল্লাহর নাফরমান হয়ে যায় তবে তার জন্যে জাহান্নামের দুটো দুয়ারই খুলে যাবে আর একজন হলে একটি দুয়ার খুলবে ।

অতঃপর এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ) পিতা মাতা যদি সন্তানের উপর জুলুম করে আর তার ফলে সন্তানরা তাদের নাফরমানী করে বা তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে! এর জবাবে রাসুলে করীম (সাঃ) বললেনঃ হ্যাঁ, পিতা-মাতা যদি সন্তানের উপর জুলুমও করে তবুও তাদের নাফরমানী করলে জাহান্নামে যেতে হবে।

অপর এক হাদীসে হযরত আবূ বাক্‌রা হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা চাইলে যত গুনাহ এবং যে কোন গুনাহ্ই মাফ করে দেবেন। তবে পিতামাতার সথে সম্পর্কচ্ছেদ ও তাদের নাফরমানী করলে তিনি তা কখনও মাফ করবেন না। কেননা, এর শাস্তি মৃত্যুর পূর্বেই এ দুনিয়ায়ই শিগগীর করে দেয়া হবে।"(বায়হাকী)

পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করা সম্পর্কে কুরআন হাদীসে যেসব তাকীদ বাণী উদ্ধৃত হয়েছে, এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে যে মূলনীতি উল্লিখিত হয়েছে তা হচ্ছে এইঃ

Dhaka University Institutional Repository

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ○ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ

"তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমরা যদি যমীনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করো এবং রেহিম (রক্ত সম্পর্ক) ছিন্ন করো, তাহলে আল্লাহ্ তাদের উপর অভিসম্পাত করবেন এবং এরপর তাদের বধির ও অন্ধকার দেবেন।"[১]

এ আয়াতের প্রেক্ষিতে রাসূলে করীম (সাঃ) এর স্মরনীয় একটি হাদীস বলা হয়েছেঃ

ان رسول (ص) قال لايدخل الجنة قاطع دحيم.

"রেহেমের সম্পর্ক কর্তন কারী কখনই বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।"[২]

রাসূলে করীম (সাঃ) সবচেয়ে বড় গুনাহ্ কি কি বলতে গিয়ে প্রথমত উল্লেখ করেছেনঃ

اَلْاِ شْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْ قُا الْوَالِدَيْنِ.

"আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং পিতামাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।"

অপর এক হাদীসে তা কবীরা গুনাহ্ বলে উল্লেখ করেছেনঃ

"কোন ব্যক্তির পক্ষে তার পিতা মাতাকে গালাগাল করাও কবীরাহ গুনাহ।"

সাহাবীগণ এ কথা শুনে বললেনঃ পিতামাতাকে ও কেউ কেউ গালাগাল করে নাকি হে রাসূল? তখন রাসূল (সাঃ) বললেনঃ "এক ব্যক্তি অপর কারো বাপকে গাল দেয়, প্রত্যুত্তরে সে দেয় প্রথম ব্যক্তির বাপকে গাল, এমনি ভাবে কেউ অপর ব্যক্তির মাকে গালাগাল করে সে ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির মা'কেই গাল দেয়।[৩]

অর্থাৎ সরাসরিভাবে নিজের মা-বাপকে কেউ গালাগাল না করলেও প্রকারান্তরে অপর লোক দ্বারা নিজ মা-বাপকে গাল খেতে বাধ্য করে। তাও তার নিজেরই গালাগালের সমান হয়ে দাঁড়ায়।

---

[১]. আল কুরআন, ৪৭: ২২-২৩,
[২]. ইমাম মুসলিম, মুসলিম, প্রাগুক্ত ২য় খন্ড, অধ্যায় باب صلة الرجم وتحريم قطيعتها ৪৬৩৭ নং হাদীস, পৃষ্ঠা-৩১৫।
[৩]. ইমাম তিরমিযী, সুনান, প্রাগুক্ত, খ.৪. হা. নং ১৯০২, পৃ.৩১২।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে বাপ-মা'র সাথে তো বটেই তাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথেও ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ রয়েছে।

বলা হয়েছেঃ-"প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে তার পিতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ভাল ব্যবহার করাও অতি উত্তম নেক কাজ।"(মুসলিম)-এভাবে ইসলাম নারীকে মায়ের মর্যাদায় অলংকৃত করেছেন।

সন্তানের সম্পদে পিতা-মাতার অধিকারঃ

ইসলাম ধর্মে নারীর মর্যাদা শুধু সন্তানের খেদমতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি, এ সকল মর্যাদা ও অধিকারের পাশাপাশি সন্তানের সম্পত্তিতে অংশ পাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"হে রাসূল, লোকেরা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, তারা কোথায় ধনমাল ব্যয় করবে। তুমি তাদের বলে দাও, তোমরা যা কিছু খরচ করবে, তা করবে পিতা-মাতার জন্যে, নিকট আত্মীয়দের জন্যে, ইয়াতী, মিসকীন ও সম্বলহীন পথিকদের জন্যে।"[১]

এ আয়াত সন্তানের ধনসম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে পিতামাতার অগ্রাধিকার স্পষ্টভাবে পেশ করেছে। নওয়াব সিদ্দীক হাসান এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেনঃ

সন্তানের অর্থব্যয়ের ব্যাপারে পিতা-মাতাকে সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, সন্তানের উপর তার অর্থসম্পদের উপর পিতা-মাতার যে অধিকার রযেছ, তা আদায় করা সন্তানের জন্যে ওয়াজিব। কেননা এ পিতা-মাতাই হচ্ছে সন্তানের এই দুনিয়ার অস্তিত্ব লাভের বাহ্যিক কারণ ও মাধ্যম।

সন্তানের ধনসম্পদে পিতা-মাতা এ অধিকার কেবল সন্তানের মৃত্যুর পর মিরাস হিসাবেই নয়; বরং তার জীবদ্দশায়-ই এ অধিকার স্বীকৃত।

রাসূলে করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন-"সন্তান পিতার অতি উত্তম উপার্জন বিশেষ, অতএব তোমারা পিতা-মাতার সন্তানদের ধনসম্পদ থেকে পূর্ণ সাদ গ্রহণ সহকারে পানাহার কর।"(মুসনাদে আহম্মদ)

---

[১]. আল-কুরআনঃ ২:২১৫

Dhaka University Institutional Repository

এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার মাল-সম্পদ রয়েছে আর সন্তান-সন্ততিও আছে। কিন্তু এমতাবস্থায় আমার বাবা আমার মাল নিতে চায়, এ সম্পর্কে আপনার কি রায়? রাসূলে করীম (সাঃ) বললেনঃ-"তুমি আর তোমার মাল-সম্পদ সবই তোমার বাবার।"(ইবনে মাজা)

এ পর্যায়ের কয়েকটি হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাওকানী লিখেছেনঃ

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতা তার সন্তানের মাল-সম্পদ ন্যায়ত অংশীদার। অতএব সন্তান অনুমতি দিক আর নাই দিক পিতা-মাতা তার সন্তানের মাল-সম্পদ থেকে পানাহার করতে পারে এবং তা নিজের মালের মতই ব্যয়-ব্যবহারও করতে পারে-যতক্ষণ না সে ব্যয়-ব্যবহার অযথা, বেহুদা ও নির্বুদ্ধিতার খরচের পর্যায়ে পড়ে।

শুধু তাই নয়, সচ্ছল অবস্থায় সন্তানের কর্তব্য হচ্ছে গরীব পিতা-মাতাকে আর্থিক সাহার্য্য দান করা।

আল্লামা শাওকানী লিখেছেনঃ "দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত পিতা-মাতার জন্যে অর্থ ব্যয় করা যে সচ্ছল অবস্থায় সন্তানের পক্ষে ওয়াজিব-এ সম্পর্কে শরীয়াত বিদদের ইজমা হয়েছে।

পিতামাতার অধিকার সন্তানের উপর এত বেশী যে, তাদের অনুমতি ছাড়া জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী কাজেও যোগদান করা জায়েজ নয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

عن عبد الله بن محمد وقال جاء رجل الى النبى ملر الله عليه وسلم فاستأ ذنه فى الجهاد فقال أحي والد اك قال نعم ففجهما فجاهد.

"এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে জিহাদে যোগদান করার অনুমতি চাইলে তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছে কি? লোকটি বললঃ জি, বেঁচে আছেন। তখন রাসূলে করীম (সাঃ) বললেনঃ তাহলে তুমি তাঁদের খেদমতেই প্রাণ পণে লেগে যাও। এটাই তোমার জিহাদ।"[১]

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সন্তানের প্রতি পিতামার অসীম ও অসাধারণ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ পূর্বক তাদের প্রতি সর্বতোভাবে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

[১] . মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী, সহীহ্, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, কিতাবুল জিহাদ-হাদীস নং-৫৫১৫, পৃষ্ঠা নং-৪২১।

Dhaka University Institutional Repository

এক পর্যায়ে শেষ কথা বলা হয়েছে এই যে, এসব এবং এ ধরণের ক্ষণস্থায়ী ও সাময়িক খেদমতের কাজ করলেই পিতমাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন শেষ হয়ে যায় না; বরং তাদের ইহকালীন-পরকালীন কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে অবিরত দোয়াও করতে থাকতে হবে। সে দোয়ার ভাষাও আল্লাহ্ই শিখিয়ে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে-

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً

"হে আল্লাহ্ পারোয়ারদিগার, আমার পিতামাতার প্রতি রহমত নাজিল কর, যেমন করে তারা দুজনে আমাকে আমার ছোট অবস্থায় লালন-পালন করেছে।"[১]

তার মানেঃ আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন আমার কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না, তখন এই পিতা-মাতাই স্নেহ যত্নপূর্ণ লালন-পালন আমি লাভ করেছিলাম বলেই এ দুনিয়ায় আমার বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছে। তখন-আমার সে অক্ষমতার সময়ে যেমন তাদের লালন-পালন আমার জন্যে অপরিহার্য ছিল, আজ তারা তেমনি অক্ষম হয়ে পড়েছে, এখন তাদের প্রতি রহমত করা-হে আল্লাহ্ তোমারই ক্ষমতাধীন।

এভাবে, এসকল মর্যাদা ও অধিকারের পাশাপাশি ইসলাম মায়ের জন্য ও পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ পাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে-মা তাঁর সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কখনো পূর্ণ সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাবে আর কখনো ছয়ভাগের একভাগ পাবে। এভাবে ইসলাম নারীকে মারূপে তার আসনে সম্মানজনক ভাবে অধিষ্ঠিত করেছেন।

ইসলামে স্ত্রী (সহধর্মিনী) রূপে নারীঃ

বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, ইহা ক্ষণস্থায়ী নহে, বরং ইহা শাশ্বত, চিরস্থায়ী। আর বিবাহ বন্ধন হতেই একজন পুরুষ ও একজন নারীর দাম্পত্য জীবনের সূচনা হয় এবং তখন হতেই তাদের পরস্পরের উপর কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হয়ে থাকে। এই দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালনের উপরই তাদের জীবনের সুখ-শান্তি নির্ভর করে।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজে স্ত্রী হিসেবেও নারীদের চরম অমর্যাদা ও অপমান ভোগ করতে হত। তাদেরকে স্বামীর ঘরে যথাযোগ্য মর্যাদা বা অধিকার দেয়া হত

[১]. আল্-কুরআন. ১৭:২৪,

Dhaka University Institutional Repository

না। তাদেরকে হীন, নগণ্য ও দয়ার পাত্রী মনে করা হত। নিতান্ত দাসী-বাঁদীর মত ব্যবহার করা হত তাদের সাথে।

ইসলাম স্ত্রী হিসেবে নারীদের এ অপমান দূর করে তাদেরকে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে। প্রথমত ঘোষণা করা হয়েছে, তারা নারী বলে মৌল অধিকারের দিক দিয়ে, পুরুষদের তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়। বলা হয়েছেঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"স্ত্রীদের ও তেমনি অধিকার রয়েছে যেমন স্বামীদের রয়েছে তাদের উপর এবং তা যথাযথভাবে আদায় করতে হবে।[১]

অন্য কথায়, স্ত্রী ও স্বামী উভয়েই আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ সমান। তাদের অধিকারও অভিন্ন এবং এ দুয়ের মাঝে এক্ষেত্রে কোনই পার্থক্য করা যেতে পারে না। মৌল অধিকারের দিক দিয়ে কেউ কম নয়, কেউ বেশী নয়।

আরব সমাজে স্ত্রীদের উপর নানাভাবে অকথ্য জুলুম ও পীড়ন চালানো হত। কোন কোন স্বামী তাদে মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখত, না পেত তারা স্ত্রীত্বের পূর্ণ অধিকার, না পেত তাদের কাছ থেকে মুক্তি ও নিস্কৃতি। স্বামী একদিকে যেমন তাদের পুরাপুরি স্ত্রী মর্যাদা ও অধিকার দিত না, অন্যদিকে তেমনি তালাকদিয়ে মুক্ত করে অন্য স্বামী গ্রহণের সুযোগও দিত না। বরং এভাবে আটকে রেখে তাদের নিকট থেকে নিজেদের দেয়া ধন সম্পদ ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালাত এবং সে জন্যে নানা কৌশল অবলম্বন করত। ইসলাম এটাকে নেয়ার চেষ্টা চালাত এবং সে জন্যে নান কৌশল অবলম্বন করত। ইসলাম এটাকে সমর্থন করেনা। আর তাই কুরআন মাজীদ এর প্রতিবাদ করেছে তীব্র ভাষায়। রয়েছেঃ

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ

"তোমরা হে স্বামীরা তাদের (স্ত্রীদের) বেঁধে আটকে রাখবেনা এ উদ্দেশ্যে যে, তাদের নিকট থেকে তোমাদের দেয়া ধন-সম্পদের কিছু অংশ কেড়ে নেবে।"[২]

ইসলাম নারীকে স্ত্রীরূপে পূর্ণ-মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এক সময় স্ত্রীদের ঘরের অন্যান্য মাল সামানের মতই অস্থাবর সম্পত্তি বলে মনে করা হত এবং স্বামী মরে গেলে তার

---

১. আল-কুরআন, ২:২২৮

২. আল্-কুরআন, ৪:১৯

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রীকেও পরিত্যক্ত মাল সম্পত্তির ন্যায় উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হত। কুরআন মাজীদে এ সম্পর্কে ঈমানদার লোকদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً

"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা মেয়েদেরকে অন্যায় জবরদস্তি করে নিজেদের মীরাসের সম্পদ বানিয়ে নিও না-তা তোমাদের পক্ষে আদৌ হালাল হবে না।[১]

নবী করীম (সাঃ) বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বলেছিলেনঃ

فاتقوا الله فى النساء فانكم اخذ تموهن بامان الله واستحللتم.

"তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করে চলবে। তোমাদে মনে রাখতে হবে যে, তোমরা তাদের গ্রহণ করেছে আল্লাহ্‌র নামে এবং এভাবেই তাদের হালাল মনে তোমরা তাদের উপভোগ করেছ।"(মুসলিম)

এই পর্যায়ে হযরত উমর ফারুক (রা) এর একটি কথা উল্লেখ্য। তিনি বলেছিলেনঃ

ولله اناكنا فى الجا هلية ما نعد للنساء امراحتى الزل الله فيهن ماانزل وقسملهن مافسم.

"আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, জাহিলিয়াতের যুগে আমরা মেয়েলোকদের কিছুই মনে করতাম না-কোনই গুরুত্ব দিতাম না। পরে যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে অকাট্য বিধান নাযিল করলেন এবং তাদের জন্য মীরাসের অংশ নির্দিষ্ট করে দিলেন, তখন আমাদের মনোভাবে ও আচরণের আমূল পরিবর্তন সাধিত হল।"(মুসলিম, তালাক অধ্যায়)

এই ভাবে ইসলাম নারীকে স্ত্রীরূপে তার নিজ আসনে যথাযোগ্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।

সহধর্মিনী বা স্ত্রীরূপে নারীর মর্যাদাঃ

ইসলামে স্ত্রী হিসাবে নারীকে যে উঁচু মর্যাদা ও সম্মান দেয়া হয়েছে দুনিয়ার অপর কোন সম্মানের সাথেই তার তুলনা হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেনঃ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

[১]. আল-কুরআন, ৪:১৯

Dhaka University Institutional Repository

"তাহারা (স্ত্রীরা) তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাহাদের পোশাক।[১]

পবিত্র কুরআনে স্বামী ও স্ত্রীকে পরস্পরের পোশাক বলে উল্লেখ করা হয়েছে এর অর্থ হল পোশাক যেমন দেহের সহিত মিলে মিশে থাকে ও মানব দেহকে বাহিরের অনিষ্ট হতে রক্ষা করে, স্বামী ও স্ত্রী ও তদ্রুপ পরস্পর মিলে মিশে থাকবে এবং একে অন্যকে সংরক্ষণ করবে।

এ আলোচনা হতে পরিস্ফুট হয়ে উঠে যে, নারীকে স্ত্রীরূপে তার যোগ্য মর্যাদা প্রদানে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মে এত জরুরী তাগিদ নেই। কুরআন হাদীস দ্বারা ইহাও প্রমাণীত হয়, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দুনিয়াতেই নিঃশেষ হইয়ো যায় না; বরং উভয়ে মুসলমানরূপে ইনতিকাল করলে তারা বেহেশতে ও স্বামী-স্ত্রীরূপে পরম সুখে বসবাস করার সৌভাগ্য লাভ করবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاء ○ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ○ عُرُبًا أَتْرَابًا○ لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ

"তাদের স্ত্রীদিগকে আমি বিশেষ ভাবে সম্পূর্ণরূপে নতুন করে সৃষ্টি করব এবং তাদিগকে চিরকুমারী বানিয়ে দিব। তারা হবে স্বামীদের প্রতি সোহাগিনী, আসক্ত ও বয়সে তাদের সমান; ডান পার্শ্বস্থ অর্থাৎ নেককার লোকদের জন্য।"[২]

এই ভাবে ইসলামই সর্বকালে নারীকে স্ত্রীরূপে পূর্ণমর্যাদায় অভিসিক্ত করেছে।

হালাল উপায়ে যৌন বাসনা পূরণের একমাত্র পন্থা হল বিবাহ। কিন্তু ইহা কেবল যৌন বাসনা চরিতার্থ করার সম্পর্ক নহে; বরং আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসা, প্রেম-প্রীতি ও আন্তরিকতার এই সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দিয়েছেন যেন তারা পরস্পর শান্তিতে বসবাস করতে পারে এবং তাঁর সৃষ্টি কারখানা টিকে থেকে মানব-সভ্যতা গড়ে উঠে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

[১]. আল-কুরআন ২:১৮৭

[২]. আল-কুরআন, ৫৬:৩৫-৩৮

এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।[১]

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

তিনিই আল্লাহ্, যিনি একটিমাত্র আত্মা হতে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। আর তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়।[২]

পবিত্র কুরআনে স্বামী ও স্ত্রীকে পরস্পরের পোশাক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হল পোশাক যেমন দেহের সহিত মিলে-মিশে থাকে ও মানব দেহকে বাইরের অনিষ্ট হতে রক্ষা করে, স্বামী-স্ত্রী ও তদ্রুপ পরস্পর মিলে-মিশে থাকবে এবং একে অন্যকে সংরক্ষণ করবে।

এ আলোচনা হতে পরিস্ফুট হয়ে উঠে যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে হৃদ্যতা, আন্তরিকতা, ভালবাসা ও প্রেম প্রীতিই দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি এবং এর মাধ্যমেই সুখময় জীবন গড়ে উঠে।

পবিত্র কুরআনে আরও বর্ণিত আছেঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.

নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে।[৩]

স্বামী স্ত্রীর উপর কর্তা, অভিভাবক ও দায়িত্বশীল, উল্লিখিত আয়াতই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে কর্তৃত্ব অর্পণের সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, ইহা যথাযথভাবে পালন না করলে মহান আল্লাহ্র দরবারে জবাবদিহী করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

তোমাদের প্রত্যেকেই পরিচালক ও দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেককেই তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহী করতে হবে। সুতরাং শাসনকর্তা তার

[১]. আল্-কুরআন, ৩০:২১
[২]. আল্-কুরআন, ৭:১৮৯
[৩]. আল্-কুরআন, ২:২২৮

Dhaka University Institutional Repository

অধীনস্থদের জন্য পরিচালক ও দায়িত্বশীল। এ দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জবাবদিহী করতে হবে। পুরুষ তার স্ত্রী-পরিবার পরিজনের জন্য পরিচালক ও দায়িত্বশীল। এ দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জবাবদিহী করতে হবে। ভৃত্য তার মনিবের ধন-সম্পদ রক্ষণা বেক্ষণের জন্য দায়িত্বশীল, এ জণ্য তাকে জবাবদিহী করতে হবে। খুব শতর্ক হও, তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের সকলকেই তোমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহী করতে হবে।(বুখারী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরও বলেনঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া তার উচিত নয়। আর আমি তোমাদের নারীদের সহিত উত্তম ব্যবহারের উপদেশ দিচ্ছি। কারণ, (পুরুষের) বুকের পাশের বক্র হাড় দ্বারা নারী সৃষ্ট হয়েছে এবং এর উপরের অংশই সর্বাধিক বাঁকা। তুমি যদি উহাকে একেবারে সোজা করতে চেষ্টা কর, তবে ইহা ভেঙ্গে যাবে। আর ইহাকে সোজা করতে চেষ্টা না করলে ইহা বাঁকাই থেকে যাবে। অতএব আমি তোমাদেরকে নারীদের সহিত উত্তম ব্যবহার করতে উপদেশ দিচ্ছি।[১]

স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহারের জন্য স্বামীদেরকে জোর তাকীদ দেয়া হযেছে। বস্তুত স্বামীদের সদ্ব্যবহার পাওয়ার একটা বিশেষ অধিকার স্ত্রীদের আছে। বৈবাহকি সম্পর্কের ভিত্তিই হল প্রাণঢালা প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা। আর এর দাবিই হল একাত্মতা, দয়া, সদাচরণ, ও সহানুভূতি, আচার-আচরণ ও মধুর সাহচর্যে স্বামী স্ত্রীকে মুগ্ধ করে তুলবে এটাই তো একান্ত ভাবে কাম্য।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেনঃ

আর স্ত্রীদের সহিত সৎভাবে জীবন যাপন কর। তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর, তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ্ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন ইহাকে ঘৃণা করছ।[২]

স্ত্রীদের সহিত উত্তম আচরণ ও সদ্ব্যবহারের সঙ্গে জীবন যাপন করার নির্দেশ এই আয়াতে দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তব জীবনে সৌন্দর্যহীনতা ও কোন ত্রুটির কারণে স্ত্রী স্বামীর পসন্দসই

---

[১]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, খন্ড-৩, হাদীস নং-৩০৮৪, পৃষ্ঠা-১২১২

[২]. আল্-কুরআন, ৪:১৯

Dhaka University Institutional Repository

না ও হতে পারে। এমতাবস্থায় মনক্ষুণ্ন হয়ে অকস্মাৎ তাকে পরিত্যাগের উদ্যোগ গ্রহণ করা স্বামীর পক্ষে সঙ্গত নয়; বরং যথাসম্ভব ধৈর্য্য ও সহনশীলতা ধরণ করা উচিত।

একটি পরিবারের মৌলিক দু'জন সদস্য হলো স্বামী এবং স্ত্রী। তাদের সম্পর্কের ভিত্তি বিবাহ। এই সম্পর্ক দু'টি বিশেষ গুণদ্বারা প্রভাবিত হবে। এর উল্লেখ রয়েছে পবিত্র আল-কুরআনে, এর একটি হলো ভালবাসা, অপরটি হলো বিবেচনা বা দয়া।

ভালবাসার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় শারীরিক সম্পর্ক বন্ধুত্ব এবং প্রগাঢ় অনুভূতি এর অবশ্যই গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু বিবেচনা দয়া এবং ক্ষমা ছাড়া সুন্দর পরিবার গড়ে উঠতে পারে না। মানুষ দুর্বল। সাময়িক উত্তেজনায় ধৈর্য্য হারা হয়, ভুল করে বসে। পারস্পরিক ত্রুটির প্রতি ক্ষমা এবং দয়া না থাকলে প্রতিক্ষেত্রেই চুলচেরা বিচার করিয়ে শাস্তি দেয়ানো যায়, কিন্তু শান্তি পাওয়া যায় না।

মানব জাতির যাত্রা শুরু হয় এক থেকে। স্বামী এবং স্ত্রীর মূল সূত্র এক। আদি মাতা হাওয়া (আঃ) সৃষ্টি হন আদি পিতা আদম (আঃ) থেকে। তাঁদের মধ্যে বিরাজিত ছিল সাম্য ও সম্প্রীতি। যেহেতু একক থেকে দুই হয়েছে, তাই একজন পাবে অন্যের মধ্যে "সাকান" বা শান্তি। আর এভাবেই ইসলাম নারী জাতিকে স্ত্রীরূপে তার মর্যাদায় সমাসীন করেছে।

স্বামী-স্ত্রী মধ্যে মনকাষাকষি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আর এ সুযোগে শয়তান পরস্পরের মনে নানারূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে কম চেষ্টা করে না। আর তাই সামান্য কারণে স্ত্রীর প্রতি ঘৃণা জমে উঠতে পারে। এ কারণেই নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ

"কোন মুসলিম পুরুষ যেন কোন মুসলিম মহিলাকে তার কোন একটি অভ্যাসের কারণে ঘৃণা না করে। কেননা একটি অপছন্দ হলে অন্য আরো অভ্যাস দেখে সে খুশী ও হয়ে যেতে পারে।"[১]

কেননা, কোন নারীই সম্পূর্ণরূপে খারাবীর প্রতি মূর্তি হয় না। কিছু দোষ থাকলেও অনেক গুলো গুণ ও তার থাকতে পারে। সেই কারণে কোন কিছু খারাপ লাগলে অমনি অস্থির, চঞ্চল ও দিশেহারা হয়ে যাওয়া উচিত নয়। তার অপরাপর ভালদিকে উন্মেষ ও বিকাশ লাভের সুযোগ দেয়া এবং সে জন্যে অপেক্ষা করা স্বামীর কর্তব্য। আল্লামা আহমাদুল বান্না

[১]. ইমাম তিরমিযী, সুনান, প্রাগুক্ত, খ.৪, হা. নং-৩৯, পৃ.৩১৬

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ কোন মুমিনের উচিৎ নয় অপর কোন মুমিন স্ত্রীলোক সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় ঘৃণা পোষণ করা, যার ফলে চূড়ান্ত বিচ্ছেদের কারণ দেখাদিতে পারে। বরং তার কর্তব্য হচ্ছে মেয়েলোকটির ভাল গুণের খাতিরে তার দোষ ও খারাবী ক্ষমা করে দেয়া আর তার মধ্যে ঘৃণার্হ যা আছে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করা, বরং তার প্রতি ভালবাসা জাগাতে চেষ্টা করা। হতে পারে তার স্বভাব-অভ্যাস খারাপ; কিন্তু সে বড় দ্বীনদার কিংবা সুন্দরী রূপসী যা নৈতিক পবিত্রতা ও সতীত্ব সম্পন্না অথবা স্বামীর জন্যে জীবন সঙ্গিনী।

উক্ত হাদিস সম্পর্কে আল্লামা শাওকানী লিখেছেনঃ এ হাদীসে স্ত্রীদের সাথে খুব ভাল ব্যবহার ও ভালভাবে বসবাস করার নির্দেশ যেমন আছে, তেমনি তার কোন এক অভ্যাস স্বভাবের কারণেই তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে নিষেধ ও করা হয়েছে। কেননা তার মধ্যে অবশ্যই এমন কোন গুণ থাকবে, যার দরুণ সে তার প্রতি খুশী হতে পারবে।

এজন্যে নবী করীম (সাঃ) স্বামীদের স্পষ্ট নসীহত করেছেন। বলেছেনঃ"তোমরা স্ত্রীদের সাথে সবসময় কল্যাণময় ব্যবহার করার জন্যে আমার নসীহত কবুল করো। কেননা নারীরা জন্মগত ভাবেই বাঁকা স্বভাবের হয়ে থাকে। তুমি যদি জোর পূর্বক তাকে সোজা করতে চাও, তবে তুমি তাকে চূর্ণ করে দেবে। আর যদি তাকে অমনি ছেড়ে দাও তবে সে সব সময় বাঁকা থেকে যাবে। অতএব বুঝে শুনে তাদের সাথে ব্যবহার করার আমার এ উপদেশ অবশ্যই গ্রহণ করবে।[১]

উক্ত হাদীসের মানে বদরুদ্দীন আইনীর ভাষায় নিম্নরূপঃ "আমি মেয়েলোকদের প্রতি ভাল ব্যবহার করার জন্যে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা তাদের সম্পর্কে আমার দেয়া এ নসীহত অবশ্যই কবুল করবে। কেননা তাদের সৃষ্টিই করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ মেয়েলোক পাঁজরের হাড়ের মত। তাকে সোজা করতে চাইবে তো তাকে চূর্ণ করে ফেলবে, আর তাকে ব্যবহার করতে প্রস্তুত হলে তার স্বাভাবিক বক্রতা রেখেই ব্যবহার করবে।[২]

এ হাদীস থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হল যে, নারীদের স্বভাবে বক্রতা স্বভাবগত ও জন্মগত। এ বক্রতা সম্পূর্ণরূপে দূরা করা কখনো সম্ভব হবে না। তবে তাদের আসল

---

১ . মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, খন্ড-৩, কিতাব-احاويت الانبياء , বাব-خلفه أرم وذرني পৃষ্ঠা-১২১২

২ . ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল কুশায়রী, সহীহ মুসলিম, বৈরুত, দারু ইহইদাউত তুরাম, খন্ড-২, কিতাব- الرضاع , বাব- الوصسي بالنساء হাদীস নং-২৬৭০, পৃষ্ঠা-১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতিকে বজায় রেখেই এবং তাদের স্বভাবকে যথাযথভাবে থাকতে দিয়েই তাদেরকে নিয়ে সুমধুর পরিবারিক জীবন গড়েতোলা যেতে পারে, সম্ভব তাদের সহযোগিতায় কল্যাণময় দাম্পত্য জীবন ও সমাজ গড়া। আর তা হচ্ছে, তাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা, তাদের সাথে অত্যন্ত দরদ, নম্রতা ও সদিচ্ছাপূর্ণ ব্যবহার করা এবং তাদের মন রক্ষা করতে শেষ সীমা পর্যন্ত যাওয়াও যেতে রাজী থাকা। এ ধরণের কথার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী সমাজের জটিল ও নাজুক মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে পুরুষ সমাজকে অত্যাধিক সতর্ক ও সাবধান করে তোলা। এ কথার ফলে পুরুষরা নারীদের সমীহ্ করে চলবে, তাদের মনস্তত্ত্বের প্রতি নিয়ত খেয়াল রেখেই তাদের সাথে আচার ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ হবে। এ কারণে পুরুষদের কাছে নারীরা অধিকতর আদরনীয়া হবে। এতে তাদের দাম বাড়ল বৈ কমল না একটুকুও।

মহান আল্লাহ যখন স্বামীর উপর স্ত্রীর বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা পরিবর্তন করার ক্ষমতা কার আছে? আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত স্ত্রীর এ অধিকার স্বামী আদায় না করলে তাকে অবশ্যই পরকালে বান্দার হক নষ্ট করার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। পবিত্র কুরআনে কত সুন্দর পদ্ধতিতে নারীদের পক্ষে সুপারিশ করে বলা হয়েছেঃ

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً

"স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।"[১]

স্ত্রীকে পছন্দ না হওয়ার পেছনে অবশ্যই কোন কারণ থাকবে। স্ত্রীর আখলাক ও চরিত্র সুন্দর না হওয়াই পছন্দ না হওয়ার অন্যতম কারণ হয়ে থাকে। স্ত্রী সুন্দর ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী না হলে স্বামীর জন্য তা খুবই কষ্টকর হয়। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতে যেন প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, স্ত্রীর অসুন্দর চরিত্রকে তিনি কল্যাণ লাভের কারণে পরিণত করবেন। আল্লাহ মহাশক্তি ও প্রজ্ঞার অধিকারী। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই, যা তিনি করতে সক্ষম নন। অসৎ চরিত্রের স্ত্রীর গর্ভে তিনি এমন নেক সন্তান দান করতে পারেন, যে কিয়ামত দিবসে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য নাজাতের কারণ হয়ে যেতে পারে।

---

[১]. আল্-কুরআন, ৪:১৯

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে স্ত্রীদের উপর জুলুম অত্যাচার করা নিষেধঃ

ইসলামে নারীকে স্ত্রীরূপে প্রতিটি ক্ষেত্রে তার যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদানের নজির রেখেছে। নারীরা খুব কষ্ট সহিষ্ণু অল্পে সন্তুষ্ট, স্বামীর জন্যে জীবন প্রাণ উৎসর্গ করতে সতত প্রস্তুত। সন্তান গর্ভে ধারণ, সন্তান প্রসব ও সন্তান লালন পালনের কাজ নারীরা মায়েরা যে কতখানি কষ্ট সহ্য করে সম্পন্ন করে থাকে, পুরুষদের পক্ষে তা অনুমান পর্যন্ত করা সহজ নয়। এ কাজ একমাত্র তাদের পক্ষেই করা সম্ভব। ঘর-সংসারের কাজ করায় ও ব্যবস্থাপনায় তারা অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত, একান্ত বিশ্বাসভাজন ও একনিষ্ঠ। তাই বলা যায়, তাদের মধ্যে দোষের তুলনায় গুণের দিক অনেক গুণ বেশী।

তাই ইসলাম ধর্মে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ক্ষমাশীলতা দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য ও স্থায়িত্বের জন্যে একান্তই অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছেন। যে স্বামী স্ত্রীকে ক্ষমা করতে পারে না, ক্ষমা করতে জানে না, কথায় কথায় দোষ ধরাই যে স্বামীর স্বভাব, শাসন ও ভীতি প্রদর্শণই যার কথার ধরণ, তার পক্ষে কোন নারীকে স্ত্রী হিসেবে সঙ্গে নিয়ে স্থায়ীভাবে জীবন যাপন করা সম্ভব হতে পারে না। স্ত্রীদের সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রতি ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রয়োগের ও নির্দেশ দেয়া হয়েছে কুরআন মাজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের শত্রু। অতএব তাদের সম্পর্কে সাবধান! তবে তোমরা যদি তাদের ক্ষমা কর, তাদের উপর বেশী চাপ প্রয়োগ না কর বা জোর জবরদস্তি না কর এবং তাদের দোষ-ত্রুটি ও ক্ষমা করে দাও, তাহলে জেনে রাখবে, আল্লাহ্ নিজেই বড় ক্ষমাশীল ও দয়াবান।[১]

নবী করীম (সাঃ) তাঁর স্ত্রীদের অনেক বাড়াবড়িই মাফ করে দিতেন। হযরত উমর ফারুকের বর্নিত একদিনের ঘটনা থেকে তা বাস্তব ভাবে প্রমাণিত হয়। "হযরত উমর (রাঃ) একদিন খবর পেলেন, নবী করীম (সাঃ) তাঁর বেগমগণকে তাদের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির কারণে তালাক দিয়েছেন। তিনি এক খবর শুনে খুবই ভীত হয়ে রাসূলের নিকট উপস্থিত হলে।

[১]. আল্-কুরআন, ৬৪:১৪

Dhaka University Institutional Repository

জিজ্ঞেস করলনঃ আপনি আপনার বেগমদের তালাক দিয়েছেন? রাসূল (সাঃ) তাঁর সাথে হাসিমুখে কথাবার্তা বলেছেন।(বুখারী)

এ হাদীসকে ভিত্তি করে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেনঃ

وفيه الصبرعلى الزو جات والا عفاء عن خطئهن والصفح عها يقح منهن من ذلل فى حق المرء دون مايكون من حق الله.[১]

এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীদের পীড়ন ও বাড়াবাড়িতে ধৈর্য ধারণ করা, তাদের দোষ-ত্রুটির প্রতি বেশী গুরুত্ব না দেয়া এবং স্বামীর অধিকারের পর্যায়ে তাদের যা কিছু অপরাধ বা পদস্খলন হয়, তা ক্ষমা করে দেয়া স্বামীর একান্তই কর্তব্য। ইসলাম এভাবেই নারীদের অধিকার সমুন্নত রেখেছে। ইসলাম মান:বতর ধর্ম,এ ধর্মে অন্যান্য ধর্মের মত নারীকে পণ্য হিসেবে না দেখে তাকে যথাযোগ্য মর্যদা দিতে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে।

পুরুষ মানুষ যাতে তাদের স্ত্রীদের জুলুম অত্যাচার না করে সে ব্যাপারে ইসলাম ধর্মে কঠোর বিধি নিষেধ রয়েছে। স্ত্রীদের জুলুম অত্যাচার করা, স্ত্রীকে কষ্ট দেয়া ও দাম্পত্য জীবনকে বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত করা ও ইসলামে নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদের নিন্মোক্ত আয়াতটি উল্লেখ করা যেতে পারে। বলা হয়েছেঃ

وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً

“তোমাদের স্ত্রীদের নানা ভাবে কষ্টদান ও উৎপীড়নের উদ্দেশ্যে আটক করে রেখনা। যে লোক এরূপ করবে, সে নিজের উপরই জুলুম করবে। আর তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে খেলনার বস্তুতে পরিণত করো না।”[২]

স্ত্রীকে কোন প্রকার অকারণে কষ্টদেয়া বা তার ক্ষতি করা যে নিষেধ, তা এ আয়াত থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। আর ও বোঝা যাচ্ছে যে, নিজের স্ত্রীকে যে লোক কষ্ট দেবে, জুলুম-পীড়ন করবে। পরিণামে তার নিজের জীবনই নানাভাবে জর্জরিত হয়ে উঠবে, সে নিজেই কষ্টপারে, তার দাম্পত্য জীবনই দুঃসহ তিক্ততায় পূর্ণ হয়ে যাবে এবং স্ত্রীর সাথে মধুর

১ . বদরুদ্দীন আইনী উমদাতুল ক্বারী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮৩। (عمدةالقارى ج٢-ص. ١٨٣)

২ . আল্-কুরআন, ২ঃ২৩১

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্ক বজায় রাখলে যে শন্তিপূর্ণ সুখময় জীবন যাপন সম্ভব, তা থেকে সে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

বস্তুত স্ত্রীদের সাথে মিষ্টি ও মধুর ব্যবহার করা এবং তাদের কোনরূপ কষ্ট না দিয়ে শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও যদি কেউ তার স্ত্রীকে অকারণ জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়, ক্ষতিগ্রস্থ করতে চেষ্টিত হয়, তবে সে আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করার কারণে আল্লাহর গজব পড়ার যোগ্য হবে। আল্লামা আ-লুসীর মতে তার নিজের কষ্ট ও ক্ষতি হবে।

নবী করীম (সাঃ) তাঁর নিজের ভাষায় স্ত্রীদের মারপিট করতে স্পষ্ট নিষেধ করেছেন। বলেছেনঃ

لاَتَضْرِ بَنَّ ظَعِيْنَتَكَ ضَرْ بَكَ اُمَيَّتِكَ

তোমরা স্ত্রী-অংকশায়িনীকে এমন নির্মমভাবে মারধোর করো না, যেমন করে তোমার মেরে থাকো তোমাদের ক্রীতদাসীদের।[১]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জামায়াতা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ-

لاَتَجْلِدُ احَدُ كُمْ اِمْرَاَ تَهُ جَلْدِ الْعَبْدَ ثُمَّ يُجَا مِعْها فِى اِجرِالْيَوْمِ

তোমাদের কেউ যেন তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসদের মারার মত না মারে, আর মারধোর করার পর দিনের শেষে তার সাথে যেন যৌন সঙ্গম না করে।[২]

অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে যৌন-সঙ্গম করা তো এক স্বাভাবিক কাজ, কিন্তু স্ত্রীকে একদিকে মারধোর করা অপরদিকে সেদিনই তার সাথে যৌন সঙ্গম করা অত্যন্ত ঘৃর্ণাহ কাজ। এ দুয়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। স্ত্রীদের মারধোর করা, গালাগাল করা এবং তাদের সাথে কোনরূপ অন্যায় জুলুম জাতীয় আচরণ গ্রহণ করতে নিষেধ করে রাসূলে করীম (সাঃ) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেনঃ

لاَتَضْرِ بُوْ هُنَّ ولاَ تَقْبَحُوْ هُنَّ (ابوداؤد)

---

[১] . ইমাম আবু দাউদ, সুনান, প্রাগুক্ত, (১ম খন্ড) বাব باب الانستنلز অধ্যায় كتاب الطهارة হা. নং-১২৩, পৃ.-১৭৯।

[২] . ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, খন্ড ৫, كتاب الطاةر , باب فى الاستنشار হাদীস নং-১৪২

Dhaka University Institutional Repository

তোমরা স্ত্রীদের আদৌ মারধোর করবেনা এবং তাদের মুখমন্ডলকে কুশ্রী ও কদাকার করে দিওনা।[১]

রাসূলে করীম (সাঃ) আরো বলেছেনঃ

لاَتَضْرِ بُوْا اَمَاءَ اللهِ (ابوداؤد)

আল্লাহ্‌র দাসীদের তোমরা মারধোর করো না।[২]

লক্ষণীয় যে, স্ত্রীদেরকে এখানে 'আল্লাহ্‌র দাসী' বলা হয়েছে, পুরুষদের বা স্বামীদের দাসী নয়। তাই তাদের অকারণে মারধোর করা কিংবা তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করার কোন অধিকার স্বামীদের নেই।

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ

وَلاَتَضْرِ بِ الْوَجهَ وَلاَ تَقْبَحْ وَلاَتَهْجُوْ الاَّفِى الْبَيْتِ (ابوداؤد)

তোমরা স্ত্রীদের মুখের উপর মারবে না, মুখমন্ডলের উপর আঘাত দেবে না, তাদের মুখের শ্রীবিনষ্ট করবে না, অকথ্য ভাষায় তাদের গালাগাল করবে না এবং নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তাদের বিচ্ছিন্নাবস্থায় ফেলে রাখবে না।[৩]

উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল কাহলানী বুখারী লিখেছেনঃ

وَفِى الْحَدِيْثِ دَلِيْلٌ عَلَ جَوَازِ ضَرْبِ الْمَلْءَةِ ضَرْبًا خَفِيْفً.(سبل السلام ج ٣. ص ١۶۴)

হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীকে খুব হালকাভাবে সামান্য মারধোর করা জায়েয।[৪]

মারধোর করা কখনও কি কারণে করা সঙ্গত?....... এ পর্যায়ে প্রথমে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করা যেতে পারে। আয়াতটি হলঃ

وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً

---

১. ইমাম আবূ দাউদ, সুনান, প্রাগুক্ত, খন্ড-২, কিতাবুল নিকাহ্‌, হাদীস নং-২১৪৪, পৃ.৬০৭।
২. ইমাম আবু দাউদ, সুনান, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, হাদীস নং-১৮৩০, পৃষ্ঠা-৪৫।
৩. ইমাম আবূ দাউদ, আবূ দাউদ, ২য় খন্ড, বাব-باب المرأة على زوجها خق এর অধ্যায় كتاب النكاح হাদীস নং-১৮৩০, পৃষ্ঠা-৪৫।
৪. ইসলামের পথ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

আর যেসব স্ত্রীলোকের অনানুগত্য ও বিদ্রোহের ব্যাপারে তোমরা ভয় কর, তাদের ভালভাবে বুঝাও, নানা উপদেশ দিয়ে তাদের বিনয়ী বানাতে চেষ্টা কর। পরবর্তী পর্যায়ে মিলন-শয্যা থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখ। আর (শেষ উপায় হিসেবে) তাদের উপর অন্যায় ব্যবহারের নতুন কোন পথ খুঁজে বেড়িও না। ..... নিশ্চয় আল্লাহ্ই হচ্ছেন সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ।[১]

এ আয়াতে দুনিয়ার মুসলিম স্বামীদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে। "ভয় করা" মানে জানতে পারা অথবা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারা যে, স্ত্রী স্বামীকে মানছে না, অথচ স্বামীকে মেনে চলাই স্ত্রীর কর্তব্য। এরূপ অবস্থায় স্বামী কি করবে, তা-ই বলা হয়েছে এ আয়াতে। এখানে প্রথমে বলা হয়েছে স্ত্রীকে ভালভাবে বোঝাতে, উপদেশ দিতে ও নসীহত করতে, এ কথা তাকে জানিয়ে দিতে যে, স্বামীকে মান্য করে চলা, স্বামীর সাথে ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলা ও তা বজায় রাখার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলাই নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথায় তার ইহকালীন দাম্পত্য জীবন ও পারিবারিক জীবন তিক্ত-বিষাক্ত হয়ে যাবে, আর পরকালেও তাকে আল্লাহ্র আযাব ভোগ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, অমান্যকারী স্ত্রীকে মিলন-শয্যা থেকে সরিয়ে রাখা তার সাথে যৌন সর্ম্পক বিচ্ছিন্ন করা। অন্য কথায় তাকে না শয্যা সঙ্গী বানাবে, না তার সাথে যৌন সম্পর্ক বজায় রাখবে। আর তৃতীয়ত বলা হয়েছে তাকে মারধোর করতে। কিন্তু এ মারধোর সম্পর্কে একথা স্পষ্ট যে, তা অবশ্যই শিক্ষামূলক হতে হবে মাত্র। ক্রীতদাস ও জন্তু জনোয়ারকে যেমন মারা হয়, সে রকম মার দেয়ার অধিকার কারো নেই।

স্ত্রীদের উপর অন্যায়ভাবে, অকারণে ও উঠতে বসতে আর কথায় কথায় কোনরূপ দুর্ব্যবহার বা মারধোর করতে শুধু নিষেধ করেই ক্ষান্ত করা হয়নি, ইসলাম আরো অগ্রসর হয়ে স্ত্রীদের প্রতি সক্রিয়ভাবে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন স্বামীদেরকে। এ পর্যায়ে কুরআনের আয়াতঃ وَعَاشِرُوْ هُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

স্ত্রীদের সাথে যথাযথ ভাবে খুব ভাল ব্যবহার করবে।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আ-লুসী লিখেছেনঃ

خالقو هن بالمعروف وهو مالاينكره الشرع والمروة.

---

[১]. আল্-কুরআন, ৪:৩৪

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের সাথে ভালভাবে ব্যবহার করো। আর 'ভালভাবে" মানে এমনভাবে যা শরীয়াত ও মানবিকতার দৃষ্টিতে অন্যায় নয়-খারাপ নয়।[১] এ ভালভাবে কথার মধ্যে এ কথাও শামিলঃ

ان لايضربهاو يسئ الكلام معها ويكون منبيط الوجه لها-(ايضا)

স্ত্রীকে মারধোর করবেনা, তার সাথে খারাপ কথাবর্তা বলবে না এবং তাদের সাথে সদা হাসিমুখে ও সন্তুষ্টচিত্তে সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে।

তাফসীর কারকদের মতে এ আয়াত থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী যদি ঘরের কাজকর্ম করতে অক্ষম হয় বা তাতে অভ্যস্ত না হয়, তাহলে স্বামী তার যাবতীয় কাজ করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে বাধ্য।[২] (تفسر معا سن التا ويل روح المعانى)

স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার করা পূর্ণ ঈমান ও চরিত্রের লক্ষণ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম, নিষ্কলুষ সে সবচেয়ে বেশী পূর্ণ ঈমানদার। আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে তার স্ত্রী নিকট সবচেয়ে ভাল।[৩]

অপর এক হাদীসে স্ত্রীদের ব্যাপারে রাসূলে করীম (সাঃ) এর নিজের ভূমিকা উল্লেখ করে বলা হযেছেঃ

তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাললোক সে, যে তার পরিবার ও স্ত্রী-পরিজনের পক্ষে ভাল। আর আমি নিজের পরিবারবর্গের পক্ষে তোমাদের তুলনায় অনেক ভাল। তোমাদের সঙ্গী-স্ত্রী বা স্বামী-যদি মরে যায়, তাহলে তার কল্যাণের জন্য তোমরা অবশ্যই দোয়া করবে।

স্ত্রীদের অপ্রস্তুত অবস্থায় না ফেলার তাগিদঃ

ইসলামে নারীদের কোনরূপ অপ্রস্তুত ও অবস্থায় ফেলে তাদের বিব্রত করে তুলতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে তাদের অবসর দিতে হবে। দীর্ঘদিন পর হঠাৎ করে রাতের বেলা বাড়ীতে উপস্থিত হলে স্ত্রী নিজেকে অপ্রস্তুত ও বিব্রত বোধ করতে পারে। এজন্য রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেনঃ

---

১. রুহুল মা'আনী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪৩।
২. রুহুল মা'আনী, ৪র্থ খন্ড।
৩. ইমাম তিরমিযী, সুনান, প্রাগুক্ত, খন্ড-৩, باب ماجاء فى حق المراة على زوجمار الرضاع হা. নং-১১৬২, পৃ.৪৬৬

Dhaka University Institutional Repository

اذا اطال احدكو الغيبة فلايطرق اهله ليلا. (بخارى)

তোমাদের কেউ যদি দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাড়ীতে অনুপস্থিত থাকার পর ফিরে আসে, তাহলে পূর্বে খবর না দিয়ে রাতের বেলা হঠাৎ করে বাড়ীতে পৌঁছে যাওয়া উচিত নয়।[১]

হযরত জাবির (রাঃ) বলেছেনঃ আমরা এক যুদ্ধে রাসূলে করীম (সাঃ) এর সঙ্গে ছিলাম। পরে যখন আমরা মদীনায় ফিরে এলাম, তখন আমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঘরে চলে যেতে ইচ্ছা করল। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) বললেনঃ

امهلو احتى تل خلوا ليلالكى تمشط الشعثة وتستحد الغيبة .

কিছুটা অবসর দাও। রাতে ঘরে ফিরে যেতে পারবে। এই অবসরে তোমাদের স্ত্রীরা প্রয়োজনীয় সাজ-সজ্জা করে নেবে, গোপন অঙ্গ পরিচ্ছন্ন করবে এবং তোমাদের গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুতি নিতে পারবে।[২]

মেয়েরা সাধারণত অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকে, তাদের মাথায় ও হয়ত ঠিক মত চিরুণী করা হয় না। প্রয়োজনীয় সাজ-সজ্জায় সুসজ্জিত হয়েও তারা সব সময় থাকে না। বিশেষত স্বামীর দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতিতে মেয়েরা নিজেদের সাজ-সজ্জার ব্যাপারে খুবই অসতর্ক হয়ে পড়ে। নবী করীম (সাঃ) সাহাবিগণকে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘদিন পরে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে ও সঙ্গে সঙ্গেই সকলকে নিজের ঘরে ফিরে যেতে দিলেন না। তাদের প্রত্যাবর্তনের খবর সকলের জানা হয়ে গেছে। স্ত্রীরা নিজের নিজের স্বামীকে সাদরে গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুতি নিতে পারছে এই অবসরে। এ দৃষ্টিতে রাসূলে করীম (সাঃ) এর উক্ত কথার তাৎপর্য স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে। স্বামীর দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতির কারণে স্ত্রী হয়ত ময়লা দেহ ও মলিন বসন পরিধান করে রয়েছে। তার মাথার চুলও হয়ত আচঁড়ানো হয়নি। এরূপ অবস্থায় স্বামী যখন তাকে দেখতে পাবে দীর্ঘদিনের বিরহের পর, তখন স্বামী যে নিরাশ ও নিরানন্দের বেদনায় মূষড়ে পড়বে এবং স্ত্রী ও যে এরূপ অবস্থায় দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পরও অন্তরঢালা আনন্দ সহকারে স্বামীকে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিতা হবে, তা বুঝতে পারা দুনিয়ার স্বামী ও স্ত্রীদের পক্ষে কঠিন নয়। বস্তুত এর দরুণ স্বামীদের মন স্ত্রীর প্রতি

---

১ . মুহাম্মদ ইসমাঈল ইবনে বুখারী, সহীহ, বৈরুত, তারিখ বিহীন, ২য় খন্ড,كتاب النكاح এরباب لايطرق الملہ ليلا অধ্যায়ের হাদীস নং ৪৮৪৩।

২ . ইমাম বুখারী, সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, باب طلب الولد , হাদীস নং-৪৯৪৭

Dhaka University Institutional Repository

বিরূপ ও তিক্ত বিরক্ত হয়ে যেতে পারে, আর স্ত্রীর মনও স্বামীর কাছে ছোট হয়ে যেতে পারে। এরূপ অবস্থায় স্বামী স্ত্রী কারো মন খারাপ হয়ে যাবার কোন কারণ যাতে না ঘটতে পারে, এ জন্যেই রাসূলে করীম (সাঃ) সাহাবীদের উক্তরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন। অন্যথায় যারা সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় আর সন্ধ্যায় ঘরে ফিলে আসে, তাদের জন্যে এ রকম কিছু করণীয় নেই। উপরোক্ত আলোচনা হতে আমরা বুঝতে পারি যে, ইসলাম স্ত্রীকে তার সঠিক মর্যদা পাবার সকল দিক নির্দেশনা পাকাপোক্ত করে রেখেছেন।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক উপহার বিনিময়ঃ

স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রেম-ভালবাসার স্থায়িত্ব ও গভীরতা বিধানের উদ্দেশ্যে ইসলাম পরস্পরের মধ্যে উপহার-উপঢৌকন বিনিময়ের প্রথা রেখেছেন। স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে মাঝে মধ্যে বিনিময়ের প্রথা রেখেছেন। স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে মাঝে-মধ্যে নানা ধরণের চিত্তাকর্ষক দ্রব্যাদি দেয়া। স্ত্রীর ও যথাসাধ্য তাই করা উচিত। যার যে রকম সম্বল ও সামর্থ্য, সেই অনুপাতে যদি পরস্পরের উপহার দ্রব্যের আদান-প্রদান হয়, তাহলে তার ফলে পারস্পরিক আকর্ষণ কৌতুহল ও হৃদয়াবেগ বৃদ্ধি পাবে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি থাকবে সদা সন্তুষ্ট। এ জন্যে রাসূলে করীম (সাঃ) এর একটি সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত উপদেশ সবসময় স্মরণে রাখা কর্তব্য। তা হলোঃ তَهَا دُوْا تَحَابُّوْا —

তোমরা পরস্পর উপহার-উপঢৌকনের আদান-প্রদান করো। দেখবে, এর ফলে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসার সৃষ্টি হয়েছে, পারস্পরিক প্রেম ভালবাসার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে।

অপর এর হাদীসে বলা হয়েছেঃ

تَهَا دُوْا فَاِنَّ الْهَدْ يَةَ تَذْ هَبْ وَغْرِ الصَّدْرِ—

তোমরা পরস্পরে হাদিয়া তোহ্ফার আদান প্রদান করবে, কেননা হাদিয়া তোহ্ফা দিলের ক্লেদ ও হিংসা-দ্বেষ দূর করে দেয়।[১]

[১]. ইমাম আহম্মদ, মুসনাদে আহম্মদঃ হা. নং-৮৮৮২ পৃঃ নং-৪২৫(উক্ত হাদিসটি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ইমাম তিরমিযী, তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খন্ড-৪, হা. নং-২১৩০, পৃ.৪৪১।

Dhaka University Institutional Repository

এর কারণ সুস্পষ্ট। মানুষের দিলে ধন-মালের মায়া খুবই তীব্র ও গভীর। তা যদি কেউ অন্য কারো নিকট থেকে লাভ করে, তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই তার মন তার দিকে ঝুঁকে পড়ে, আকৃষ্ট হয় এবং মাল-সম্পদ দানকারীর মন ও ঝুঁকে পড়ে তার প্রতি, যাকে সে দান করল। ইবরাহীম ইবনে ইয়াজীদ নখ্‌লী বলেছেনঃ

পুরুষের পক্ষে তার স্ত্রীকে এবং স্ত্রীর পক্ষে তার স্বামীকে উপহার দান খুবই বৈধ কাজ। তিনি আরো বলেছেনঃ

স্ত্রী যদি স্বামীকে কিংবা স্বামী যদি স্ত্রীকে কোন উপহার দেয়, তবে তা তাদের প্রত্যেকের জন্যে হবে তার পাওয়া দান।

কিন্তু এ ব্যাপারে শরীয়াতের নির্দেশ হল, কেউই অপরের দেয়া উপহার ফেরত নিতে বা দিতে পারবে না। ইবরাহীম নখ্‌লী বলেছেনঃ এ দুয়ের কারোর পক্ষেই তার নিজের দেয়া উপহার ফিরিয়ে নেয়া জায়েজ নয়।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয বলেছেন, ‘এভাবে উপহার আদান-প্রদান করলে কেউই কারোটা ফিরিয়ে দেবেনা, ফিরিয়ে নেবে না।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেনঃ

لايرجع الز وج عل الزو جه ولا الز وجه عل الزوج فيهاو هب احل هما للاخر.

স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে যা কিছু একবার দিয়ে দিয়েছে, তা ফেরত নেয়া কারো পক্ষেই জায়েয নয়।[১]

ইবনে বাত্তাল বলেছেনঃ কারো কারো মতে স্ত্রী তার দেয়া জিনিস ফিরিয়ে নিলেও নিতে পারে; কিন্তু স্বামী তার দেয়া উপহার কিছুতেই ফিরিয়ে নিতে পারবে না।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মান-অভিমান অনেক সময় জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব করে। অনেক সময়তা সীমাতিক্রম ও করে যায়।

অনেক সময় কথার কাটাকাটি ও তর্ক-বিতর্কে ও পরিণত হয়ে পড়ে। রাসূলে করীম (সাঃ)-এর দাম্পত্য জীবনেও তা লক্ষ্য করা গিয়েছে। হযরত উমরের বেগম একদিন হযরত উমরকেই বললেনঃ

---

[১] . বদরুদ্দীন আইনী উমদাতুল ক্বারীঃ মিশর, মাতবাআতুত মুসতাফা আল বাবী, ১৩তম খন্ড, ১৯৭২, পৃষ্ঠা: ১৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর কসম, নবীর বেগমরা পর্যন্ত তাঁর কথার প্রত্যুত্তর করে থাকেন। এমন কি তাঁদের এক-একজন রাসূলকে দিনের বেলা ত্যাগ করে রাত পর্যন্ত অভিমান করে থাকেন।[১]

তখন হযরত ওমর (রাঃ) চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে তাঁর কন্যা উম্মুল। মু'মিনীন হযরত হাফসার নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন ও সত্যাসত্য জানতে চাইলেন। জবাবে হাফসা হ্যাঁ-সূচক উক্তি করলেন। হযরত উমর এর পরিণাম ভয়াবহ মনে করে কন্যাকে সাবধান করে দিলেন ও বললেনঃ

لاتستكترى النبى صلى الله عليه وسلم ولاترا جعيه فى شئ ولاتهجربه وسلى ما بل الك.

সাবধান! তুমি রাসূলের নিকট বেশী বেশী জিনিস পেতে চাইবে না। তাঁর কথায় মুখের উপর জবাব দেবে না, রাগ করে কখনো তাঁকে ত্যাগ করবে না। আর তোমরা কোন কিছুর প্রয়োজন হলে তা আমার নিকট চাইবে।[২]

নিজের কন্যার দাম্পত্য জীবন সুখের হওয়ার জন্যে অর্থ ব্যয় করার একটা নির্দেশ এতে নিহিত রয়েছে। আর এ হচ্ছে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই মর্যাদা রক্ষার ব্যাপার এবং এ উদ্দেশ্য অর্থ ব্যয় করা কর্তব্য। জামাতার নিকট মেয়ে বেশী বেশী জিনিস চাইলে তার কষ্ট হতে পারে মনে করে কন্যার জন্যে অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত হওয়ার ও নিদর্শণ এতে রয়েছে।

ইসলাম এভাবে নারীকে তার অধিকার দিয়ে মর্যাদা প্রদান করেছে।

স্ত্রীর অধিকারের গুরুত্ব প্রদানঃ

ইবাদত বন্দেগী ও কৃচ্ছতা সাধন অনেক প্রশংসার কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু তা করতে গিয়ে স্ত্রীর অধিকার হরণ করা, তার পাওনা যথারীতি ও পুরাপুরি আদায় না করা, তার সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্নকরা নিশ্চয়ই বড় গুনাহ্। নবী করীম (সাঃ) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেনঃ

انَّ لِزَوْ جِكَ عَلَيْكَ حَقًّا-(بخاءى)

নিশ্চয়ই তোমার স্ত্রীর তোমার উপর একটা অধিকার রয়েছে।[৩]

---

[১]. ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, খন্ড. ৫, باب مظالم, হা.নং-৪৮৭৫, পৃ.১৯৯১।

[২]. মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল, সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, كتاب التكاح এর ৪৭৯২ নং হাদীস, পৃষ্ঠা-১৯২।

[৩]. ইমাম বুখারী, সহীহ বুখারী, খন্ড.২, رکتاب الصوح باب حق الضيف فى الصوم হা. নং-১৮৭৩, পৃ. ৬৭৬

কেবল স্ত্রীর অধিকার স্বামীর উপর, সে কথা নয়, স্বামীরও অধিকার রয়েছে স্ত্রীর উপর আল্লামা বদরুদ্দীন এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ

(علية القري ج ٢٠ ص ١٨٨) স্বামী স্ত্রী প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে প্রত্যেকের উপর। স্বামীর উপর স্ত্রীর যা কিছু অধিকার, তার মধ্যে একটি হচ্ছে তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন। আর সাধারণ ভাবে তার প্রাপ্য হচ্ছেঃ

اَنْ تُطْعِمُهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْ مَا غِذَا اكْتَسَيْتَ (ابوداؤد)

তাকে খাবার দেবে যখন যেমন তুমি নিজে খাবে এবং তার পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করে দেবে, যেমন মানের পোশাক তুমি নিজে গ্রহণ করবে।[১]

এ হাদীসের তাৎপর্য মওলানা খলীলুর রহমান লিখেছেনঃ "স্ত্রীর খোরাক ও পোশাক যোগাড় করে দেয়া স্বামীর কর্তব্য, যখন সে নিজের জন্যে এ গুলোর ব্যবস্থা করতে যথার্থ হবে।

(بذل المجهود ج ٣ص ٦٦)

আল্লামা আল্-খাত্তাবী লিখেছেনঃ এ হাদীস স্ত্রীর খোরাক পোশাকের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর উপর ওয়াজিব করে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই, প্রচলন মতই তা করতে হবে, করতে হবে স্বামীর সামর্থ্যানুযায়ী। আর রাসূলে করীম (সাঃ) যখন একে 'অধিকার' বলেছেন তখন তা স্বামীর অবশ্য আদায় করতে হবে সে উপস্থিত থাক, কি অনুপস্থিত সময়মত তা পাওয়া না গেলে তা স্বামীর উপর অবশ্য দেয় ঋণ হবে-যেমন অন্যান্য হক অধিকারের ব্যাপারে হয়ে থাকে। (معا لم السنن ج ٢ ص ١٢٢)

এতদ্ব্যতীত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে স্ত্রীর নিকট যাওয়াও স্ত্রীর একটি অধিকার স্বামীর উপর এবং তা স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীর প্রতি। স্বামী যদি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হয়। তবে তাতে স্ত্রীর মনে আনন্দের ঢেউ খেলে যাওয়া স্বাভাবিক। কেননা তাতে প্রমাণ হয় যে, স্বামী স্ত্রীর মন জয় করার জন্যে বিশেষ যত্ন নিয়েছে এবং পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারেই সে স্ত্রীর নিকট হাজির হয়েছে। অপরিচ্ছন্ন ও মলিন দেহ ও পোশাক নিয়ে স্ত্রীর নিকট যাওয়া স্বামীর একেবারেই অনুচিত। স্ত্রীর ও কর্তব্য স্বামীর ইচ্ছানুরূপ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ও সে

[১]. ইমাম আবু দাউদ, সুনান, প্রাগুক্ত, খন্ড-২, باب حق المراه على زوجها, হা. নং-২১৪২, পৃ.৬০৬.

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থায়ই স্বামীর নিকট যাওয়া। এ জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সাবান ও অন্যান্য জরুরী প্রসাধনী দ্রব্য সংগ্রহ করে দেয়া স্বামীর কর্তব্য। হযরত ইবনে আব্বাস এ পর্যায়ে একটি নীতি হিসেবে বলেছেনঃ আমি স্ত্রীর জন্যে সাজসজ্জা করা খুবই পছন্দ করি, যেমন পছন্দ করি স্ত্রী আমার জন্যে সাজসজ্জা করুক। স্ত্রীর অধিকারের ব্যাপারে নবী করিম (সাঃ) বলেনঃ

"স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার জামিনে তোমরা তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছ এবং আল্লাহর কালেমার জামিনে তোমরা তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে তোমরা তাহাদের লজ্জাস্থানকে তোমাদের জন্য হালাল করিয়া লইয়াছ। তাহাদের উপর তোমাদের অধিকার এই, তোমাদের বিছানায় তাহারা অন্য কাহাকেও আসিতে দিবে না। তাহারা ইহা করিলে তাহাদিগকে হালকা ধরণের আঘাত কর। আর তোমাদের উপর তাহাদের অধিকার এই তোমরা তাহাদিগকে প্রচলিত রীতি অনুসারে ভদ্রোচিতভাবে খোরাক ও পোশাক প্রদান করিবে।

স্মরণ রাখা দরকার যে, প্রচলিত নিয়মানুষারে ভদ্রোচিতভাবে জীবন যাপনের জন্য যাহা প্রয়োজনীয়, স্ত্রীর এই অত্যাবশ্যক চাহিদা অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে।[১]"

স্ত্রীর বিপদে সহানুভূতি প্রদর্শণঃ

স্ত্রীর বিপদে-আপদে, রোগ-শোকে তার প্রতি অকৃত্তিম সহানুভূতি প্রদর্শণ করা স্বামীর কর্তব্য। স্ত্রী রোগাক্রান্ত হলে তার চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থা করা স্বামীরই দায়িত্ব। বস্তুত স্ত্রী সবচেয়ে বেশী দুঃখ পায় তখন, যখন তার বিপদে শোকে তার স্বামীকে সহানুভূতিপূর্ণ ও দুঃখ ভারাক্রান্ত দেখতে পায় না অথবা স্ত্রীর যখন কোন বিপদ হয়, শোক হয় কিংবা রোগ হয়, তখন স্বামীর মন যদি তার জন্যে দ্রবীভূত না হয়, বরং তখন স্বামীর মন মৌমাছির মত অন্য ফুলের সন্ধানে উড়ে বেড়ায়, তখন বাস্তবিকই স্ত্রীর দুঃখ ও মনোকষ্টের কোন অবধি থাকে না। এজন্যে নবী করীম (সাঃ) স্ত্রীর প্রতি দয়াবান ও সহানুভূতিপূর্ণ হবার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এর সাধারণ নিয়ম হিসেবে বলেছেনঃ

مَنْ لاَيَرْحَمْ لاَيُوْحَمْ — (رياض الصالحين)

যে লোক নিজে অপরের জন্যে দয়াপূর্ণ হয় না, সে কখনো অপরের দয়া-সহানুভূতি লাভ করতে পারে না।

---

[১]. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহঃ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্, ২য় খন্ড, মাফতাবা-ই-থানবী, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া। পৃ.৩৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের ক্ষেত্রে এ কথা অতীব বাস্তব। এজন্যে স্ত্রীদের মনের আবেগ উচ্ছ্বাসের প্রতি লক্ষ্যে রাখা স্বামীর একান্তই কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে হযরত উমর ফারুকের একটি ফরমান স্মরণীয়। তিনি এক বিরহি নারীর আবেগ উচ্ছ্বাস দেখতে পেয়ে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। তখন তিনি তাঁর কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেনঃ

মেয়েলোক স্বামী ছাড়া বেশীর ভাগ কদিন পর্যন্ত ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারে? হযরত হাফসা বললেনঃ চার মাস। তখন হযরত উমর বললেনঃ সৈণ্যদের মধ্যে কাউকে আমি চার মাসের অধিক বাইরে আটকে রাখব না।[১]

তিনি খলীফাতুল মুসলিমীন হিসেবে সব সেনাধ্যক্ষকে লিখে পাঠালেনঃ

لَايَتَخَدَّفُ الْهِتَذَ وِّجُ عَنْ اَهْلِهِ اَكْثَرِ مِنْهَا —

এই (চার মাসের) অধিক কাল কোন বিবাহিত ব্যক্তিই তার স্ত্রী-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন না থাকে। এ ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে প্রমাণিত হল যে, স্ত্রীর মনের কামনা বাসনা ও আন্তরিক ভাবধারার প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখা স্বামীর অবশ্য কর্তব্য। আর স্ত্রীদের পক্ষে স্বামীহারা হয়ে বেশী দিন ধৈর্য ধরে থাকা সম্ভব নয়-এ কথা তার কিছুতেই ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে ও এর সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছেঃ

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ - وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ

فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

যে সব লোক তাদের স্ত্রীদের সম্পর্কে কসম খেয়ে বসে যে, তাদের সাথে দেখা সাক্ষাত ইত্যাদি করবে না, তাদের জন্যে মাত্র চার মাসের মেয়াদ অপেক্ষা করা হবে। এর মধ্যে তারা যদি ফিরে আসে, তবে আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ষমা মার্জনাকারী ও অতিশয় দয়াবান। আর তারা যদি তালাক দেয়ারই সিদ্ধান্ত করে থাকে, তবে আল্লাহ্ সব শোনেন ও সব জানেন।[২]

এর আয়াতে 'ঈলা' সম্পর্কে ও ফয়সালা দেয়া হয়েছে। ঈলা শব্দের অর্থ হচ্ছে-'কসম করে কোন কাজ না করা'-কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকা' আর ইসলামী শরীয়াতের ভাষায়

---

১. رواه مالك عن عبد الله بن دينار (محاسن التاو يل ج ٣ص ٥٨٠).

২. আল্-কুরআন, ২:২২৬-২২৭।

Dhaka University Institutional Repository

এর অর্থ হচ্ছেঃ কসম করে স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম না করা-স্ত্রী সাথে যৌন সঙ্গম করা থেকে বিরত থাকা।

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছেঃ যারা স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম না করার কিরা করবে তাদের জন্যে চার মাসের অবসর। এর চার মাস অতিবাহিত হবার পরে হয় সে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে তাকে ফিরিয়ে নেবে, আর না হয় তালাক দিয়ে তাকে চিরতরে বিদায় করে দেবে।

আল্লামা শাওকানী লিখেছেনঃ

وقل الله سبعا نه لهز هلمرةد فعا للضرا دعن الز وجة وقد كان اهل الجا هلية يؤ لون السنة

والسنتين واكثر من ذنك يقصدون بذ لك صرالا لنساء ـــ (فتح القد ير جاص ٢٥٨)

আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীর ক্ষতি হয় এমন কাজ বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই এই মেয়াদের সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। জাহিলিয়াত যুগে লোকেরা এক বছর, দুই বছর কি ততোদিক কালের জন্য 'ঈলা' করত আর তাদের উদ্দেশ্য হত স্ত্রীলোককে ক্ষতি গ্রস্ত করা। এসব ক্ষতি-লোকসানের পথ বন্ধ করার এবং স্ত্রীলোকদের প্রতি পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের কথাগুলো বলে দিয়েছেন।[১]

ইসলামে এ ভাবে নারীদের প্রতি বিপদে সহানুভূতি প্রদর্শণ করার তাগিদ বা বিধান করে তাদের উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করেছে।

স্বামী-স্ত্রী গোপন কথা প্রকাশ না করাঃ

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার হচ্ছে এই যে, সে স্ত্রীর গোপন কথা অপরের নিকট প্রকাশ করে দেবে না। নবী করীম (সাঃ) তীব্র ভাষায় নিষেধ করেছেন এ ধরণের কোন কথা প্রকাশ করতে। বলেছেনঃ

اِنَّ مِنْ اشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةَ الرَّجُلُ يُفْضِىْ اِلَى اِمْرَأ تِهِ وَتُفْضِىْ اَلَيهِ ثُمَّ يُنْشِرُ سِرَّهَا–

যে স্বামী নিজ স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় ও স্ত্রী মিলিত হয় তার স্বামীর সাথে, অতপর সে তার স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ করে দেয় প্রচার করে, সে স্বামী আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি।[২]

---

[১]. ফাতহুল কাদীর, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-২০৮।

[২]. ইমাম মুসলীম, মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, كتاب النكاح এর باب تحريم افشاءرالماة অধ্যায়ে হাদীস নং-২৫৯৭, পৃষ্ঠা-৩০৫,

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ্যাৎ স্বামী যাবতীয় গোপন বিষয়ে অবহিত হয়ে থাকে, তার সাথে যৌন মিলন সম্পন্ন করে, স্ত্রী নিজকে নিজের পূর্ণ সত্তা-দেহ ও মনকে স্বামীর নিকট উন্মুক্ত করে দেয়। এমতাবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীর যাবতীয় গোপন বিষয় অবহিত হয়ে তা অপর লোকের নিকট প্রকাশ করে দেয়, তবে তার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি আর কেউ হতে পারে না। আর আল্লাহ্র দৃষ্টিতেও এ ব্যক্তির মর্যাদা নিকৃষ্টতম হতে বাধ্য। কেননা এর মত হীন ও জঘন্য কাজ আর কিছুই হতে পারে না। ইমাম নববীর মতে এ কাজ হচ্ছে হারাম।

তিনি উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেনঃ "স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে যৌন সঙ্গম সম্পর্কিত গোপন বিষয় ও ঘটনা প্রকাশ করা এ হাদীসে সম্পূর্ণরূপে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

একদিন রাসূলে করীম (সাঃ) নামাজের পর উপস্থিত সকল সাহাবীকে বসে থাকতে বললেন এবং প্রথমে পুরুষদের লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন পুরুষ কেউ আছে নাকি, সে তার স্ত্রীর নিকট আসে, ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়, তার পর বের হয়ে এসে লোকদের সাথে কথা বলে ও বলে দেয়: আমি আমার স্ত্রীর সাথে এই করেছি, এই করেছি? .... হাদীস বর্ণনাকারী বলেছেন-এ প্রশ্ন শুনে সব সাহাবীই চুপ থাকলেন। তারপর মেয়েদের প্রতি লক্ষ্য করে তাদের নিকট প্রশ্ন করলেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে নাকি, যে স্বামী-স্ত্রীর মিলন রহস্যের কথা প্রকাশ করে ও অন্যদের বলে দেয়?

তখন এক যুবতী মেয়ে বলে উঠলঃ"আল্লাহ্র শপথ, এই পুরুষরাও যেমন সে কথা বলে দেয়, তেমনি এই মেয়েরাও তা প্রকাশ করে।"

তখন নবী করীম (সাঃ) বললেনঃ

তোমরা কি জানো, এরূপ যে করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, সে যেন একটি শয়তান, সে তার সঙ্গী শয়তানের সাথে রাজপথের মাঝখানে সাক্ষাত করল অমনি সেখানে ধরেই তার দ্বারা নিজের প্রয়োজন পূর্ণ" করে নিল। আর চারদিকে লোকজন তাদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকলো।(তিরমিযী)

এ পর্যায়ে দুটো হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাওকানী লিখেছেনঃ

الْحَدِيْثِانِ يَلُ لاَّنِ عَلَى تَحْرِيْمٍ اِفْشَاءِ احَدِ الزَّوْ جَيْنِ لَمَّا يَقِعُ بَيْنَهُمَا مِنْ اُمُوْرِا لْجِهَا عِ

এ দুটো হাদীসই প্রমাণ করছে যে, স্বামী স্ত্রীর সঙ্গম কার্য প্রসঙ্গে যতকিছু এবং যা কিছু ঘটে থাকে, তার কোন কিছু প্রকাশ করা অন্যদের কাছে বলে দেয়া সম্পূর্ণ হারাম।[২]

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-ভালবাসার আদান-প্রদান হয়, হয় পারস্পরিক মনের গোপন কথা বলাবলী, একজনতো অকৃত্তিম আস্থা ও বিশ্বাস নিয়েই অপর জনকে তা বলেছে। এখন যদি কেউ অপর কারো কথা কিংবা যৌন-মিলন সংক্রান্ত কোন রহস্য অন্য লোকের কাছে বলে দেয়, তাহলে একদিকে যেমন বিশ্বাস ভঙ্গ হল অপরদিকে লজ্জার কারণ ঘটল। এই কারণে ইসলামের এ কাজকে সম্পূর্ণ নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। বস্তুত একজন যদি তাদের স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসার কথা বাইরের কোন লোক-নারী বা পুরুষকে বলে দেয়, তাহলে শ্রোতার মনে সেই স্ত্রীর বা পুরুষের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আর যদি কেউ যৌন সঙ্গম কার্যের বিবরণ অন্য লোকের সামনে প্রকাশ করে, তাহলে তার গোপনীয়তা বিলুপ্ত হয়, গুপ্ত ব্যাপারাদি উম্মুক্ত ও দৃশ্যমান হয়ে উঠে। কোন নেকবখ্ত স্ত্রীর দ্বারাও যেমন এ কাজ হতে পারে না, তেমনি কোন আল্লাহ্ ভীরু ব্যক্তির দ্বারা ও একাজ সম্ভব নয়। বিশেষ ভাবে মেয়রাই এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়ে থাকে বলে কুরআনে তাদের গুণাবলীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ-

তারা অতিশয় বিনীতা, অনুগতা অদৃশ্য কাজের হেফাযতকারিণী আল্লাহ্র হেফাযতের সাহায্যে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ইসলাম নারীকে তার স্ত্রীরূপে যে সম্মান প্রাপ্য তা নিশ্চিত করেছে।

স্ত্রীর খোরপোশ সরবরাহের দায়িত্ব স্বামীরঃ

স্ত্রীর শোভনীয় মান অনুপাতে খোরপোশ নিয়মিত সরবরাহ করা স্বামীরই কর্তব্য, যে সে নির্লিপ্তভাবে স্বামীর ঘর-সংসার পরিচালনা ও সংরক্ষণ এবং সন্তান প্রসব ও লালন-পালনের কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا.

---

২. نيل الاوطارج ۶ ص ۳۵۱

Dhaka University Institutional Repository

যে লোককে অর্থ-সম্পদের স্বাচ্ছন্দ দান করা হয়েছে, তার কর্তব্য সেই হিসেবেই তার স্ত্রীর পরিজনের জন্যে ব্যয় করা। আর যার আয় উৎপাদন স্বল্প পরিসর ও পরিমিত, তার সেভাবেই আল্লাহ্‌র, দান থেকে খরচ করা কর্তব্য। আল্লাহ্‌ প্রত্যেকের উপর তার সামর্থ্য অনুসারেই দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন।[১]

এ আয়াতে ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানী লিখেছেনঃ

এ আয়াতে আদেশ করা হয়েছে, সচ্ছল অবস্থার লোকদেরকে যে, তারা দুগ্ধদায়িনী স্ত্রীদের জন্যে তাদের স্বাচ্ছন্দ্য অনুপাতে বহন করবে। আর যাদের রিযিক নিম্নতম প্রয়োজন মত কিংবা সংকীর্ণ, সচ্ছল নয়, তারা আল্লাহর দেয়া রিযিক অনুযায়ীই খরচ করবে। তার বেশী করার দোন দায়িত্ব তাদের নেই।[২]

স্বামীর অবস্থা অনুযায়ী স্ত্রীকে খোরপোশ দেয়ার কথা কুরআন থেকে প্রমাণিত।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী-উৎবা-কন্যা রাসূলে করীম (সাঃ) এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার স্বামী আবূ সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি, সে আমার ও আমার সন্তানদের প্রয়োজন পরিমাণ ভরণ-পোষণ দেয় না, তবে আমি তাকে না জানিয়ে প্রয়োজন মত গ্রহণ করে থাকি। এ কাজ জায়েয কিনা?

তখন নবী করীম (সাঃ) তাকে বললেনঃ সাধারণ প্রচলন অনুযায়ী তোমারও তোমার সন্তানাদির প্রয়োজন পরিমাণ ভরণ-পোষণ তুমি গ্রহণ করতে পার।(বুখারী, মুসলিম)

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, আবূ সূফিয়ান স্বচ্ছল অবস্থাসম্পন্ন ছিল, রাসূলে করীম (সাঃ) জানতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে কেবলমাত্র কৃপণতার কারণে নিজ স্ত্রী ও পুত্র কন্যার প্রয়োজন পরিমান ভরণ-পোষণ দিত না। সেই কারণে রাসূলে করীম (সাঃ) তার স্ত্রীকে প্রয়োজন পরিমাণ গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন।[৩]

ইমাম শাফিয়ীর মতে এই পরিমাপ শরীয়াত কর্তৃক নির্দিষ্ট বলে এ ব্যাপারে বিচার-বিবেচনার কোন অবকাশ নেই। আর এ ব্যাপারে স্বামীর অবস্থানুযায়ীই ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

---

[১]. আল্-কুরআন, ৬৫:৭।
[২]. ফাতহুল কাদীর, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৩৯।
[৩]. (تفسر الطحر ى ج ٩ص ٣٣١)

স্ত্রীর যদি খাদেম চাকরের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে স্বামীর সামর্থ্য থাকলে খাদেম চাকর যোগার করে দেয়া স্বামীর কর্তব্য। এ ব্যাপারে ফিকাহ্ বিদগণ সম্পূর্ণ একমত। ইমাম মুহাম্মদ বলেছেনঃ يجب على المعسر ايضا نفقة خادم —

একাধিক খাদেম-চাকরের খরচ বহন করা অসচ্ছল অবস্থার স্বামীর জন্যেও ওয়াজিব হবে।

একজন খাদেম-চাকরের প্রয়োজন হলে তাও সংগ্রহ করা ও খরচ বহন করা স্বামীর কর্তব্য কিনা-এ সম্পর্কে ফিকাহ্ বিদগণ একমত নন। ইমাম মালিকের মতে দুই বা তিনজন খাদেমের প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা করা স্বামীর কর্তব্য। আর ইমাম আবূ ইউসূফ বলেছেনঃ এমতাবস্থায় স্বামীর কর্তব্য হবে ঘরের ভিতরকার জরুরী কাজ-কর্ম করার জন্যে। আর অপরজন হবে ঘরের বাইরের জরুরী কাজ সম্পন্ন করার জন্যে।(تفسير المظهرى ج ٩ ص٣٣٢)

গরীব ও অসচ্ছল স্বামীদের সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতের পরই বলেছেন" سَيَجْعَلُ اللهُ تَعْلَ عُسْرٍ يُسْرًا

আল্লাহ্ অসচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের পক্ষে অবশ্যই সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য সৃষ্টি করে দেবেন।[১]

এ পর্যায়ে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটি ও পাঠ আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

সন্তানের পিতার কর্তব্য হচ্ছে প্রসূতির খাবার ও পরার প্রচলিত মানে ব্যবস্থা করা। কোন ব্যক্তির উপরই তার সামর্থ্যের অধিক বোঝা চাপান যেতে পারে না।[২]

এ আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম শাওকানী লিখেছেনঃ "সন্তান ও স্ত্রীর ব্যয়ভার, খোরাক ও পোশাক সংগ্রহ ও ব্যবস্থা করা সন্তানের পিতার পক্ষে ওয়াজিব। আর তা করতে হবে সাধারণ প্রচলন অনুযায়ী যা লোকেরা সাধারণত করে থাকে। এ ব্যাপারে কোন পিতাকেই

[১]. আল্-কুরআন, ৬৫:১৭।
[২]. আল্-কুরআন, ২:২৩৩।

তার শক্তি-সামর্থের বাইরে তার পক্ষে কঠিন ও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে এমন মান বা পরিমাণ তার উপর চাপানো যাবে না।[১]

উক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, সন্তান গর্ভে ধারণ, সন্তান প্রসব ও লালন-পালন করা স্ত্রীর কাজ; আর তার ও তার সন্তানের ভরণ-পোষণ ও যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব স্বামীর। এর ফলে স্ত্রীরা খোরপোশের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে গেল। এর প্রভাব তাদের মনে ও জীবনে সুদূরপ্রসারী হবে। রাসূলে করীম (সাঃ) স্বামীদের লক্ষ্য করে তাই ইরশাদ করেছেনঃ

ان تحسنوا اليهن فى كسو تهن وطعا مهن (ترمزى)

স্ত্রীদের খাবার ও পরার ব্যবস্থা করার ব্যপারে তোমরা অবশ্যই তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করবে।(তিরমিযী)

অর্থাৎ কেবল মাত্র মোটা ভাতও মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হলে চলবে না। এ ব্যাপারে তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বনের বদলে সহানুভূতিমূলক নীতি গ্রহণ করতে হবে।

আলোচনার সারকথা হচ্ছে এই যে, স্বামী-স্ত্রীতে অতি স্বাভাবিক ভাবেই কর্মবন্টন করে দেয়া হয়েছে। যে যৌন মিলনের সুখ ও মাধুর্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সমান ভাবে ভোগ করে, তার সুদুরপ্রসারী পরিণতি কেবল স্ত্রীকেই ভোগ করতে হয় প্রকৃতির এ অমোঘ নিয়ম অনুযায়ী। পুরুষকে তার কোন ঝুঁকিই গ্রহণ করতে হয় না। এ হচ্ছে এক স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। কাজেই স্ত্রী প্রাকৃতিক এই দাবি পূরণে সতত প্রস্তুত থাকবে, আর স্বামী তার যাবতীয় প্রয়োজন পুরণের জন্যে দায়ী হবে। মূল ব্যাপারে সমান অংশীদারিত্বের এটা অতি স্বাভাবিক দাবি।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর চলতি নিয়মে কেবল খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে দেয়াই দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে স্বামীর তওফিক অনুযায়ি আরও বেশি এবং অতিরিক্ত হাত খরচা ও স্ত্রীর হাতে তুলে দেয়া স্বামীর কর্তব্য, যেন স্ত্রী নিজ ইচ্ছা, বাসনা-কামনা ও রুচি অনুযায়ী প্রয়োজনে খরচ করতে পারে। এভাবে ইসলাম নারীর মৌলিক অধিকার খাদ্যের ব্যাপারে নিরাপত্তা বিধান করেছে।

---

[১]. ফাতহুল কাদীর, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২১৮।

Dhaka University Institutional Repository

নারী প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে ধৈর্য্য ধারণের নির্দেশঃ

এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম (সাঃ) এর একটি হাদীস উল্লেখ করা যাচ্ছে। এ হাদীসে তিনি স্ত্রী লোকদের প্রকৃতিগত এক মৌলিক দুর্বলতার প্রতি বিশেষ খেয়াল রেখে চলার জন্য স্বামীদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেনঃ

يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وِيَكْفُرْنَ الاْحْسَانَ لَوْ احْسَنْتَ اِلَى اِحْلُ اهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَاتْ مِنْكَ شَيْئًا

قَالَتْ مَارَاَيْتُ مِنْكَ خَيْلً قَطُّ-

মেয়ে লোক সাধারণত স্বামীদের অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে এবং তাদের অনুগ্রহকে করে অস্বীকার। তুমি যদি জীবন ভরেও কোন স্ত্রীর প্রতি অনুগ্রহ; প্রদর্শণ কর, আর কোন এক সময় যদি সে তার মর্জি-মেজাজের বিপরীত কোন ব্যবহার তোমার মাঝে দেখতে পায় তাহলে তখনি বলে উঠেঃ "আমি তোমার কাছে কোনদিনই সামান্য কল্যাণও দেখতে পাইনি।[১]

রাসূলের এ কথা থেকে একদিকে যেমন নারীদের এক মৌলিক প্রকৃতিগত দোষের কথা জানা গেল, তেমনি এ হাদীস স্বামীদের জন্যেও এক বিশেষ সাবধান বাণী। স্বামীরা যদি নারীদের এ প্রকৃতিগত দোষের কথা স্মরণ না করে, তাহলেই পারিবারিক জীবনে অতি তাড়াতাড়ি ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এজন্যে পুরুষদের অবিচল নিষ্ঠা ও অপরিসীম ধৈর্য ধারণের প্রয়োজন রয়েছে এবং এ ধরণের নাজুক পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করে পারিবারিক জীবনের মাধুর্য ও মিলমিশকে অক্ষুন্ন রাখা পুরুষদেরই কর্তব্য।

এ পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, রাসুলে করীম (সাঃ) এর সেই ফরমান, যা তিনি বিদায় হজ্জের বিরাট সমাবেশে মুসলিম জনতাকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছিলেন।

আবূ দাউদের বর্ণনা মতে সে ফরমানের ভাষা নিম্নরূপঃ

فاتقو الله فى النساء وانكم اخذ تموهن باماته الله واستحليم وروجهن بكلمة الله وان لكم

عليهن ان لايوطئن فرشكم احداقكرهوتة.

---

[১] . আল্-হাদীস, বুখারী, (বাব পাড়া প্রতিবেশী অধিকার)।

Dhaka University Institutional Repository

হে মুসলিম জনতা। স্ত্রীদের অধিকার সম্পর্কে তোমরা আল্লাহকে অবশ্যই ভয়-করতে থাকবে। মনে রেখো, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে পেয়েছে এবং আল্লাহর কালেমার সাহায্যে তাদের দেহ ভোগ করাকে নিজেদের জন্যে হালাল করে নিয়েছ। আর তাদের উপর তোমাদের জন্যে এ অধিকার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, সে কোন অবাঞ্চিত ব্যক্তির দ্বারা তোমাদের দুজনের মিলন-শয্যাকে মলিন ও দলিত কলংকিত করবে না।(আবু-দাউদ, মুসলিম)

এই শেষ বাক্যের অর্থ কেবল এতটুকু নয় যে, স্ত্রীরা ভিন্ন পুরুষকে স্বামীর শর্য্যায় গ্রহণ করবে না বরং-

لاتاذن لاحل ان يد خل منازل الاز واج من غيران ياز ن لها (بذل اكمحهودج ٣ص١٥٥)

স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্বামীর ঘরে অপর কাউকে প্রবেশ করতে পর্যন্ত দেবেনা।

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতিয়মান হয় যে পুরুষকে নারীর প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে তার মর্জি বুঝে আচরণ করতে হবে এবং বিবাহিতা নারীর আভ্রুরক্ষার নিমিত্ত্বে পরপুরুষকে এড়িয়ে চলতে হবে।

গুরুতর বিষয়ে স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণঃ

পারিবারিক এমনকি সামাজিক ও জাতীয় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের গুরুতর ব্যাপার সমূহ সম্পর্কে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করা এবং তার নিকট সব অবস্থার বিবরণ দান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার মতামত গ্রহণ তথা পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ের যাবতীয় বিষয়ে ঘরোয়া পরামর্শ অনেক সময়ই সার্বিক ভাবেই কল্যাণকর হয়ে থাকে। ঘরের মেয়ে লোকদের নিকটও যে অনেকট সময় ভাল ভাল বুদ্ধি পাওয়া যায়, পাওয়া যায় জটিল বিষয়াদির সুষ্ঠু সমাধানের শুভ পরামর্শ, তাও তার মাধ্যমে প্রতিভাত হয়ে পড়ে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মতের ভিত্তিতে গুরুতর কাজসমূহ সম্পন্ন করাও সম্ভব হয় অতি সহজে এবং অনায়াসে। কুরআন মজীদে এ কারণেই স্ত্রীর সাথে সর্ব ব্যাপারেই পরামর্শ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তার বড় প্রমাণ এই যে, সন্তানকে কতদিন দুধ পান করানো হবে তা স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শের ভিত্তিতে নির্ধারণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا-(البقرة ٢٣٣)

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী ও স্ত্রী যদি পরস্পর পরামর্শ ও সন্তোষের ভিত্তিতে শিশু সন্তানের দুধ ছাড়াতে ইচ্ছা করে, তবে তাতে কোন দোষ হবে না তাদের।[১]

আল্লামা আহ্‌মাদুল মুস্তফা আল্-মারাগী এ আয়াতের ভিত্তিতে লিখেছেনঃ

কুরআন মজীদ সন্তান পালনের মত অতি সাধারণ ব্যাপারেও পরামর্শ প্রয়োগরে উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং পিতা-মাতার একজনকে অপর জনের উপর জোর জবরদস্তি করার অনুমতি দেয়া হয় নি এ কথা যদি তোমরা চিন্তা ও লক্ষ্য কর, তাহলে গুরুতর বিপজ্জনক ও বিরাট কল্যাণময় কাজ কর্ম ব্যাপার সমূহে পারস্পরিক পরামর্শের গুরুত্ব সহজেই বুঝতে পারবে।

রাসূলে করীম (সাঃ) এর জীবনে এ পর্যায়ের বহু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম অহী লাভ করার পর তাঁর হৃদয়ে যে ভীতি ও আতংকের সৃষ্টি হয়েছিল, তা অপনোদনের জন্যে তিনি ঘরে গিয়ে স্বীয় প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা) এর নিকট সব অবস্থার বিবরণ দান করেন। বলেছিলেনঃ لقد حشيت على نفسى

আমি এই ব্যাপারে নিজের সম্পর্কে বড় ভীত হয়ে পড়েছি। এ কথা শুনে জীবনসঙ্গিনী হযরত খাজীদা (রাঃ) তাকে বলেছিলেনঃ আল্লাহ্ আপনাকে কখনই এবং কোনদিনই লজ্জিত করবেন না। কেননা আপনিতো ছেলায়ে (আত্মীয়তার সম্পর্ক)-র রেহ্‌মী রক্ষা করেন, অপরের বোঝা বহন করে থাকেন, কপর্দকহীন গরীবদের জন্যে আপনি উপার্জন করেন, মেহমানদারী রক্ষা করেন, লোকদের বিপদে আপদে তাদের সাহায্য করে থাকেন, এজন্যে আল্লাহ্ কখনই শয়তানদের আপনার উপরে জয়ী বা প্রভাবশালী করে দেবেন না। কোন অমূলক চিন্তা-ভাবনা ও আপনার উপর চাপিয়ে দেবেন না। আর এতে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ আপনাকে আপনার জাতির লোকজনের হেদায়াতের কার্যের জন্যেই বাছাই করে নিয়েছেন।[২]

হযরত খাদীজার এ সান্তনার বাণী রাসূলে করীম (সাঃ) এর মনের ভাব অনেক খানি লাঘব করে দেয়। আর এ ধরণের অবস্থায় প্রত্যেক স্বামীর জন্যে আর প্রিয়তমা ও সহানুভূতি

---

১. আল্-কুরআন, ২: ২৩৩

২. নবীদের জীবনী: নুরুল ইয়াকীন, পৃষ্ঠা-১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পন্ন স্ত্রীর আন্তরিক সান্ত্বনাপূর্ণ কথাবার্তা অনেক কল্যাণ সাধন করে থাকে। এভাবেই ইসলাম নারীদের পরামর্শগ্রহণ করার ব্যাপারে তাদের গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

স্ত্রী ঘরের রাণীঃ

পুরুষ ও নারীর জ্ঞান-বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা ও দৈহিক আঙ্গিকের স্বাভাবিক পার্থক্যের কারণে পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কর্মবন্টনের নীতি পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করা হয়েছে। পুরুষকে করা হয়েছে কামাই রোজগার ও শ্রম মেহনতের জন্যে দায়িত্বশীল আর স্ত্রীকে করা হয়েছে ঘরের রাণী। "পুরুষের জন্যে কর্মক্ষেত্র করা হয়েছে বাইরের জগত আর নারীর জন্যে ঘর। পুরুষ বাইরের জগতে নিজের কর্ম-ক্ষমতা প্রয়োগ করে যেমন করবে কামাই রোজগার, তেমনি গড়বে সমাজ রাষ্ট্র, শিল্প ও সভ্যতা। আর নারী ঘর থেকে একদিকে করবে ঘরের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা, অপরদিকে করবে গর্ভ ধারণ, সন্তান প্রসব, লালন-পালন ও ভবিষ্যতের উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলার কাজ।"[১]

এজন্যে নারীদের সম্পর্কে রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেনঃ

والمراة راعية على بيت زوجها-(بخارى)

এবং নারী-স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের পরিচালিকা, রক্ষণাবেক্ষণ কারিণী, কর্ত্রী।[২]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেনঃ راع হচ্ছে হেফাযতকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী, আমানতদার, দায়িত্বের অধীন সব জিনিসের কল্যাণ সাধনের জন্য একান্ত বাধ্য। যে ব্যক্তির দায়িত্বেই যে কোন জিনিস দেয়া হবে, এমন প্রত্যেকেরই তেমন প্রত্যেকটি জিনিসের সুবিচার ও ইনসাফ করা এবং তার দ্বীনী ও দুনিয়াবী কল্যাণ সাধন করাই বিশেষ লক্ষ্য। এখন যার উপর যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সে যদি তা পুরোপুরি পালন করে, তবে সে পূর্ণ অংশই লাভ করল, অধিকারী হল বিরাট পুরস্কার লাভের আর যদি তা না করে, তবে দায়িত্বের প্রত্যেকটি জিনিসই তার অধিকার দাবি করবে।[৩]

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের কথা নিম্নোক্ত হাদীসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

---

[১]. আব্দুর রহমী, মুহাম্মদ, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, খায়রুন প্রকাশনী-১৯৮৮, পৃষ্ঠা-১৯৫।
[২]. ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, খন্ড-১, .كتاب الجمعة, باب الجمعة فى القرى واعمرن হাদীস নং-৮৫৩, পৃ.৩০৪.
[৩]. ইমাম বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-১৯০।

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের জন্যে তোমাদের স্ত্রীদের উপর নিশ্চয়ই অধিকার রয়েছে, আর তোমাদের স্ত্রীদের জন্যে ও রয়েছে তোমাদের উপর অধিকার। তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার হচ্ছে এই যে, তারা তোমাদের শয্যায় এমন লোককে স্থান দেবেনা যাকে তোমরা পছন্দকর না। তোমাদের ঘরে এমন লোককেও প্রবেশ করার অনুমতি দেবে না, যাদের তোমরা পছন্দ কর না বলে নিষেধ কর। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার হচ্ছে, তোমরা তাদের ভরণ-পোষণ খুবই উত্তমভাবে বহন করবে।[১]

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যসম্পন্ন এ দাম্পত্য জীবন যে কতদূর গুরুত্বপূর্ণ এবং এ জীবনে স্ত্রীর যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা ব্যাখ্যা করে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী লিখেছেনঃ

দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক, সম্বন্ধ ও মিলনই হচ্ছে পারিবারিক জীবনের বৃহত্তম সম্পর্ক। এ সম্পর্কের ফায়দা সর্বাধিক, প্রয়োজন পূরণের দৃষ্টিতে তা অধিকতর স্বয়ং সম্পূর্ণ। কেননা আরব অনারবের সকল পর্যায়ের লোকদের মধ্যে স্থায়ী নিয়ম হচ্ছে এই যে, স্ত্রী সকল কল্যাণময় কাজে কর্মে স্বামীর সাহায্যকারী হবে, তার খানাপিণা প্রস্তুত করণ ও কাপড় চোপড় পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করে রাখার ব্যাপারে সে হবে স্বামীর ডান হাত, আর মাল-সম্পদের রক্ষণা-বেক্ষণ ও তার সন্তানদের লালন-পালন করবে এবং তার অনুপস্থিতিতে সে তার ঘরের স্থলাভিষিক্ত ও দায়িত্বশীলা।

ঘরের যাবতীয় ব্যাপারের জন্য প্রথমত ও প্রধানত স্ত্রী দায়ী। তারই কর্তৃত্বে যাবতীয় ব্যাপার সম্মন্ন হবে। এখানে তাকে দেয়া হয়েছে এক প্রকারের স্বাধীনতা। স্বামীর ঘর কার্যত তার নিজের ঘর, স্বামীর জিনিসপত্র ও ধন-সম্পদ স্ত্রীর হেফাযতে থাকবে। সে হবে তার আমানতদার, অতন্দ্র প্রহরী। কিন্তু স্বামীর ঘরের কাজকর্ম কি স্ত্রীকে তার নিজের হাতে সম্মন্ন করতে হবে? এ সম্পর্কে ইমাম ইবনে হাজমের একটি উক্তি দেখতে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেনঃ

لايلز مها ان تخل م زو جها فى شيء اصلا فى عجين ولاقى طبخ ولاكنس وغزل ولاغير ذلك–

---

[১]. ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, খন্ড-২, পৃ.৬৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

স্বামীর খেদমত করা, কোন প্রকারের কাজ করে দেয়া মূলত স্ত্রী কর্তব্য নয়, না রান্না-বান্নার আয়োজন করার ব্যাপারে; না রান্না বান্না করার ব্যাপারে; না সূতা কাটা; কাপড় বোনার ব্যাপারে; না কোন কাজে।[১]

ফিকাহ্বিদগণ এর কারণ স্বরূপ বলেছেনঃ"কেননা বিয়ের আক্‌দ হয়েছে স্ত্রীর সাথে যৌন ব্যবহারের সুখ ভোগ করার জন্যে। অতএব স্বামী তার কাছ থেকে অপর কোন ফায়দা লাভ করার অধিকারী হতে পারে না।

ইবনে হাজমের 'মূলত কর্তব্য নয়' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা কোন কাজ মূলত কর্তব্যভূক্ত না হলেও অনেক সময় তা না করে উপায় থাকে না। পবিত্র কুরআনের আয়াতঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

স্ত্রীদের সেই সব অধিকারই রয়েছে স্বামীদের উপর, যা স্বামীদের রয়েছে স্ত্রীদের উপর।[২]

এতে প্রমাণ করে যে, স্বামী যেমন স্ত্রীর জন্যে প্রাণপাত করে, স্ত্রীরও কর্তব্য স্বামীর জন্যে কষ্ট স্বীকার করা। ইমাম ইবনে তাইমিয়াও এ রূপে ফতোয়া দিয়েছেন। আবূ বকর ইবনে শায়বা ও আবূ ইসহাক জাওজেজানীর মত ও তাই।

এভাবে ইসলাম নারীকে স্ত্রী তথা সহধর্মিনী রূপে অনেক অধিকার ও ব্যাপক স্বাধীনতা দিয়েছে।

নিজের ও স্বামীর ধন-সম্পদে স্ত্রীর অধিকারঃ

436739

স্বামীর ঘরে স্ত্রীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থায় সুস্পষ্টরূপে স্বীকৃত। স্ত্রীর যেমন অধিকার আছে সীমার মধ্যে থেকে যাবতীয় দায়িত্ব পালন করার পরে যে কোন কাজ করে অর্থোপার্জন করার, তেমনি অধিকার রয়েছে সেই উপার্জিত অর্থের মালিক হওয়ার এবং নিজের ইচ্ছানুক্রমে তা ব্যয় ও ব্যবহার করার। স্বামীর ধন-সম্পদে ও তার ব্যয়-ব্যবহার ও দান প্রয়োগের অধিকার রয়েছে। সেই সঙ্গে সে মীরাস পেতে পারে পিতা, ভাইয়ের, পুত্র-কন্যার এবং স্বামীর।

[১]. ইমাম বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৯২।
[২]. আল্-কুরআনঃ ২:২২৮।

Dhaka University Institutional Repository

স্বামীর ধন-সম্পদে স্ত্রীর অধিকার এতদূর রয়েছে যে, তার ব্যয়-ব্যবহার করার ব্যাপারে সে তার স্বামীর মরজি বা অনুমতির মুখাপেক্ষী নয়। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছেঃ

স্ত্রীর যদি স্বামীর খাদ্যদ্রব্য থেকে শরীয়াত বিরোধী নয় এমন কাজে এবং খারাপ নয়-এমন ভাবে ব্যয় করে তবে তাতে তার সওয়াব হবে, কেননা সে ব্যয় করেছে; আর তার স্বামীর জন্যেও সওয়াব রয়েছে, কেননা সে তা উপার্জন করেছে। (رواه الجماعة)

হযরত আসমা বিন্‌তে আবূ বাশার (রাঃ) একদিন রাসূলে করীম (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন হে রাসূল, স্বামী জুবাইর আমাকে সংসার খরচ বাবদ যা কিছু দেন, তা ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। এখন তা থেকে যদি আমি দান সাদ্‌কার কাজে কিছু ব্যয় করি, তবে কি আমার গুনাহ্ হবে?

তখন নবী করীম (সাঃ) বললেনঃ

যা পারো দান-সাদ্‌কা করতে পারো; তবে নিজের তহবিলে নিয়ে জমা করে রেখোনা, তা হলে মনে রেখো, আল্লাহ্‌ও তোমার জন্যে শাস্তি জমা করে রাখবেন।[১]

ইমাম শাওকানীর মতে এ সম্পর্কিত যাবতীয় হাদিস থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয়ঃ স্বামীর ঘর থেকে তার অনুমতি ব্যতিরেকেই অর্থ সম্পদ ব্যয় করা স্ত্রীর পক্ষে সম্পূর্ণ জায়েয।

অপর এক হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে; মুজার কবীলার এক সম্মানিত মহিলা রাসূলে করীম (সাঃ) কে সম্বোধন করে বললেনঃ হে আল্লাহর নবী, আমরা হচ্ছি আমাদের পিতা, পুত্র ও স্বামীদের উপর এক বোঝা স্বরূপ। এমতাবস্থায় তাদের ধনমাল থেকে ব্যয় করার কোন অধিকার আমাদের আছে কি?

জবাবে রাসূলে করীম (সাঃ) বললেনঃ যাবতীয় তাজা খাদ্য তোমরা খাবে, আর অপরকে হাদিয়া-তোহফা দেবে।(আবূ দাউদ)

এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যেঃ

মেয়েদের জন্যে তাদের স্বামী, পিতা ও পুত্রের ধনমাল থেকে তাদের অনুমতি ছাড়াই পানাহার করা ও অপরকে হাদিয়া তোহফা দেয়া সম্পূর্ণ জায়েজ।[২]

---

[১]. ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, খন্ড-২, পৃ.৬৯৭।
[২]. শাওকানী, নাইলুল আউতার, বৈরুত, দারুল জীল, খ.৪, ১৯৭৩, পৃ.১২৬।

Dhaka University Institutional Repository

ঈদের ময়দানে উপস্থিত মেয়েরা নবী করীম (সাঃ) এর আহ্বানক্রমে নিজেদের অলংকারাদি যাকাত বাবদ কিংবা দ্বীনের জিহাদের জন্য দান করছিল। হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছেঃ

নবী করীম (সাঃ) মেয়েদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাদের নসীহত করলেন, তাদের লক্ষ্য করে ওয়াজ করলেন এবং সাদকা দিতে আদেশ করলেন। এ সময় বিলাল কাপড় পেতে ধরলেন এবং মেয়েরা আংটি, কানের বালা, ঝুমকা ইত্যাদি অলংকার সে কাপড়ের উপর ফেলতে লাগল।[১]

এ হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, মেয়েরা তাদের নিজেদের ধন সম্পদ থেকে স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকেই দান সাদকা করতে পারে-করা জায়েয এবং দান মোট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের মধ্য থেকে হওয়ার কোন শর্ত নেই।

উপরোক্ত যুক্তি প্রমাণ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে ইসলাম নারীদেরকে তার পিতা, পুত্র ও স্বামীর ধন-সম্পদ ব্যয় এর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

[১]. ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, খন্ড-২, পৃ.৭৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে বিবাহ

ইসলামে নারীর বিবাহের অধিকারঃ

দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ ও বিধি নিষেধ দ্বারা যৌন উম্মাদনা ও উচ্ছৃঙ্খলতার সকল পথ রুদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু যৌন চাহিদা চরিতার্থ করার জন্য একটি পথ অবশ্যই খোলা রাখা আবশ্যক। ইহাই ইসলামের বিবাহ প্রথা।[১]

বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলী মূলতঃ একে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়ে থাকে। মানব বংশের স্থায়িত্ব ও সভ্যতা এর উপরই নির্ভরশীল। বিবাহ প্রথা চালু করে বলা হয়েছে, যৌন চাহিদা পূরণ কর; কিন্তু বিচ্ছিন্ন ও অনিয়মতান্ত্রিক সম্পর্কের দ্বারা নহে। লুকোচুরি করেও নহে, প্রকাশ্য অশ্লীলতার পথ ও নহে; বরং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রকাশ্য ঘোষণার দ্বারা, যেন তোমার সমাজে ইহা সকলের নিকট পরিজ্ঞাত ও প্রকাশিত হয়ে পড়ে, অমুক পুরুষ ও অমুক নারী পরস্পর এক হয়ে গিয়েছে। বিবাহকে বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন-বিবাহ হচ্ছে দুই বিপরীত ধর্মী লিঙ্গের/সেক্সের মধ্যে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি লাভের মাধ্যমে অবাধে যৌন মিলনের অনুমোদন, পরবর্তীতে সন্তান লাভের মাধ্যমে যার পরিণতি ঘটে।

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী বিবাহ হচ্ছে একটি দেওয়ানী চুক্তি। মুসলিম পারিবারিক আইনানুযায়ী পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ ২১ বছরের ছেলে ও ১৮ বছরের মেয়ে উভয়ের সম্মতিপূর্বক চুক্তির মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনে আবদ্ধ হওয়াকে বিবাহ বলে।[২]

নারী চায় পুরুষকে আর পুরুষ চায় নারীকে। প্রকৃতিরই এ ধর্ম। এ ধর্ম দোষের নয়। সৃষ্ট জীব মাত্রই এ ধর্মের প্রয়াসী। এ ধর্ম আল্লাহ্‌র অপরূপ সৃষ্টি কৌশলের এক পরম ধর্ম। তাই এই সুন্দর ও কামনার ধর্মকে পালন করার নির্দেশ যুগেযুগেই মনীষীরা দিয়েগেছেন।

অধুনা পাশ্চাত্য বলগাহীন যৌন আচরণ দ্বারা পূতঃপবিত্র বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়েছে। একে আদিম কালের বর্বর প্রথা এবং নারীর কারাগার ও দাসত্ব বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে এক নারী বহু পুরুষকে প্রেম নিবেদন

---

[১]. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, কিতাব আল-নিকাহ্, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৬২১।
[২]. মানবাধিকার সচেতন সহায়িকা-আঃ মতিন মুহাম্মদ-প্রকাশক-সি. আরডি, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২১।

Dhaka University Institutional Repository

করে। তাদের নিকট যা পাওয়ায় ছিল সব নিঃশেষ করে তাদের পরিত্যাগ করে। অতঃপর খুব আনন্দচিত্তে তাদেরকে পরিত্যাগের কাহিনী বর্ণনা করে, যাতে অপরাপর নারীরাও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারে। অন্য এক নারী তার মনের বাসনা ব্যক্ত করে বলেঃ

A lover who comes to your bed of his own accord is more likely to sleep with his arms around you all night than a lover who has now here else to sleep.[১]

যে প্রেমিক স্বেচ্ছায় তোমার বিছানায় আগমন করে, সে যে তোমাকে বুকে লয়ে সারারাত যাপন করবে, এর সম্ভাবনাই সে প্রেমিক হতে অধিক যার রাত্রি যাপনের জন্য অন্য কোন স্থান নাই।

এ সমস্ত বিকারগ্রস্ত ও উদভ্রান্ত পথভ্রষ্টদিগকে ইসলাম বিবাহ প্রথার মাধ্যমে নারীকে দিয়েছে তার সঠিক মর্যাদা।

মানুষকে যৌনবাসনা প্রদান করা হয়েছে। যৌবনে ইহা অতি প্রবল হয়ে উঠে। নিছক ভোগ-বিলাস ও সুখ-সম্ভোগের জন্য তাকে এই অদৃশ্য বাসনা প্রদান করা হয় নাই; বরং এর উদ্দেশ্য হল, সে নিজের মনে করেই যৌন মিলনকার্য সম্পাদন করুক অথচ এর মাধ্যমে এক বিরাট সভ্যতা গড়ে উঠুক।

জীব জন্তু, কীট পতঙ্গ সকল প্রাণীকেই যৌন আকর্ষণ প্রদান করা হযেছে এবং দাম্পত্য বিধান অনুসারে বিশ্বের সৃষ্টিরাজি তৈরী হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

প্রত্যেক বস্তুকে আমি জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি।[২]

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নির্দেশিত পথ ও ব্যবস্থা যা অন্য ধর্ম ও অন্যান্য মহামনীষীদের চাইতে সুন্দর ও নিখুঁত। নরনারীর মন বিচার করে সৃষ্টির অপরূপ কৌশল বিশ্লেষণ করে, যুবক যুবতীর জন্য তিনি যে ব্যবস্থা দিয়ে গেলেন তা সমাজ, ধর্ম, জাতি জীবন ও যৌবনের জন্য মহা উপকারী ও পরম সুখকর ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা মহামিলনের

১. Germaine Greer, "The Female Eunuch" Mccraw hill-1971, (P-242).
২. আল্-কুরআন, ৫১ঃ ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

এক মহাসূত্র। এ ব্যবস্থা সম্পর্কে হযরত (সাঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছে সে তাহার ধর্মের অর্ধাংশ পূর্ণ করিয়াছে। অতএব সে সভয়ে আল্লাহর জন্য অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ করিবে।"[১]

মানুষ ছাড়া অন্য জন্তুর গর্বসঞ্চারের পরই প্রাণীযুগলের পরস্পরের সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না। এদের সন্তানাদির প্রতিও এদের আকর্ষণ অল্পদিন পরই বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষের ব্যাপার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পক্ষান্তরে অবৈধ মিলনের ফলে যে সন্তানের জন্ম হয় তা হয় জমজ সন্তান। এরা সমাজের কলঙ্ক। এরা সমাজে গ্রহণের অনুপযোগী, সমাজের অভিশাপ। আর সমাজকে এ অভিশাপ থেকে মুক্ত করতেই হযরত তাই কঠোর ভাষায় বললেনঃ

"বিবাহ করা আমার সুন্নত। যে তা পালন করে না সে আমার কেউ না।"[২]

বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্ভোগ ইসলাম অনুমোদন করে না। বিবাহের মাধ্যমে দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই বিবাহ হলো আল্লাহর নরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ আদেশ ও সুন্নাহ্।

চিরকুমার বা কুমারী থাকা ইসলামী প্রথা নয়। সখ-তামাশা এবং ফ্যাশন হিসেবে চিরকুমার-চিরকুমারী থাকা ইসলামে নিন্দনীয়।

ইসলামে বিবাহের নির্দেশঃ

পরিবার গঠনের জন্য বিবাহ একটি মৌলিক উপাদন। আরব দেশে ইসলাম প্রচারের শুরুতে বহু ধরণের বিবাহ প্রচলিত ছিল। এ গুলোর মধ্যে একটি ছাড়া অন্যান্য প্রকৃতির বিয়ে ইসলামে নিষিদ্ধ। যে ধরণের বিয়েটি ইসলামে অনুমোদিত তা' হলো-"সাবালিকা স্ত্রীর স্বাধীন সম্মতি নিয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন।[৩] মুসলিম সমাজে সর্বযুগে এরূপ বিয়েই অনুমোদিত।

বিয়ে এবং বিবাহিত জীবন যাপনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। দুনিয়ার কোন কাজই সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোন উদ্দেশ্য ছাড়া সম্পাদিত হয় নি। কুরআন্ মজীদে বিয়ের উদ্দেশ্যের কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। কুরআনের দৃষ্টিতে বিয়ের উদ্দেশ্য নানাবিধ। এর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বীয় নৈতিক চরিত্র, পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও কলুষমুক্ত রাখতে পারা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে মনের গভীর প্রশান্তি ও স্থিতি লাভ এবং তৃতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে পারিবারিক

[১]. আজহার উদ্দিন (অনুঃ); হাদিসের আলো, এম, এ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৬, ১৭।
[২]. আঃ রহমান খাঁ (অনুঃ); হাদীসের আলো, ২য় খন্ড. পৃষ্ঠা-২৮১।
[৩]. শামসুল আলম (অনুঃ); ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা, মূল-আবদেলরহীম উমরান, প্রকাশক, বাংলাদেশ প্রগ্রেসিভ এন্টার প্রাইজ-১৯৯৫, পৃষ্ঠা-২৬।

Dhaka University Institutional Repository

জীবন যাপন করে সন্তান জন্মদান, সন্তান লালন-পালন ও ভবিষ্যত সমাজের মানুষ গড়ে তোলা। নিম্নোক্ত কুরআন ভিত্তিক আলোচনা থেকে এসব উদ্দেশ্যের কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

সূরা আন-নিসা'র এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

এই মুহাররম মেয়েলোক ছাড়া অন্য সব মেয়েলোক বিয়ে করা তোমাদের জন্যে জায়েয-হালাল করে দেয়া হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, তোমরা তোমাদের ধন-মালের বিনিময়ে তাদের লাভ করতে চাইবে নিজেদের চরিত্র দুর্জয় দুর্গেরমত সুরক্ষিত রেখে এবং বন্ধনহীন অবাধ যৌনচর্চা করা থেকে বিরত থেকে।[১]

উক্ত আয়াত থেকে প্রথমত জানাগেল যে, নির্দিষ্ট কতকজন মেয়েলোক বিয়ে করা ও তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম। সেই হারাম বা মুহাররম মেয়েলোক কয়জন ছাড়া আর সব মেয়েলোককেই বিয়ে করা পুরুষের জন্যে হালাল। দ্বিতীয়ত এসব হালাল মেয়েলোক তোমরা গ্রহণ করবে "মোহরানা" স্বরূপ দেয়া অর্থের বিনিমেয় বিয়ে করে। তৃতীয়ত মোহরানা ভিত্তিক বিয়ে ছাড়া অন্য কোন ভাবে এই হালাল মেয়েদের সাথে ও যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারা যায় না এবং পঞ্চমত এভাবে বিয়ে করে নৈতিক চরিত্রের এ দূর্জয় দূর্গ পরিবার রচনা করা যায় এবং অবাদ যৌন চর্চার মত চরিত্রহীনতার কাজ থেকে নিজেকে বাঁচানো যায়। আর বিয়ের উদ্দেশ্য ও এই যে, তার সাহায্যে স্বামী-স্ত্রীর নৈতিক চরিত্রের দূর্গকে দুর্জয় করতে হবে এবং অবাধ যৌন চর্চা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে।

সূরা আন্-নিসায় অপর এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

তোমরা মেয়েদের অভিভাবক মুরুব্বীদের অনুমতিক্রমে তাদের বিয়ে কর, অবশ্য অবশ্যই তাদের দেন-মোহর দাও, যেন তারা তোমাদের বিয়ের দূর্গে সুরক্ষিতা হয়ে থাকতে পারে

[১]. আল্-কুরআন, ৪ঃ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

এবং অবাধ যৌন চর্চায় লিপ্ত হয়ে না পড়ে। আর গোপন বন্ধুত্বের যৌন উচ্ছৃঙ্খলতায় নিপতিত না হয়।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাগেব লিখেছেনঃ বিয়েকে দূর্গ বলা হয়েছে, কারণ তা স্বামী-স্ত্রীকে সকল প্রকার লজ্জাজনক কুশ্রী কাজ থেকে দূর্গবাসীদের মতই বাঁচিয়ে রাখে। ইসলাম এভাবেই বিয়ের মাধ্যমে নারীর সতীত্বকে সুরক্ষিত করেছে। তাই নবী করীম (সাঃ) বলেছেঃ হজ্জ না করা ও বিবাহ মূলতবী রাখায় অনুমতি ইসলাম দেয় না।[২]

সুতরাং বৈধ উপায়ে যৌন সুখ উপভোগ করার নিমিত্ত ইসলামে বিবাহের নির্দেশ রয়েছে।

ইসলামে বিবাহের উদ্দেশ্য ও গুরুত্বঃ

পরিবার গঠন এবং সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন ও বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য। পবিত্র কুরআনের এতদসম্পর্কিত আয়াত সমূহকে সামনে রেখে চিন্তা করলে পরিস্কার মনে হয়, কুরআনের দৃষ্টিতে বিয়ের উদ্দেশ্য নানাবিধ। এর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বীয় নৈতিক চরিত্র, পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও কলুষমুক্ত রাখতে পারা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে মনের গভীর প্রশান্তি ও স্থিতিলাভ এবং তৃতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে পারিবারিক জীবন যাপন করে সন্তান জন্মদান, সন্তান লালন-পালন ও ভবিষ্যত সমাজের মানুষ গড়ে তোলা।

নারী পুরুষ কেবলমাত্র বিয়ের মাধ্যমেই পরস্পর মিলিত হবে। তাহলেই উভয়ের চরিত্র ও সতীত্ব পূর্ণমাত্রায় রক্ষা পাবে। মোটকথা, নৈতিক চরিত্র সংরক্ষণ ও পবিত্রতা সতীত্বের হেফাযত হচ্ছে বিয়ের অন্যতম মহান উদ্দেশ্য।

নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ "যে লোক কিয়ামতের দিন পাক-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন চরিত্র নিয়ে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করবার বাসনা রাখে, তার কর্তব্য হচ্ছে (স্বাধীন মহিলা) বিয়ে করা।[৩]

অর্থাৎ বিয়ে হচ্ছে নারী পুরুষের চরিত্রকে পবিত্র রাখার একমাত্র উপায়। বিয়ে না করলে চরিত্র নষ্ট হওয়ার আশংকা প্রবল হয়ে থাকে। মানুষ আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করে পাপের পংকিল আবর্তে পড়ে যেতে পারে যে কোন দুর্বল মূহুর্তে। পরিবার গঠন ও সভ্যতার

---

[১] . আল্-কুরআন, ৪ঃ২৫।
[২] . ইমাম আবূ দাউদ, সুনান, প্রাগুক্ত, খন্ড-২, হা. নং-২১০৩, পৃ.৬০১
[৩] . ইমাম আবূ দাউদ, সুনান, প্রাগুক্ত, باب الحق على الزواج হা. নং-২২০১.

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তিস্থাপনও যে বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য পবিত্র কুরআনের আয়াত সমূহেও ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ

ইরশাদ হচ্ছেঃ (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ)

ক) তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র।[১]

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً

খ) হে আমাদের রব (প্রতিপালক) আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদিগকে আমাদের চক্ষু শীতল কারী বানাইয়া দাও এবং আমাদিগকে মুত্তাকিগনের নেতা বানাও।[২]

কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি বিবাহের উপযোগ ও উপকারিতা অস্বীকার করতে পারে না এবং মানব জীবনে এর গুরুত্ব এত অধিক যে, ইহা ব্যতীত সে সঠিক মানবিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না। যে পুরুষের স্ত্রী নাই এবং যে নারী স্বামীহীনা, প্রচুর সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাদিগকে মিসকীন বলে অভিহিত করা হয়েছে। বর্ণিত আছে নবী করীম (সাঃ) বলেনঃ

যার স্ত্রী নাই সে মিসকীন, সে মিসকীন, সে মিসকীন। জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! সে যদি বিরাট সম্পদশালী হলেও সে মিসকীন? তৎপর তিনি বলেন, যে নারীর স্বামী নাই, সে মিসকীন, সে মিসকীন, সে মিসকীন। জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূল। সে যদি সম্পদশালিনী হয়ে থাকে? তিনি বলেনঃ সম্পদশালিনী হয়ে থাকলেও স্বামী ছাড়া সে মিসকীন।[৩]

বিবাহের উপকারিতাঃ

উপরোক্ত পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীসের বাণী হতে বিবাহের যে উদ্দেশ্য ও উপকারিতা বুঝা যায়, তা প্রধানত এইঃ

১। নারী-পুরুষের জন্মগত যৌন বাসনা পূরণের পন্থাকে বিধিবদ্ধ করা এবং যৌন-উচ্ছৃঙ্খলা হতে তাদিগকে নিষ্কলুষ রাখা।

---

[১]. আল্-কুরআন, ২ঃ২২৩।
[২]. আল্-কুরআন, ২৫:৭৪।
[৩]. শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (রা)ঃ গুনিয়াতুত্তালেবীন।

Dhaka University Institutional Repository

২। নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাজিত স্বাভাবিক আকর্ষণ, প্রেমপ্রীতি, মমতা-ভালবাসা ও হৃদ্যতা চাহিদা বিশুদ্ধ পন্থায় পরিপূর্ণ করা এবং স্বভাবের এই চাহিদাকে বিকশিত ও পূর্ণতা দান করা।

৩। মানব বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তার।

৪। পরিবার গঠন তথা মানব সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করা। ড. ওয়েস্টার মার্ক বলেনঃ প্রতিটি নিয়মিত বিবাহে তিনটি অত্যাবশ্যক মূল বস্তু নিহিত রহিয়াছে-যৌন বাসনা নিবৃত্তি, তদুপরি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক এবং সন্তান উৎপাদন।[১]

বিবাহের ক্ষেত্রে ইসলামে নারীর আর্থিক সঙ্গতির দায় মুক্তিঃ

বিবাহের আবশ্যকতা ও ইহার প্রতি উৎসাহ প্রদানের কথা থাকলেও এতে কারো এমন ধারণা পোষণ করা সঙ্গত নহে যে, প্রতিটি মানুষের বিবাহ করা কর্তব্য। বরং এর জন্য প্রয়োজন আর্থিক সঙ্গতি থাকা ও অতীব জরুরী শর্ত। দৈহিক সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা অবশ্যই থাকতে হবে। বিবাহের যাবতীয় খরচ পাত্রপক্ষকেই বহন করতে হবে, পাত্রী পক্ষকে নহে। আজকাল যৌতুকের যে রীতি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, হিন্দু সমাজ হতে ইহা ধার করাঃ ইসলামে এর কোন ভিত্তি নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেনঃ

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

"যাহারা বিবাহের ব্যয়ভার বহনে অক্ষম, তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত সংযম অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[২]

হযরত আলী (রাঃ) কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং লালন-পালন করেন। তথাপি তাঁর প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতিমা (রা) এর সহিত তাঁর বিয়ের খরচ সংগ্রহ করতে তিনি তাঁকে আদেশ দেন। আলী (রা) তাঁর বর্ম বিক্রয় করে গৃহের আসবাব পত্র এবং কনের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার খরিদ করেন।[৩]

---

১. Dr. Westermark: The future of marriage in western Civilization.

২. আল্-কুরআন, ২৪ঃ৩৩।

৩. মীরখন্দ মুহাম্মদ শাহ্ হারীবী; রওযাতিস সাফা ফী-সীরাতিল আম্বিয়া, ২য় খন্ড, নওল কিশোর প্রেম লক্ষ্ণৌ, ইন্ডিয়া, পৃ.৭৪-৭৫

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেনঃ হে যুবকগণ! তোমাদের মধ্যে যারা সংসার এবং স্বীয় স্ত্রীর প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পার, তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও। কারণ, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তোমরা অন্য নারীর দিকে অশুভ দৃষ্টিতে তাকাবেনা এবং বিবাহ তোমাদেরকে বিবাহ্ বর্হিভূত যৌন সম্ভোগ থেকে রক্ষা করবে। যাদের পক্ষে সংসার ও স্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নয়, তাদের উচিৎ হবে রোযা রাখা। রোযা যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তির অন্যতম উপায়।[১]

ফিক্হশাস্ত্রে ইমামগণ (র) লোকের যৌন বাসনার তারতম্য ও তাদের আর্থিক সঙ্গতি বিচার করে বিবাহকে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও হারাম এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যে ব্যক্তির ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে,তার জন্য বিবাহ ফরয। কিন্তু তার যদি আর্থিক সঙ্গতি না থাকে, তবে রোযা রেখে যৌন বাসনা দমন করে রাখতে পারলে তাই করবে এবং বিবাহ হতে বিরত থাকবে। অন্যথায় সদুপায়ে বিবাহের জরুরী অর্থ তাকে সংগ্রহ করতে হবে। যদি কারো পক্ষে ব্যভিচার হতে নিজেকে রক্ষা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে এবং সে নিজের জন্য বিবাহ আবশ্যক বলে মনে করে, তবে বিবাহ তার জন্য ওয়াজিব।তবে শর্ত এই, সৎভাবে অর্জিত অর্থে বিবাহের যাবতীয় খরচ বহনের ক্ষমতা অবশ্যই তার থাকতে হবে। সহসা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা যার নাই, তার জন্য বিবাহ সুন্নাত। বিবাহের ব্যয় নির্বাহের জন্য যদি কারো অসদুপায় অবলম্বন ব্যতীত আর কোন উপায় না থাকে, তবে তার জন্য সর্বাবস্থায় বিবাহ হারাম।[২]

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইসলাম পুরুষকে তথা স্বামীকে অর্থ উপার্জন ও বিবাহ সম্পর্কিত সকল খরচাদির দায় ভার দিয়েছে। পক্ষান্তরে নারীকে তার সম্ভ্রমের নিশ্চয়তা প্রদান ও সংসারের আর্থিক দায়ভার থেকে মুক্ত রেখেছে। এভাবেই ইসলাম নারী জাতিকে তার সঠিক অবস্থানে আসীন করার নিমিত্ত্বে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

বিভিন্ন ধর্মে বিবাহ প্রথাঃ

এ বিশাল পৃথিবীর বক্ষে কতমানুষই না বাস করে। এসব মানুষের রং চেহারা যেমন এক নয়, কৃষ্টি, সভ্যতা, আচার-আচরণ, খাওয়া-দাওয়া ও সামাজিক পদ্ধতি ও তেমনি এক নয়। দেশে-দেশে, জাতিতে জাতিতে, ধর্মে-ধর্মে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। এ পার্থক্য সামাজিক

---

[১]. ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, দিল্লীঃ আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি. নিকাহ অধ্যায়, ১ম পরিচ্ছেদ, হা. নং-১

[২]. আব্দুল রহমান আল্-জাযীরী; "আল্ফিক্হ আলা মাযাহির আল-আরাবায়া", কায়রো, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৪-৮

Dhaka University Institutional Repository

রীতি-নীতি ও বিবাহ বন্ধনের মধ্যেও অতি নিগূঢ় ভাবে দেখা যায়। প্রাচীন ভারতে হিন্দুদের মধ্যে কয়েক প্রকার বিবাহ দেখা যেত। যেমন।

স্বয়ম্বর প্রথা, গান্ধর্ব প্রথা, পৈশাচ বিবাহ, রাক্ষস বিবাহ, আসুর বিবাহ, বিনিময় বিবাহ, পরীক্ষমূলক প্রথা, প্রেম নিবেদন প্রথা, ইত্যাদি।

রাক্ষস বিবাহঃ রাক্ষস যেমন তার ইচ্ছামত জীবজন্তু ও মানুষ ধরে খায় তেমনি পুরাকালে এক শ্রেণীর মানুষ মেয়ের বাবা, মা ও আত্মীয় স্বজনকে বিনাশ করে অথবা যুদ্ধে জয়লাভ করে মেয়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহ করত এবং নিজেদের লালসা মেটাত জোর পূর্বক এ বিবাহের প্রথাকেই রাক্ষস বিবাহ বলে।

পৈশাচ বিবাহঃ এ প্রথার নাম শুনলে যে কোন জাতির লোকেরই হাসি পায়। মেয়েকে তার নিদ্রিত অবস্থায় বা মদ্যপানে অজ্ঞান করে সঙ্গম করে সতীত্ব নষ্ট করা হতো। এরপর ঐ মেয়েকে বাপ মা সঙ্গমকারীর সঙ্গে বিবাহ দিতে বাধ্য হত।

আসুর বিবাহঃ এ প্রথায় শুধু টাকার বিনিময়ে পছন্দমতো মেয়েকে ক্রয় করা ও তাকে বিবাহ করে ভোগ করা। যদি কোন পুরুষের টাকা দিয়ে মেয়েকে কিনবার সামর্থ না থাকত তাহলে মেয়ের বাবার নিকট সে চাকুরী গ্রহণ করত এবং কিছুদিন চাকুরির পর ঐ টাকার বিনিময়ে মেয়েকে বিবাহ করত। এ প্রথাকে পণপ্রথা ও বলা হয়।[১]

বিনিময় বিবাহঃ আসুর বিবাহে যেমন অর্থের বিনিময়ে মেয়েকে ক্রয় করা হতো; এ প্রথায় মা, বোন বা কন্যায় বিনিময়ে স্ত্রী গ্রহণ করা হতো। অষ্ট্রেলিয়াতে এ প্রথার প্রচলন ছিল।

পরীক্ষামূলক প্রথাঃ ব্যালিয়ারিক দ্বীপের অধিবাসিগণ যখন কোন ছেলের সঙ্গে কোন মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব করে তখন মেয়েকে দেখা শুনার পর বরপক্ষের বন্ধুবান্ধব ও ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়েরা কন্যার সঙ্গে সহবাস করতে থাকে। সহবাসে যদি তারা খুশি হয় তবে সর্বশেষে বরকে সহবাস করতে সম্মতি দেয়া হয়। বর মেয়ের সহবাস ভঙ্গিতে যদি খুশি হয় তবে মেয়েকে বিবাহ করে।

মেনেগাম্বিয়াতে আবার যে ব্যবস্থা নেয়া হয়, তা হলো দলের যে সর্দার থাকে, সেই কেবল মেয়েকে ভোগ করে এবং তার পছন্দের ওপরই নির্ভর করে ছেলেমেয়েদের বিবাহ।

---

[১]. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম: বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ) দ্বিতীয় খন্ড, মম প্রকাশনী-জুন-২০০০ সাল, পৃষ্ঠা-৩১

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে আমরা নানা দেশে নানা ধর্মে নানা রকমের বিবাহ প্রথা দেখে আতঁকে উঠতে হয়। নারীকে কিভাবে পদদলিত ও ভোগ্য-পণ্য মনে করা হত।

পক্ষান্তরে ইসলামে যে বিবাহ প্রথা চালু আছে এবার তার দিকে নজর দেব। প্রাক ইসলামী যুগে কিছুটা সমস্যা থাকলে ও ইসলাম বিবাহের মাধ্যমে নারীকে দিয়েছে তার পূর্ণ মর্যাদা।

মুত'আ বিয়েঃ

মুতআ অর্থাৎ শর্তাধীনে সাময়িক বিবাহ-যাহা ইসলামে নিষিদ্ধ। মু'তআ বিয়ে হলোঃ কোন পুরুষ কোন নারীকে নির্দিষ্ট সময় যথা একমাস বা দু'মাসের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ বা টাকার বিনিময়ে (ভোগের জন্য) ভাড়া নেয়। ইসলামের পূর্বে Amminianus Marcellinus. XIV, 4 এর মতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ চতাব্দীতে "আরবদের মধ্যে সাময়িক বিবাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকটি পুরুষটির নিকট একটি বর্শা ও তাঁবু আসিত এবং মেয়াদ শেষে ইচ্ছা করলে তাহাকে ছেড়েচলে যেতে পারত বলে একে সঠিক ভাবে মুতআ বলা যায় কিনা সন্দেহ।[১]

মুত'আ যে আরবে একটা প্রাচীন প্রথা ছিল তা অনুমেয়। তবে ইবলামে যে ইহা নিষিদ্ধ তা প্রমাণীত।

হযরত আলী (রাঃ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেনঃ নবী করীম (সাঃ) মুত'আ বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়াছেন।[২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রথম প্রথম মুতআর একজন সমর্থক ছিলেন।[৩] কিন্তু পরে তিনি এই মত পরিত্যাগ করে মুতআ বিবাহ হারাম বলে স্বীকার করেন।[৪]

সকল সুন্নী ও কয়েকটি যায়দিয়্যা সম্প্রদায় মুতআকে হরাম বলে গণ্য করে।[৫]

---

১. আগামী; ১৬ শ খন্ড, ৬৩ পৃষ্ঠার ব্যাক্যাংশ (মাত্তিউনী বিহা আল-লায়লাতা) হতে জানা যায় জ্যাহিলিয়্যাত যুগে মতআ প্রচলিত ছিল। মুতআর অনুরুপ বিবাহ ইরিত্রিয়াতেও প্রচলিত ছিল। (Conti Rossini, Principi Di Diritto Conseue Tudinario. Rome-1916. P.P.189, 129.

২. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী; বুখারী সহীহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, বাব ৩২ নিকাহ আল-মুতআ।

৩. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী; বুখারী সহীহ, প্রাগুক্ত, নিকাহ বাব ৩১; মুসলিম, নিকাহ-১৮; তায়লিসী, নং-১৭৯২; রাযী, মাফাতীহুল গায়র, কায়রো, ১৩২৪, ৩১১৫।

৪. ইমাম তিরমিযী, তিরমিযী; নিকাহ, বাব-২৮।

৫. আল-না'তি কবি আল-হাক্ক; তাহরীর, বার্লিন পান্ডুলিপি; Closer-74, Fol-536.

Dhaka University Institutional Repository

মুফারের মতে দুই স্বামীর উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ সম্পাদিত হলে ইহা বৈধ বলে গণ্য হবে। কিন্তু সময় নির্ধারনের শর্ত অবৈধ ও বাতিল গণ্য হয়ে উহা স্থায়ী বিবাহে পরিণত হবে।[১]

অবশেষে আমরা উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝতে পারি ইসলাম বর্বরতাকে পশ্রয় দেয় না। বিবাহের মত এক একটি পবিত্র বন্ধনের দোহাই নারীকে ভোগের পণ্য হিসেবে গণ্য করার সুযোগ ইসলামে নেই, পক্ষান্তরে অন্য ধর্মগুলো যে খানে নারীর বিবাহকে মেনেই নেয় না বা নিলেও নারীর মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে নেয়া হয়। কিন্তু ইসলামী বিবাহের মাধ্যমে নারী পেয়েছে তার পূর্ণ মর্যাদা।

ইসলামে বিবাহের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ নারীঃ

ইসলামে বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্রী নির্বাচনে কিছু বিধি নিষেধ রয়েছে। কারণ অন্যান্য ধর্মের মত ইসলাম নারীকে অমর্যাদা করতে পারেনা। বিবাহের মাধ্যমে যৌনবাসনা পূরণেরপথ উম্মুক্ত রাখা হয়েছে বটে, কিন্ত সঙ্গত কারণেই কতিপয় নারীর সহিত বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً ○ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ○ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً

নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতাগণ যাহাদিগকে বিবাহ করিয়াছে তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করোনা। অবশ্য যাহা অতীতে (জাহিলী যুগে) সংগঠিত হয়েছে তা ধর্তব্য নয় । নিশ্চয়ই ইহা

[১] . সারাখসীঃ মবসূত, ৫:১৫৩; বুখারী হিয়াল, বাব ৪; সম্পাদনা বোর্ড, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃষ্টা-২৬৮-২৬৯, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, মে-১৯৮২, পৃষ্ঠা.২৬৮-২৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

অশ্লীল, অতিশয় ঘৃণ্যও নিকৃষ্ট আচরণ। তোমাদের জন্য নিষিদ্ধকরা হয়েছে। তোমাদের মাতা, কন্যা,আপন ভাগিনী,ফুফু(পিতার আপন বোন) ,খালা (মাতার আপন বোন), আপন ভাইয়ের কন্যা, আপন বোনের কন্যা, দুধ মাতা,দুধ ভাগিনী, শ্বাশুরী ,এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সঙ্গে সহবাস হয়েছেতাহার পূর্বে স্বামীর ঔরশে গর্ভজাত কন্যা,যারা তোমার অভিভাবকত্বে আছে, তবে যদি তাদের (কন্যাদের মাতার) সঙ্গে সহবাস না হইয়াথাকে তবে তাতে তোমাদের জন্য (বৈধভাবেসঙ্গত হওয়ায়) কোন দোষ নেই। আর তোমাদের জন্য তোমাদের ঔরশজাত পুত্রের স্ত্রীও দুইভগিনীকে একসঙ্গে বিবাহ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্ত যাহা পূর্বে (জাহিলী যুগে) হয়েছে, উহা ধর্তব্য নহে। নিশ্চয়ইআল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু,আর নারীরমধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী সকল সদবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। ইহা তোমাদের জন্য আল্লাহর, বিধান।[১]

যে যুগে হযরতের আবির্ভাব ঘটে সেযুগে এবং তার পূর্বে সারা পৃথিবীতে সমস্ত জাতির মধ্যেই ছিল কুপ্রথা অধর্ম ও অরুচিকর ব্যবস্থা। আরবে তখন এমন এক বিকৃত প্রথাছিল যে পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র তার পরিত্যক্তা সমস্ত স্ত্রীদের অধিকারী হতো এবং তাদের সংগে স্ত্রীবৎ আচার ব্যবহার করত। এমন অশ্লীলও কুপ্রথা রহিত করেই কোরআন উপর্যুক্ত বাণী ঘোষণা করে।

বস্তুত ইসলামের মতে যাদেরকে বিবাহ করা যায়না, তারা হলোঃ

১। মাতৃগণ অর্থাৎ মাতামহী প্রভৃতি যত উর্ধ্বতমা হউক।

২। কন্যাগণ অর্থাৎ কন্যা, কন্যার কন্যা, পুত্রের কন্যা প্রভৃতি যত নিম্ম দিকে হউক ।

৩ । ভগ্নীগণ অর্থাৎ সহোদরা বৈমাত্রেয় ও বৈ পৈত্রিক

৪। আপন ভাগ্নী-ভাতিজী ও যত নিচে হোক ।

৫। ফুফুগণ অর্থাৎ পিতার সহোদরা, বৈমাত্রেয় ও বৈ পৈত্রিক ভগ্নিগণ ।

৬। খালাগন অর্থাৎ মাতার সহোদরা, বৈমাত্রেয় ও বৈ পৈত্রিক ভগ্নিগন।

৭। স্ত্রীর মাতৃগণ, অর্থাৎ শাশুড়ি, দাদী শাশুড়ি প্রভৃতি উর্ধ্বতমাগণ ।

৮। যে স্ত্রীর সংগে সহবাস করেছে সেই স্ত্রীরপক্ষের সর্বপ্রকার কন্যা, দৌহিত্র ও পৌত্রী প্রভৃতি নিম্মদিকে।

৯। পুত্রবধু ,পৌত্রিবধু ও দৌহিত্রবধু প্রভৃতি নিম্মদিকে ।

---

[১] . আল্-কুরআন, ৪ঃ২২-২৪।

Dhaka University Institutional Repository

১০। দুগ্ধমাতা এবং তার মাতা, শাশুড়ি, ভগ্নি, ননদিনী, কন্যা, পৌত্রি ও দৌহিত্র প্রভৃতি উর্ধ্ব ও নিম্মদিকে এবং দুগ্ধ কন্যা ও দুগ্ধ পুত্রবধু প্রভৃতি।

১১। কোন বয়ঃপ্রাপ্তা রমনীর সঙ্গে ব্যভিচার করলে ওপরের স্ত্রী সম্বন্ধের নিয়ম অনুযায়ী তার মাতা, মাতামহী, পিতামহী প্রভূতি উর্ধ্বতমা এর কন্যা, পৌত্রি, দৌহিত্রী প্রভৃতি নিম্ন বর্তিনীগণ।

১২। যদি কেউ কোন যুবতী অর্থাৎ বয়ঃপ্রপ্তা রমণীকে আসক্তির সঙ্গে স্পর্শ করে কিংবা তার আবৃত অভ্যন্তরে কাম ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তবে বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় ঐ রমণীর মাতা, মাতামহী, পিতামহী এবং কন্যা, পৌত্রি ও দৌহিত্রী প্রভৃতি।

১৩। বিধর্মী, অংশীবাদিনী ও ধর্মত্যগিনী নারীগণ।

১৪। পরস্ত্রী; যে বৈধ ভাবে অন্য পুরুষের অধীন।[১]

১৫। মুশরিকের সহিত মুসলমান নারীর বিবাহ ও নিষিদ্ধ।[২]

১৬। ব্যভিচারে অভ্যস্ত নারীকে কোন মুসলমান বিবাহ করতে পারে না এবং কোন ব্যভিচারী পুরুষকে ও কোন মুসলমান নারী বিবাহ করতে পারে না।[৩]

১৭। একত্রে চার জনের অধিক বিবাহ করাও বৈধ নহে।

ইসলামের এ বিধিনিষেধ বিজ্ঞানসম্মত। কেন ওপরে বর্ণিত মেয়েদেরকে বিবাহ করা চলে না, এতে মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক দিক থেকে কি অবনতি আসতে পারে বৈজ্ঞানিক যুগে তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

একই মার্তৃগর্ভজাত ভাই ও বোনের মধ্যে সমজাতীয় গুণ অথবা দোষ থাকে। যদি গুণের আধিক্য থাকে তবে তাদের ঔরসজাত সন্তান গুণী হবে এতে সন্দেহ নেই; কিন্তু যদি দোষের আধিক্য বেশি থাকে তবে গর্ভজাত সন্তানের দোষ আরও Multiply হয়। এতে বংশ নিপাত হবার সম্ভাবনা।

এছাড়া দেখা যায় যে সহোদর ভাই-ভাগিনী দ্বারা যে সন্তানের জন্ম হয় তারা দুর্বল মস্তিস্ক, ক্ষীণ স্বাস্থ্য ও একই বর্ণ বিশিষ্ট হয়। ডাঃ ফেরেল বলেছেন, একই শ্রেণীর যৌন-মিলনে শতকরা ২৫টি সন্তান মার্তৃগর্ভেই মারা যায়।[৪] একই গ্রুপ এর রক্ত এর কারণ।

---

১. আলী হাসান (অনুঃ), কোরআনের তর্জমা, ৪র্থ পারা। পৃষ্ঠা-২৫৫-২৫৬
২. আল কুরআন, ২:২২১
৩. ঐ, ২৪:৩
৪. আবুল হাসানাত; যৌন বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা-৪৪৭

Dhaka University Institutional Repository

সিংহলে ওয়েড়া সম্প্রদায় আপন-ভাই বোনদের মধ্যে বিবাহ ধর্ম ও পূণ্যের কাজ বলে মনে করে। জানিনা তারা হয় তো বা আদমপুত্র হাবিল কাবিলের কথাই চিন্তা করে সহোদরা ভগ্নীদের বিবাহ করেছিলেন। বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাবংশে' দেখা যায় লাড় দেশের রাজা মীহবান্দ নিজ সহোদরা ভগ্নি মিহসী বিলিকে বিবাহ করেন।

ইসলাম ধর্ম প্রচার হবার পর থেকে মিশর ও পারস্য হতে এ প্রথার বিলোপ সাধন হয়। তবুও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে ছাড়া আজ ও বিবাহ হয় না। রাজা ওক্কারের চারপুত্র তাঁর চার কন্যাহকে বিবাহ করেছিল। তাঁরা কপিলাবস্তু নগরে বসবাস করত। এরূপ বিবাহ সমর্থন বা শক্য হয়েছিলো বলেই তাদের এ বংশকে শাক্য বংশ বলা হয়।[১]

নিজ ফুফু, খালা, সহোদরা ভগ্নি, এমনকি দুধ ভগ্নিকে যে বিবাহ করা নিষেধ তা নিম্ন প্রদত্ত হাদিসটি থেকে বোঝা যায়-

জাবির (রাঃ) বলেন-"রাসূলুল্লাহ (দঃ) নিষেধ করেছেন ইহা যে কোন স্ত্রীলোকের বিবাহ হয় তার ফুফু বা খালার উপরে।[২]

এভাবে ইসলাম বিবাহের ক্ষেত্রে কঠোর বিধি নিষেধের মাধ্যমে নারী জাতির মর্যাদা রক্ষা করেছে।

বিয়ের প্রস্তাবের ব্যাপারে নারীর স্বাধীনতাঃ

ইসলামের উপস্থাপিত পারিবারিক রীতিনীতি ও নিয়ম কানুনের দৃষ্টিতে বিয়ের প্রস্তাব বর কনে যে কারো পক্ষ থেকেই প্রস্তাব পেশ করতে কোন লজ্জা-শরম বা মান-অপমানের কোন কারণ হতে পারে না। এমনকি ছেলে কিংবা মেয়ের পক্ষ ও স্বীয় মনোনীত বর বা কনের নিকট সরাসরি ভাবে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারে, ইসলামী শরীয়াতে এ ব্যাপারে কোন বাধা তো নেই-ই, উপরন্তু হাদীসে এমন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, যা থেকে এ কাজ যে সঙ্গত তা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

নবী করীম (সাঃ) জুলাইবাব নামক এ সাহাবীর জন্যে এক আনসারী কন্যার বিয়ের প্রস্তাব কন্যার পিতার নিকট পেশ করেন। কন্যার পিতা তার স্ত্রী অর্থাৎ কন্যার মা'র মতামতের ভিত্তিতে এর জবাব দেবেন বলে ওয়াদা করেন। লোকটি তার স্ত্রীর নিকট এ সম্পর্কে

---

১ . প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪৬

২ . আলহাজ আব্দুল রহমান খাঁ (অনুঃ), তজরীদুল বুখারী, হাঃ ১৫/৬৫৩। পৃষ্ঠা-২৯১

Dhaka University Institutional Repository

জিজ্ঞেস করলে সে এ বিয়েতে স্পষ্ট অমত জানিয়ে দেয়। কন্যাটি আড়াল থেকে পিতামাতার কথোপকথন শুনতে পায়। তার পিতা যখন রাসূলের নিকট এ বিয়েতে মত নেই বলে জানাতে রওয়ানা হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন মেয়েটি পিতামাতাকে লক্ষ্য করে বললঃ

ابريل ون ان ترد واعلى رسو ل الله امده ـــ ان كان دضيه لكم فانكحوه ـــ (مسند احمل

مع بلو غ الامانى ج ١۴ ص١۴٧)

তোমরা কি রাসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করতে চাও? তিনি যদি বরকে তোমাদের জন্য পছন্দ করে থাকেন তবে তোমরা এ বিয়ে সম্পন্ন কর।[১]

এ ঘটনা থেকে জানা গেল যে, মেয়ে নিজে তার বিয়ের প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মত ছিল এবং পিতামাতার নিকট তার মতামত যা গোপন ও অজ্ঞাত ছিল, যথাসময়ে সে তা জানিয়ে দিতে এবং নিজের পিতামাতর সামনে প্রস্তাবকে গ্রহণ করার জন্যে স্পষ্ট ভাষায় অনুমতি দিতে কোন দ্বিধাবোধ করেনি। আর এতে বস্তুত কোন লজ্জা শরমের অবকাশ নেই।

হযরত উমরের কন্যা হাফসা (রাঃ) বিধবা হলে পরে তার পূনর্বিবাহের জন্য তিনি [হযরত উমর (রাঃ)] প্রথমে উসমানের সাথে সাক্ষাত করেন এবং হাফসাকে বিয়ে করার জনন্যে তাঁর নিকট সরাসরি প্রস্তাব পেশ করেন। তখন হযরত উসমান (রাঃ) বললেনঃ এ সম্পর্কে আমার মতামত শীগঘীরই জানিয়ে দেব। কয়েকদিনপর তিনি বললেনঃ আমি বর্তমানে বিয়ে করা সম্পর্কে চিন্তা করছি না। অতপর হযরত উমর (রাঃ) হযরত আবূ বকরের নিকট এই প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে মতামত জানানো থেকে বিরত থাকলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত নবী করীম (সাঃ) নিজেই নিজের জন্যে বিয়ের প্রস্তাব হযরত উমরের নিকট প্রেরণ করেন।[২]

এ ঘটনা থেকে জানা গেল, মেয়ে পক্ষও প্রথমেই বিয়ের প্রস্তাব পেশ করতে পারে-এতে কোন দোষ নেই। আর ছেলেপক্ষ ও কিংবা ছেলে নিজেও বিয়ের প্রস্তাব প্রথমত কন্যা পক্ষের নিকট পেশ করতে পারে। শরীয়াতে একে কোন আপত্তি নেই কিংবা কারো পক্ষেই কোন লজ্জা-শরমেরও কারণ নেই।

১. আহম্মদ ইবন হাম্বল; মুসনাদে আহ্মদ, প্রাগুক্ত, ১৬ খন্ড, ১৪৮ পৃঃ
২. মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ-৭৬৮, ইমাম আহমদ, মুসনাদ, প্রাগুক্ত ১৬ খন্ড, পৃ. ১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

হযরত সহল ইবনে সায়াদ সায়েদী বলেনঃ একটি মেয়েলোক রাসূলের নিকট এসে বললঃ

جاءت امداة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله جئت اهب لك نفسى.

আমি আপনারে খেদমতে এসেছি এজন্যে যে, আমি নিজেকে আপনার নিকট সোপর্দ করব।

তখন নবী করীম (সাঃ) তার প্রতি উদার দৃষ্টিতে তাকালেন, পা থেকে মাথার দিকে দেখলেন। অনেক সময় ধরে তিনি নির্বাক হয়ে থাকলেন-কোন জবাব দিলেন না। তখন উপস্থিত একজন সাহাবী বুঝাতে পারলেন যে, নবী করীম (সাঃ) স্ত্রী লোকটিকে বিয়ে করতে রাযী নহেন। তাই তিনি দাঁড়িয়ে বললেনঃ হে রাসূল! এ মেয়েলোকটিতে আপনার যদি কোন প্রয়োজন না থাকে তবে আমাকে অনুমতি দিন তাকে বিয়ে করার।[১]

এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোন মেয়ে যদি বিশেষ কোন পুরুষের প্রতি মনের আকর্ষণ বোধ করে তবে সে নিজেই ছেলের নিকট বিয়ের প্রস্তাব পেশ করতে পারে। এতে না আছে কোন দোষ, না লজ্জা-শরমের অবকাশ। ইসলাম এ ভাবে নারীকে বিয়ের প্রস্তাবের ব্যাপারে বিশেষ মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে।

বিয়ের এক প্রস্তাবের উপর নতুন প্রস্তাব নিষিদ্ধঃ

কোন পাত্রীর জন্য এক ব্যক্তি প্রস্তাব দিয়েছে। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত ঐ পাত্রীর জন্য অন্য প্রস্তাব দেয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। কেননা এতে করে সমাজে অবাঞ্ছনীয় প্রতিযোগীতার মনোভাব এবং পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতার ভাব সহজেই জেগে উঠতে পারে। আর তা সমাজে শান্তি শৃঙ্খলার দৃষ্টিতে খুবই মারাত্মক। এমনকি এতে করে ছেলে বা মেয়ের এমন ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে, যারফলে তার বিয়েই চিরদিনেই জন্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এ জন্যে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার ব্যাপারে বিশেষ সতকর্তা অবলম্বনের প্রয়োজন রয়েছে। রাসুলে করীম (রা) এ সম্পর্কে বলেছেনঃ

لايخطب احدكم على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله اوياذن له.

তোমাদের কেউ যেন অপন ভাইয়ের দেয়া বিয়ের প্রস্তাবের উপর নতুন প্রস্তাব পেশ না করে, যতক্ষণ না সে নিজেই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে কিংবা তাকে নতুন প্রস্তাব পেশ করার অনুমতি দেবে।[২]

[১]. ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.১৯৫৫
[২]. ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.১৯৭৫

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসটির উপরোদ্ধৃত ভাষা মুসলিম শরীফের। আর বুখারী শরীফে এ হাদীসের ভাষা নিম্নরূপঃ

لايخطب الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح اويترك.

কেউই তার ভাইয়ের দেয়া বিয়ের প্রস্তাবের উপর নতুন প্রস্তাব দেবে না-যতক্ষণ না সে বিয়ে করে ফেলে অথবা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে।[১]

এই নির্দেশের কারণ এই যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন মেয়ের পানি প্রার্থী হয় এবং সেই মেয়ের মনে ও তার প্রতি ঝোঁক ও আকর্ষণ স্বাভাবিক ভাবেই জাগ্রত হয় এবং এর ফলে এই উভয়ের ঘর সংসার গড়ে উঠার উপক্রম দেখা দেয়। এ সময় যদি সে মেয়ের জন্যে অপর কোন ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব পেশ করে, তাহলে প্রথম প্রস্তাবককে তার মনে বাসনায় ব্যর্থ ব্যর্থ মনোরথ করে দেয়া হয়, তার বাঞ্ছিত থেকে তাকে করে দেয়া হয় বঞ্চিত। আর এতে করে তার প্রতি বড়ই অবিচার ও জুলুম করা হয়, তার জীবনকে করে দেয়া হয় সংকীর্ণ। আর তাইতো ইসলামে প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব নিষিদ্ধ।[২]

নিজ বিবাহের উদ্দেশ্যে অপরের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানো নিষিদ্ধঃ

কোন পুরুষের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে তার স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

لاتسال المراة طلاق اختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فانلها ماقدرلها —

নারী অপর বোনের বর্তন খালি করে বিবাহ বসার জন্য তার তালাক চাইবে না। কারণ, সে তো তা-ই পাইবে যা তার জন্য অদৃষ্টে নির্ধারিত আছে।

অপর বোনের তালাক চাওয়ার অর্থ হলো তার উপর অত্যাচার চালানো এবং তার জীবিকা বিনষ্ট করা। আর একে অন্যের জীবিকা বিনষ্ট করাই হল দেশের ধ্বংসের বড় কারণ সমূহের অন্যতম। অথচ প্রতিটি ব্যক্তিই তার যোগ্যতা হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য যাহা সহজ করে দিয়েছেন, তদনুযায়ী স্বীয় জীবিকা অন্বেষণ করবে এবং অপরের জীবিকা নষ্ট করবে না, ইহাই আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দ করেন।[২]

---

১. প্রাগুক্ত

২. শাহ ওলী উল্লাহঃ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ২য় খন্ড, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া, পৃষ্ঠা-৩০৫-৩০৬ পৃঃ

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম শান্তির ধর্ম, সাম্যের ধর্ম। ইসলাম ব্যাতীত অন্য কোন ধর্মে নারীকে এভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। মেনে নেয়া হয়নি তার যৌক্তিক অধিকার সমূহ। বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে পশুর মত যৌন পিপাশা নির্ভত করে। কিন্তু ইসলাম ধর্মে বিয়ে করতে গিয়ে অন্য নারীর ঘর যেন না ভাঙ্গে, তার অধিকার যেন ক্ষুণ্ন না হয় সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে ইসলাম।

বিয়ের পূর্বে পাত্র-পাত্রী দেখাঃ

বিবাহ স্বামী-স্ত্রীর চিরজীবনের বন্ধন। সুতরাং বিবাহের পূর্বেই উভয়ে উভয়কে দেখে নেয়ার যৌক্তিকতা বুঝিয়ে বলারপ্রয়োজন পড়েনা। তারা পরস্পরকে দেখে শুনে বুঝে লইবে একে অপরের চীর জীবনের সঙ্গী, সহমর্মী ও সহযোগী হওয়ার যোগ্যতা তাদের মধ্যে আছেকি না। ইসলাম পাত্র প্রাত্রী দেখাকে কেবল বিধিসঙ্গতই করে নাই, বরং এ জন্য উৎসাহ প্রদান করেছে। তবে মনে রাখতে হবে, কেবল বিবাহ করার উদ্দেশ্য লয়ে পাত্রী দেখার অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। একের পর এক দেখে দেখে চোখের তৃপ্তিলাভের জন্য এ অনুমতি দেয়া হয় নাই ।

পাত্রী দেখে লইলে বিবাহের পর হতাশাও অনুশোচনা থাকেনা এবং পছন্দ সই পাত্রী নির্বাচন করা চলে ও তার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। আর এতে বিয়ের পূর্বেই পাত্র পাত্রীর অন্তরে স্নেহ- সম্প্রীতির উদ্রেক হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে-যা দামপত্য জীবনের জন্য অপরিহার্য। পসন্দসই কনে বিবাহের নির্দেশ পবিত্র কোরআনে ও দেয়া হয়েছে।[১]

فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء

তোমরা বিয়েকর সেই মেয়েলোক যাকে তোমার ভাল লাগে-যে তোমার পক্ষে ভাল হবে। এ এ ব্যপারে নবী করীম (স) ও বলেছেনঃ

اذا اخطب احدكم المرا ة فان استطاع انينظر الى مايدعوه الى نكا حها فليفعل.

“তোমাদের কেউ যখন কোন মেয়ে বিয়ে করার প্রস্তাব দেবে তখন তাকে নিজ চোখে দেখে তার গুণও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা করে নিতে অবশ্যই চেষ্টা করবে ,যেন তাকে ঠিক কোন আকর্ষণে বিয়ে করবে তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারে।[২]

---

১. আল-কুরআন; ৪:৩
২. আবু দাউদ, সুনান, প্রাগুক্ত, খন্ড-২, পৃ.৫৬৫

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত হাদীস থেকে সুস্পষ্ট জানা গেল যে, সভ্যতা-ভব্যতা ও শালীনতা সহকারে এবং শরীয়াতের সীমার মধ্যে থেকে কনেকে বিয়ের পূর্বেই দেখে নেয়া বাঞ্ছনীয়। তাতে করে তার ভাবী স্ত্রী সম্পর্কে মনের খুঁতেখুঁতে ভাব ও সন্দেহ দূর হয়ে যাবে, থাকবে না কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ। শুধু তা-ই নয়, এর ফলে ভাবী বধূর প্রতি আকর্ষণ জাগবে এবং স্ত্রীকে পেয়ে সে সুখী হতে পারবে।

এ ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ) আরও বলেছেনঃ তুমি যাকে বিবাহ করতে চাও, তার ঐ অঙ্গ তুমি দেখতে পার যে অঙ্গ তোমাকে বিবাহের প্রতি আরও বাসনা উদ্রেক করে।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন-"একবার আমি এক রমণীকে বিবাহ করার মানসে গোপনে দেখি। আমি এমন অবস্থায় দেখিলাম যাহাতে তাহাকে বিবাহ করার বাসনা আমার মধ্যে আরও বলবৎ হইয়া উঠিল।"[১]

অপর এক হাদীসে আছে হযরত মুগীরা ইব্‌ন শুরাহ্‌ (রা) তার নিজের বিয়ের প্রসঙ্গ রাসূলে করীমের সামনে পেশ করলে তখন রাসূলে করীম (সাঃ) আদেশ করলেনঃ

فاتظر الهافانه احرى ان لودم بينكم.

তাহলে কনেকে দেখে নাও। কেননা তাকে বিয়ের পূর্বে দেখে নিলে তা তোমাদের মাঝে স্থায়ী প্রেম-ভালবাসার সম্পর্ক সৃষ্টির অনুকূল হবে।[২]

এখনে বহু সংখ্যক রেওয়ায়েত হাদীসের কিতাব সমূহে উদ্ধিত পাওয়া যায় যা থেকে অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হয়ে যে, একজন পুরুষ যে মেয়েকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক, সে তাকে বিয়ের পূর্বেই দেখে নিতে পারে।

তাউস, জুহরী, হাসানুল বাসরী, আওজারী, ইমামা আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ মুহাম্মাদ, শফিয়ী, মালিক, আহম্মদ ইবনে হাম্বাল প্রমূখ মনীষী বলেছেনঃ

يباح النطر الى المر اة التي يو ي نطاحها.

পুরুষ যে মেয়েটিকে বিয়ে করতে চায়, সে তাকে দেখতে পারে।

---

[১]. মাওলানা মুহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌ (অনুঃ), গুনিয়াতুত্তালেবীন, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪।
[২]. ইমাম তিরমিযী, তিরমিযী, খন্ড-৩, পৃ.৩১৭

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি ইসলাম নারীকে পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা প্রদান করেছে।

বিয়ের মতামত জ্ঞাপণের অধিকারঃ (পাত্রীর সম্মতি)

নারীকে ইসলামই সর্বপ্রথম মানুষের মর্যাদা প্রদান করেছে। তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণ করেছে। সে সম্পতি অর্জন ও ইহা হস্তান্তরের অধিকার পেয়েছে। আইন আদালতে যে কোন চুক্তিপত্র সম্পাদনে তার কোন বাধা-প্রতি বন্ধকতা রইলনা। এমতাবস্থায় স্বীয় দেহ সমর্পণ অর্থাৎ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার যে তার অধিকার থাকবে, ইহা বলাই বাহুল্য। সুস্থ্য মস্তিস্কের বালেগা নারীকে তার পসন্দসই পাত্রের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা ইসলাম প্রদান করেছে। সুতরাং পুরুষের যেমন কনে বাছাই করবার অধিকার আছে, নারীর ও তদ্রুপ বর বাছাই করার অধিকার রয়েছে। তার অধিকার সম্মতি ব্যতিরেকে অভিভাবক তার বিবাহ দিতে পারে না; বরং নিজ পসন্দের পাত্রের সহিত বিবাহের অধিকার তার আছে। এতে হস্তক্ষেপের অধিকার কারও নাই।[১]

পুরুষ যেমন একজন সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী ও নিখুঁত মেয়ে পছন্দ করে, মেয়েরাও তেমনি সবল, সুস্থ্য, অমায়িক ও বুদ্ধিমান ছেলে পছন্দ করে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এজন্য তাদের পছন্দের ওপরেও গুরুত্ব দিয়েছে। নিম্নের উদ্ধৃতি এর প্রমাণ দেয়।

নবী করীম (সাঃ) বলেনঃ

لاتنكح الايم حتى تستأذن قالوايارسول الله وكيف ان لها؟

বিধবার বিবাহ তার সুস্পষ্ট নির্দেশ ব্যতীত হতে পারে না এবং কুমারীর বিবাহ তার অনুমতি ছাড়া হইতে পারে না। সাহাবাগন (রা) নিবেদন করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! তার অনুমতি কিরূপ জানা যাবে? তিনি বললেন-তার চুপ থাকাই তার অনুমতি।[২]

উক্ত হাদিসের উপর ভিত্তিকরে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেনঃ

اِنَّ الْوَلِىَ لَا يُجْبِرُ الثَّيِّبُ وَلَاالْبِكْرَ عَلَى النِّكَاحِ فَالثَّيِّبُ تُستَأ مَرُوَ الْبِكْرُ تُستَأْذَنُ.

---

[১]. আল্-কুরআন, ২ঃ২৩২,২৪০

[২]. আব্দুর রহমান খা (অনু) সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৬৬০, বিবাহ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা-২০।

Dhaka University Institutional Repository

অলি পূর্বে বিবাহিত ও অবিবাহিত ছেলেমেয়েকে কোন নির্দিষ্ট ছেলেমেয়েকে বিয়ে করতে বাধ্য করতে পারেনা। অতএব পূর্বে বিবাহিত ছেলেমেয়ের কাছ থেকে বিয়ের জন্যে রীতিমত আদেশ পেতে হবে এবং অবিবাহিত বালেগ ছেলেমেয়ের কাছ থেকে যথারীতি অনুমতি নিতে হবে।[১]

ইমাম আবূ হানিফা উপরোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে এতদূর বলেছেন যে, কোন পূর্ণ বয়স্ক ও সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্না মেয়ে অলীর অনুমতি ব্যতিরেকেই নিজ ইচ্ছায় কোথাও বিয়ে করে বসলে সে বিয়ে, অবশ্যই শুদ্ধহবে। যদিও ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদেরমতে অলীর অনুমতির অপেক্ষায় সে বিয়ে মওকুফ থাকবে।

উক্ত হাদীসের সমর্থনে মুসলিম শরীফে আরো অন্তত দুটো হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে তা হচ্ছেঃ

পূর্বে বিবাহিত ছেলেমেয়েদের নিকট তাদের বিয়ের ব্যাপারে তাদের মতামত অবশ্যই জানতে চাওয়া হবে এবং তাদের চুপ থাকাই তাদের অনুমতির নামান্তর।[২]

আর দ্বিতীয় হাদিসটি হচ্ছেঃ পূর্বে বিবাহিত ছেলে মেয়েরা তাদের নিজেদের বিয়েতে মত জানানোর ব্যাপারে তাদের অলী অপেক্ষা ও বেশী অধিকার রাখে । আর পূর্বে অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের নিকট তাদের পিতা বিয়ের মত জানতে চাইলে, তবে তাদের চুপ থাকাই তাদের অনুমতি জ্ঞাপক।[৩]

সুতরাং আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, পিতা তার বালেগা কন্যাকে তার অসম্মতিতে বিবাহ দিলে, এ বিবাহ বৈধ নহে। আনসার বংশীয় খিদামের বিধবা কন্যা খান্‌সা বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা তাঁকে এমন এক বিবাহ দিয়েছিলেন, যাকে তিনি সম্মত নহেন। তৎপর তিনি ইহা রাসুলুল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জানাইলে তিনি এ বিবাহ অবৈধ বলে ঘোষণা করেন।[৪]

অপর এক হাদিসে বর্ণিত আছেঃ

ان رجلا زوج بنته بكرا و لم يستأذها فاتت النبى صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما.

---

[১]. বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল কারী, শরহে সহীহুল বুখারী, মিশর, মাতবা'আতু মুসতাফা আল-বাবী, ১৯৯১, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১২৮

[২]. ইমাম মুসলিম; সহীহ, প্রাগুক্ত, বিবাহ অধ্যায়, باب استذان الشيب فى النكاح حالنطق والبكح با السكوت খ. ২, পৃ.১০৩৬
ইমাম আবূ দাউদ, সুনান, প্রাগুক্ত, باب فى الشيب খ.২, পৃ.২৩২.

[৩]. ইমাম ইবন মাযাহ, সুনান, প্রাগুক্ত, বিবাহ অধ্যায়, (باب استمار البكر والشيب) খ.১, পৃ.৬০১; মুসলিম, প্রাগুক্ত।

[৪]. বুখারী-কিতাবুন নিকাহ, বাব-৪২।

Dhaka University Institutional Repository

এক ব্যক্তি তার কুমারী কন্যাকে তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেন। তৎপর মেয়েটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি অয়াসাল্লামের নিকট এসে অভিযোগ করে। তিনি তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেন।[১]

হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেনঃ একটি পূর্বে অবিবাহিতা মেয়েকে তার পিতা এমন এক জনের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল, যাকে সে পছন্দ করে না। পরে রাসূলে করীম (সাঃ) সে মেয়েকে বিয়ে বহাল রাখা না রাখা সম্পর্কে পূর্ণ ইখতিয়ার দান করেন।

এসব হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বয়স্ক মেয়েদের বিয়েতে তাদের নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও পছন্দ-অপছন্দ হচ্ছে শেষ কথা। পিতা বা কোন অলীই কেবল তাদের নিজেদেরই ইচ্ছায় বিয়ে করতে কোন মেয়েকে বাধ্য করতে পারে না। এজন্যে রাসূলে করীম (সাঃ) স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেনঃ اِستَأ مَرْ وا النِّسَاءَ فِيْ اَبْضَا عِهِنَّ.

মেয়েদের বিয়েতে তাদের কাছ থেকে তোমরা আদেশ পেতে চেষ্টা কর।[২]

ইসলাম এমনই একটি ধর্ম যেখানে জীবনের সর্ব বিষয়ের দিক নির্দেশনা রয়েছে। আর "তাইতো ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবন বিধান" বলা হযেছে। ইসলাম ধর্মে ইয়াতীম মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারেও স্পষ্ট নির্দেশ আছে। হাদীসে এ সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ

تُستَأ مَرُا لْيَتِمَةُ فِىْ نَفْسِهَا فَاِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ اذِنَتْ وَاِنْ اَبَتْ لَمْ تَكْرِةْ

ইয়াতীম মেয়ের কাছ থেকে তার নিজের বিয়ের ব্যাপারে স্পষ্ট আদেশ পেতে হবে। জিজ্ঞেস করা হলে সে যদি চুপ থাকে, তবে সে অনুমতি দিয়েছে বলে বুঝতে হবে। আর সে যদি অস্বীকার করে, তবে তাকে জোর পূর্বক বাধ্য করা যাবে না।[৩]

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ لاتنكح اليتيمة الاباذ نها

ইয়াতীম মেয়েকে তার স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে বিয়ে দেয়া যেতে পারে না।(আবূ দাউদ)

এ হলো সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে ইসলামের মৌলিক বিধান ও দৃষ্টিকোন। নারী পুরুষের জীবনের বৃহত্তর ও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে বিয়ে। ইসলাম তাতে উভয়কে যে অধিকার ও

---

১. আবূ আবদির রহমান আহমদ বিন শু'আইব, সুনান, বৈরত, মাকতাবাতুন নাহদা, খ.৬, ১৯৮৬ ইং, পৃ.৮৪।
২. ইমাম আহম্মদ, মুসনাদে আহমেদ, ২য় খন্ড, বিবাহ অধ্যায়, باب فى الثيب পৃষ্ঠা-১৫৮।
৩. ইমাম আহমদ, মুসনাদে আহমদ, প্রাগুক্ত খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-১৫৮

Dhaka University Institutional Repository

আযাদী দিয়েছে, তা বিশ্বমানবতার প্রতি এক বিপুল অবদান, সন্দেহ নেই। কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমান অধঃপতিত ও বিপর্যস্ত মুসলিম সমাজে ছেলেমেয়েদের এ অধিকার ও আযাদী বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকর নয়। তবে বিয়ের ব্যাপারে ছেলেমেয়ের পিতা বা অলীর মতামতের গুরুত্ব ও অনস্বীকার্য।

অভিভাবকের অভিমতের গুরুত্বঃ

পতিবরণে নারীর অধিকার ইসলামে একটি সর্বজন স্বীকৃত সত্য এবং বিবাহ নারীর সম্মতি ব্যতীত হতে পারে না, এ বিষয়েও কাহারও দ্বিমত নাই। কিন্তু কেবল নারীর সম্মতিতেই বিবাহ সিদ্ধ কিনা, এই ব্যাপারে মহামান্য ইমামগণের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ রয়েছে।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, বালেগা সুস্থ্য মস্তিস্কের নারী নিজ সম্মতিতেই বিবাহ করতে পারে এবং বিবাহ তার অভিভাবকদের সম্মতি থাকুক বা না-ই থাকুক এবং নারী কুমারী, বিধবা বা তালাক প্রাপ্তাই হোক।[১]

হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) বলেন, নারীর সম্মতিক্রমে বিবাহ সম্পাদিত হতে পারে বটে, তবে অভিভাবকের সম্মতির উপর এর বৈধতা নির্ভর করবে। অপর পক্ষে হযরত ইমাম মালিক (রঃ) এবং হযরত ইমাম শাফিঈ (রঃ) এর মতে অভিভাবকের সম্মতি ব্যতীত কান ক্রমেই বিবাহ বৈধ নহে।[২]

এ প্রসঙ্গে হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেনঃ

বিবাহ ব্যাপারটা একমাত্র মেয়েদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া দুরস্ত নহে। কারণ, তাদের বুদ্ধি অপরিপক্ক এবং তাদের চিন্তাশক্তি দুর্বল। এ জন্য তারা সাধারণত ভাল-মন্দ বুঝতে পারে না এবং অধিকাংশ সময় নিজেদের বংশ ও মান সম্ভ্রমের প্রতি তাদের খেয়াল থাকে না। এ কারণে অনেক সময় অসম বংশের প্রতি তাদের আকর্ষণ হয়ে পড়ে। এতে অদের বংশের মান সম্মানের লাঘব হয়। সুতরাং বিবাহ অভিভাবকগণের অধিকার রাখা দরকার, যেন পড়ে গোলমাল ও বিবাদ-বিসংবাদের কোন সম্ভাবনা না থাকে। তাই অভিভাবকের মতামত ও মর্যাদা রক্ষার নীতি অবলম্বনেই বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।

---

১. ইমাম বুরহানুদ্দীন আল-ফারগানী আল-মারগেনানী, হিদায়া, ২য় খন্ড, ২য় অধ্যায়, পৃষ্ঠা-৩৩১

২. তানযীলুর রহমান, মাজমুআ'ই কাওয়ানীনে ইসলাম, ১ম খন্ড, করাচী-১৯৬৫, পৃ.৯৪-৯৫

Dhaka University Institutional Repository

বিয়েতে মোহর পাওয়ার অধিকারঃ

নারী আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি কৌশলের বিস্ময়কর নিদর্শণ এবং তাকে ছাড়া বিরাট সৃষ্টি কারখানা অচল হয়ে পড়ে। অপরদিকে নারী পুরুষের মিলনেই আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি কারখানা চালু থাকে। নারী তার দেহ ও মান-সম্ভ্রম পুরুষের নিকট অকাতরে সমর্পন করে। এই আত্মদান ও প্রেম-প্রীতির সম্যক আর্থিক বিনিময় ও প্রতিদান সম্ভব নয়। তবে নারীর মর্যাদার খাতিরে যথাসাধ্য এর প্রতিদান দেয়া পুরুষের অবশ্য কর্তব্য। সদাচার এবং সৌজন্য এটাই দাবি করে। স্ত্রীর জন্য স্বামীর এ দানকেই ইসলামের পরিভাষায় "মোহর" বলে। কোন পুরুষ যদি বিনিময়ে কিছুই দিতে না চাহে, তবে নারীর দেহ সম্পূর্ণ অশুদ্ধ হইবে না বটে কিন্তু ইসলামী আইন নারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ। ইসলামী আইন অবশ্যই স্বামীর যোগ্যতা ও স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদা অনুসারে তার পারতোষিক (মোহর) আদায় করে দিতে তৎপর।[১]

দেন মোহর বলতে এমন অর্থ সম্পদ বোঝায় যা বিয়ের বন্ধনে স্ত্রীর উপর স্বামীত্বের অধিকার লাভের বিনিময়ে স্বামীকে আদায় করতে হয়। হয় বিয়ের সময়ই তা ধার্য্য হবে, নয় বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার কারণে তা আদায় করা স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে।

বিয়ের ক্ষেত্রে মোহরানা দেয়া ফরয বা ওয়াজিব। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছেঃ

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের কাছ্ থেকে যে যৌন স্বাদ গ্রহণ কর, তার বিনিময়ে তাদের 'মহরানা' ফরয মনে করেই আদায় করো।[২]

তাফসীরের কিতাবে এ আয়াতের তরজমা করা হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায়ঃ

তোমরা পুরুষরা বিবাহিতা স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম কার্য সম্পাদন করে যে স্বাদ গ্রহণ করেছ, তার বিনিময়ে তাদের পাপ্য মহরানা পুরুপুরি তাদের নিকট আদায় করে দাও, আদায় করো এ হিসেবে যে, তা পূর্ণমাত্রায় দেয়া আল্লাহ্র তরফ থেকে তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে।

---

১. আল ফারগানি আল-মারগানানী, (বেদায়া ব্যাখ্যা গ্রন্থসহ) বৈরুত, খ.৪, দারুল ফিকর, ১৯৮০, পৃ.২২৪।
২. আল্-কুরআন, ৪ঃ ২৪

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন মাজীদে অপর আয়াতে বলা হয়েছেঃ

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

এবং মেয়েদের অলি-গার্জিয়ানের অনুমতি নিয়ে তাদের বিয়ে করো এবং তাদের 'মহরানা' প্রচলিত নিয়মে ও সকলের জানামতে তাদেরকেই আদায় করে দাও।[১]

এ আয়াতদ্বয়ে বিয়ের ক্ষেত্রে মোহর দেয়ার স্পষ্ট নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে। এ জন্যে 'মহরানা' হচ্ছে বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার একটি জরুরী শর্ত। প্রথম আয়াতে আযাদ ও স্বাধীন মহিলাকে বিয়ে করা সম্পর্কে নির্দেশ এবং দ্বিতীয় আয়াতে দাসী বিয়ে করা সম্পর্কে বলা হয়েছে। আর দু'জায়গায়ই বিয়ের বিনিময়ে মহরানা দেয়ার স্পষ্ট নির্দেশ উল্লিখিত হয়েছে।

আল্লামা ইবনুল আরাবী লিখেছেনঃ

মহান আল্লাহ মহরানাকে বিনিময় স্বরূপ ধার্য করেছেন এবং যাবতীয় পারস্পরিক বিনিময় সূচক ও একটা জিনিসের মুকাবিলায় আর একটা জিনিস দানের কারবারের মতই ধরে দিয়েছেন।

অতএব এটাকে স্বামীর 'অনুগ্রহের দান' মনে না করে একটার বদলে একটা প্রাপ্তির মত ব্যাপার মনেকরতে হবে। অর্থাৎ মোহরানার বিনিময়ে স্ত্রীর যৌন অঙ্গ ব্যবহারের অধিকার লাভ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم-

এবং মুহারম মেয়েদের ছাড়া আর সব মহিলাকেই তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে এ জন্যে যে, তোমরা তাদের গ্রহণ করবে তোমাদের ধন মালের বিনিময়ে।[২]

ইবনুল আরাবী লিখেছেনঃ আল্লাহ মহান হুকুমদাতা স্ত্রীর যৌন অঙ্গ ব্যবহার হালাল করেছেন ধন-মালের বিনিময়ে ও বিয়ের মাধ্যমে পবিত্রতা রক্ষার্থে, যিনার জন্যে নয়। আর এ কথা প্রমাণ করে যে, বিয়েতে মহরানা দেয়া ওয়াজিব অর্থাৎ ফরয।[৩]

---

[১]. আল্-কুরআন, ৪ঃ ২৫
[২]. আল্-কুরআন, ৪ঃ২৪
[৩]. আহ্কামুল কুরআন, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনুল আরাবী আরও লিখেছেনঃ এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মোহরানা দেয়া সকল বিয়েতে ও সকল অবস্থায়ই ওয়াজিব (ফরয)। এমনকি আক্দ এর সময় যদি ধার্য করা নাও হয় তবুও সে স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন হওয়ার সাথে সাথে মহরানা দেয়া ওয়াজিব (ফরয) হয়ে যাবে। শুধু তা-ই নয়, মহরানা আদায় করতে হবে অন্তরের সন্তোষ ও সদিচ্ছা সহকারে এবং মেয়েদের জন্যে আল্লাহ্র দেয়া এক নিয়ামত মনে করে।

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছেঃ وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

এবং স্ত্রীদের প্রাপ্য মহরানা তাদের আদায় করে দাও আন্তরিক খুশীর সাথে ও তাদের অধিকার মনে করে।[১]

আয়াতে উদ্ধৃত শেষ نحلة শব্দের অর্থ ব্যাপক। তার একটি মানে হচ্ছে কোন বিনিময় ও বদ্লা ব্যতিরেকেই কিছু দিয়ে দেয়া। আয়াতের আর একটি অর্থ হচ্ছেঃ মোহরানা দিয়ে মনকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ করে নাও, মোহরানা দেয়ার জন্যে মনের কুণ্ঠা কৃপণতা দূর কর।

আর এর তৃতীয় অর্থ হচ্ছে আল্লাহর তরফ থেকে বিশেষ দান।

কেননা জাহিলিয়াতের যুগে হয় মোহরানা ছাড়াই মেয়েদের বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যেত, নয় মোহরানা বাবদ যা কিছু আদায় হত তা সবই মেয়েদের বাপ বা অলী গর্জিয়ানরাই লুটে পুটে খেয়ে নিত। মেয়েরা বঞ্চিতাই থেকে যেত। এজন্যে ইসলামে যেমন মোহরানা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তেমনি এ জিনিসকে একমাত্র মেয়েদেরই প্রাপ্য ও তাদের একচেটিয়া অধিকারের বস্তু বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এতে বাপ বা অলী-গর্জিয়ানের কোন হক নেই বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। বস্তুত মোহরানা যখন মেয়েদের জন্যে আল্লাহ্র বিশেষ দান, যখন তা আদায় করা স্বামীদের পক্ষে ফরয এবং স্বামীদের উপর তা হচ্ছে স্ত্রীদের আল্লাহর নির্ধারিত অধিকার।

মাহরের গুরুত্ব সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ ما ابستحللتم به الفروج
মহর হইল সেই বস্তু, যার বিনিময় তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের গুপ্তাঙ্গ হালাল করে লয়ে থাক।[২]

---

১. আল্-কুরআন, ৪ঃ৪।
২. ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল, মুসনাদে আহমদ, মক্কা মুকাররমা, খ.২, ১৯৭৮ইং, পৃ.৫২৩।

Dhaka University Institutional Repository

কেহ যদি স্ত্রীর মহর আদায় করবে না বলে নিয়্যত করে, তবে তাকে হাদীসে যিনাকার (ব্যভিচারী) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি কোন নারীকে মহর দানের শর্তে বিবাহ্ করেছে অথচ মোহর আদায়ের নিয়্যত তার নাই, তবে সে যিনাকার (ব্যভিচারী)।[১]

উপরোক্ত আলোচনা হতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, মাহর অবশ্যই দিতে হবে।

মাহর স্ত্রীকে প্রদত্ত সম্পদ। এর মালিকানা স্বত্ব একমাত্র তারই। ইহা মাফ করে দেয়া বা আংশিক মাফ করার অধিকার তার ছাড়া আরকারো নাই। মোহর আদায় না করা পর্যন্ত স্বামীর সহিত সহবাস, তার আদেশ পালন ও তার সহিত এক গৃহে অবস্থান করতে অস্বীকার করার অধিকার তার আছে। মোহর পরিশোধের পূর্বে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী মোহর আদায় না হওয়া পর্যন্ত তার মৃত স্বামীর সম্পত্তি দখল করে রাখতে পারে।[২]

মোহর স্ত্রীর প্রাপ্য এবং স্বামী তার উপর স্বামীত্বের অধিকার লাভের সময়ই ইহা আদায় করে দেয়া উচিত। কিন্তু স্বামী অক্ষম হলে সমঝোতার ভিত্তিতে স্ত্রী স্বামীকে অবকাশ দিতে পারে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً

"আর তোমরা নারী দিগকে তাদের মোহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও। পরে তারা খুশী মনে এর কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা সানন্দ চিত্তে ভোগ করতে পার।"[৩]

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি ইসলাম নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার মোহর দ্বারা তার যথাযথ মর্যাদা দান ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে সমতা বিধানের তাগিদঃ

এক পুরুষ একই সঙ্গে একাধিক স্ত্রী নিয়ে দাম্পত্য জীবন যাপনকে বহু বিবাহ্ প্রথা বলা যেতে পারে। কোন কোন সমাজে একই নারীর একই সঙ্গে একাধিক স্বামী থাকার প্রথা ও আছে।

---

[১]. ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল, মুসনাদে আহমদ, মক্কা মুকাররমা, খ.২, ১৯৭৮ইং, পৃ.৫২৩।

[২]. তান্‌যীলুর রহমানঃ মাজমুআহ কাওয়ানীন ইসলাম, ১ম খন্ড, করাচী-১৯৬৫, পৃষ্ঠা-৪৮, Asif Fyzee: Out Lines of Muhammadan Law, 2nd Edition, Oxford, 1955, Sir Ronald K. Wilson: Anglo-Mohammadan Law, 4th ed. London, 1912 , p-167-168.

[৩]. আল্-কুরআন, ৪ঃ৪

ইসলামে বহু বিবাহের কথাটি বহুল আলোচিত হয়। একারণে নয় যে মুসলমানেরা অনেকেই একসংগে বহু স্ত্রী নিয়ে সংসার জীবন যাপন করেন। খ্রীষ্টান ধর্মে বহু বিবাহের অনুমোদন নেই। ইসলামে এর অনুমোদন আছে। এ অনুমোদনের কারণেই বিষয়টি নিয়ে বহুল আলোচনা।

কোন কোন মুসলিম অবশ্য ইসলামে বহু বিবাহের ব্যাপারটি সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে এবং সুযোগের অপব্যবহার করে ও থাকে। ইসলামে বহু বিবাহের অনুমোদন শর্ত সাপেক্ষে। শর্তে কথাটি অনেকেই ভুলে যান। কিন্তু তা সত্বেও কোন মুসলিম দেশে বহু বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ৩% এর বেশী নয়। নারী শিক্ষা প্রসার এবং বহু বিবাহের শর্ত সাপেক্ষ অনুমোদন সম্পর্কে সঠিক ধারণা বৃদ্ধির ফলে মুসলিম সমাজে বহু বিবাহ প্রথা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে।

বহু বিবাহের অনুমোদন সম্পর্কে আল-কুরআনের প্রাসংঙ্গিক আয়াতটিতে আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً

যদি তোমরা আশংকা কর যে এতিম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না। তবে, বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাদেরকে তোমাদের পছন্দ হয় ২, ৩ অথবা ৪। আর যদি আশংকা কর যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে ১ জনই রাখবে।[১]

উক্ত আয়াতে ইসলাম চারটি নারীকে একসঙ্গে বিবাহ করার বিধান দিয়েছে, তবে এর ওপর একটি পূর্ব শর্ত আরোপ করেছে। যদি কেউ বহু বিবাহ করে তার স্ত্রীদের সমান ভাবে সন্তুষ্ট করতে না পারে, সমান ভাবে সহবাস, সমভাবে জিনিসপত্র ও সমভাবে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা না করতে পারে তবে তার পক্ষে একস্ত্রীতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ। ইসলামের বিধান একাধারে যেমন সুন্দর ও সহজ, তেমনি কঠোর ও নীতিবাদ।

কাহারও একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের সহিত সমান, ন্যায়সঙ্গত ও ইনসাফপূর্ন ব্যবহার করতে হবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ

যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী আছে সে যদি তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ আচরণ না করে, তবে সে কিয়ামত দিবস এক পার্শ্ব ঝুলন্ত অবস্থায় আগমন করবে।[২]

---

১. আল্-কুরআন, ৪ঃ৪

২. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহঃ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪০,

Dhaka University Institutional Repository

যাদের একাধিক স্ত্রী আছে, অথচ তাদের সহিত একরূপ ব্যবহার করে না, তাদের সর্তক হওয়া আবশ্যক। স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে পারবে না বলে যাদের আশংকা হয়, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক তাদিগকে একটি মাত্র বিবাহের নির্দেশ দিয়েছেনঃ

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

স্মরণ রাখা দরকার, ভালবাসা একান্তভাবেই মানসিক ব্যাপার। ইহা মনের মধুর আবেগ অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই নহে। আর মনের উপর কারো কোন ক্ষমতা চলে না এবং ক্ষমতা বহির্ভূত কার্যের দায়িত্ব ও আল্লাহ্ তা'আলা কারো উপর চাপিয়ে দেন না।[১]

সুতরাং সকল স্ত্রীর প্রতিই সমান ভালবাসা থাকবে, ইহা কেহই আশা করতে পারে না।

যে কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা মানুষের আছে, এর দায়িত্বই আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর অর্পণ করেছেন। ইহা হলো, খোর-পোষ ও উপঢৌকনাদি প্রদান, দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শণ, রাত্রি-যাপন, মেলামেশা সদ্ব্যবহার ইত্যাদি বাহ্য আচার-আচরণ কোন স্ত্রীর প্রতিই কোনরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা যাবে না। সাম্য ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিতেই সকলের সকলের সহিত আচরণ ও সদ্ব্যবহার করতে হবে। বাহ্য আচরণে ইনসাফের খেলাফ করলেই সে শরীয়াতের বিচারে ধৃত হবে। অন্যথায় কারো প্রতি মানসিক আচরণ কম বেশীর জন্য ধৃত হবে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেনঃ

وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

আর তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন, তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি পরিপূর্ণ সমান ব্যবহার কখনই করতে পারবে না। তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুকে পড়ো না এবং অপরকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখনা।[২]

---

[১]. আল্-কুরআন, ২ঃ ২৮৬।
[২]. আল্-কুরআন, ৪ঃ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় সর্বাবস্থায় ও সর্বদিক দিয়ে মানুষ দুই বা ততোধিক স্ত্রীর সহিত সম্পূর্ণ সাম্য রক্ষা করতে পারে না। স্ত্রীদের মধ্যে গুণাবলীর পার্থক্যের কারণে এক স্ত্রী হতে অপর স্ত্রীর প্রতি অধিক আকর্ষণ হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তখন যেন না হয় একজন এরূপ ঝুলন্ত হয়ে পড়ে যেন তার স্বামী নাই।

দুই বা ততোধিক স্ত্রী থাকলে অবশ্যই পালা করে বিভিন্ন স্ত্রীর সহিত সমভাবে রজনী যাপন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর পবিত্র সহধর্মিনীগণ (রাঃ)-এর সহিত অবস্থানের এরূপ পালা নির্ধারণ করে লইতেন। ফিকাহ্ শাস্ত্রের অধিকাংশ ইমাম (র) পালা নির্ধারণ করাকে ওয়াজিব বলেছেন।[১]

উল্লেখিত আয়াত গুলো পর্যালোচনা করে ইসলামী চিন্তাবিদদের অভিমত হলো বহু বিবাহের অনুমোদনের বিষয়টি সুস্পষ্ট। কিন্তু, সকলকে সমান ভাবে ভালবাসা সম্ভব নয়। তবে, আহার বিহার পোষাক পরিচ্ছদ, বাসস্থান, বিনোদন, খোঁজ-খবর নেয়া, সকল স্ত্রীর সন্তানের প্রতি সমান ব্যবহার এ সমস্ত দিকে সমতা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। ইসলামী আইনবিদগণ ও উল্লেখ করেছেন যে, স্ত্রীর সংখ্যা ৪ পর্যন্ত নির্ধারণ করে দেয়াও তৎকালীন পরিবেশে খুবই কঠোর বিধান ছিল। কারণ তৎকালে বিত্তবান ব্যক্তির বিবাহের উপর কোন সীমাবদ্ধতা ছিল না। কারও কারও সংসারের শতাধিক স্ত্রী থাকত এবং তাদের সকলের নাম জানা দূরের কথা দেখে চেনা ও কষ্টকর হতো।

মুসলিম ফকীহদের আর একটি বিশ্বাস হলো প্রথম স্ত্রীকে ভাল না লাগলে বা অসহনীয় হলে তালাক দিয়ে একেবারে পরিত্যাগ করার চেয়ে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা অপেক্ষাকৃত উত্তম। স্ত্রীদের মতামত নিলেও দেখা যাবে যে, এরূপ ক্ষেত্রে তালাক নিয়ে স্বামীর সংসার ত্যাগ করার পরিবর্তে অন্য একজন নারীর সংগে একই স্বামীর গৃহে থাকাই মন্দের ভাল হিসাবে অনেক নারীই মেনে নেবেন। কারণ, তার সন্তানেরা বাব-মা দুজনের সঙ্গে থাকতে পারে, যদিও তিনি স্বামীকে আংশিক ভাবে পাবে।[২]

একাধিক নারী একই ব্যক্তিকে একই সংগে স্বামী হিসাবে পেয়ে ক্ষুণ্ন হতে পারে। কিন্তু একাধিক সন্তান একই ব্যক্তিকে পিতা হিসাবে পেয়ে ততটুকু মনোক্ষুণ্ন হয় না। কোন কোন

---

[১]. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪২-৪৩।
[২]. Sayed Sabiq, Fiqh, Vol-6, pp.227-31 and Al-Qaradowi Al-Halal, pp.178-80.

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তাবিধ এবং ধর্মতত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে সূরা নিসা'র ৩ এবং ৪ নং আয়াতে বস্তুতঃ এক বিয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সুতরাং আমরা আল্-কোরআনের ইংরেজী তরজমা ও ভাষ্যকার আল্লামা ইউসুফ আলীর মতে দেখতে পাই। বিয়ের নীতিমালা সংক্রান্ত আয়াতটি অহুদ যুদ্ধের পরেই নাযীল হয়। তখন মুসলিম সমাজে ছিল বহু সংখ্যক বিধবা এবং তাদের এতিম সন্তানরা। তদুপরি ছিল যুদ্ধকালে যুদ্ধবন্দী বহু নারী। তাদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য নয় এবং সবচেয়ে বেশী মানবতাবোধ এবং দয়া-মায়ার সঙ্গে দেখার নির্দেশ ছিল।[১]

সুতরাং ইসলামে বহু বিবাহ নারীর অধিকারকে খর্ব করেনি বরং বৃদ্ধি করেছে বহুগুণে।

স্বামীর একাধিক বিবাহে স্ত্রীর বাধাদানের অধিকারঃ

ইসলামী ফিকাহ্-এ বিয়ে হলো দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের একটি দেওয়ানী চুক্তি বা Civil contract, যদি ও এ চুক্তিতে পবিত্রতা আরোপ করা হয়েছে। কারণ, দাম্পত্য সম্পর্কের মাধ্যমেই প্রাণের চেয়ে প্রিয় সন্তানের আবির্ভাব হয়।

বিবাহের চুক্তির মধ্যে স্ত্রী বা স্ত্রীর অভিভাবক বৈধ শর্তসমূহ আরোপ করতে পারে। এ চুক্তির একটি শর্ত হতে পারে যে, স্বামী-স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত ২য় বিবাহ করতে পারবে না অথবা আদৌ একাধিক বিবাহ করতে পারবে না। যদি স্বামী কাবিন নামায় এ শর্ত ভঙ্গ করে, তবে স্ত্রীর তালাকের অধিকার থাকে।

সায়খ সাঈয়ীদ সাবিক তার 'ফিকহ্ আল্ সুন্নাহ" শীর্ষক বিশ্বকোষে লিখেছেন, যেহেতু ইসলাম বহু বিবাহ সম্পর্কে সমান ব্যবহারের শর্ত আরোপ করেছে এবং স্ত্রী সংখ্যা সর্বোচ্চ ৪-এ সীমিত করেছে এতে স্ত্রী অথবা তার অভিভাবককে বিবাহ চুক্তিতে এ শর্ত আরোপ করার অধিকার দিয়েছে যে, স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করবে না। স্ত্রী যদি এ'টি কাবিনের একটি শর্ত হিসেবে আরোপ করে, তাহলে এ শর্ত ভঙ্গ করা হলে তার তালাক প্রদানের অধিকার বর্তায়। যদি তিনি পরবর্তীতে এ শর্ত শিথিল করে অথবা স্বামীকে বিশেষ অবস্থায় ২য় স্ত্রী গ্রহণ করার অনুমতি দেন তবে তা ভিন্ন কথা।

---

১. Abdullah Yousuf Ali, translation of the Quran with commentary, p.179.

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত মতামত হলো হাম্বলী মায্হাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আহমদ (রঃ)-এর। ইমাম ইবনে তা'ইমিয়া এবং ইবনে কা'ইয়েমও উপরোক্ত মত সমর্থন করেছেন।

তারা আরও একটু অগ্রসর হয়ে মত প্রকাশ করেছেন যে, এ শর্ত যে লিখিত হতে হবে তা নয়। শর্তটি মৌখিক ও হতে পারে। যদিও বিয়ের মূল চুক্তি লিখিত হয়ে যাকে।

মৌখিক চুক্তি ছাড়াও স্বামীর এক বিবাহ্ কনের পরিবারের 'ওরফ' অথবা পারিবারিক নীতি ও হতে পারে। অর্থাৎ ঐ পরিবারের মেয়েরা যদি এমন হয় যে, তারা স্বামীর অন্য স্ত্রী সহ্য করতে পারে না এবং একারণে বিয়ে ভঙ্গ করে দেয়, তবে এরূপ পরিবারে কোন পুরুষ বিয়ে করলে ধরে নিতে হবে যে তিনি ২য় স্ত্রী গ্রহণ করবেন না একই শর্তে উক্ত পরিবারের কোন মেয়ের সঙ্গে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।[১]

স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ্ না করার শর্ত সম্পর্কে স্ত্রীর অধিকারঃ

ইসলাম মানবতার ধর্ম। এ ধর্মে নারীকে তার সঠিক মর্যাদা প্রদানের লক্ষ্যে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বামীকে বহু বিবাহের যে রূপ অধিকার দিয়েছে তদ্রুপ সকল স্ত্রীর প্রতি সর্ব বিষয়ে সমতা প্রদানে তাগিদ দিয়ে সে অধিকারকে আরও সীমিত করা হয়েছে।

যেহেতু ইসলাম বহু বিবাহ সম্পর্কে সমান ব্যবহারের শর্ত আরোপ করেছে এবং স্ত্রী সংখ্যা সর্বোর্চ্চ ৪-এ সীমিত করেছে; এতে স্ত্রী অথবা এর অভিভাবককে বিবাহ্ চুক্তিতে এ শর্ত আরোপ করার অধিকার দিয়েছে, স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ্ করবে না। স্ত্রী যদি এটি কাবিনের একটি শর্ত হিসেবে আরোপ করে। তাহলে এ শর্ত ভংগ করা হলে তার (স্ত্রী) তালাক প্রদানের অধিকার বর্তায়। যদি তিনি পরবর্তীতে এ শর্ত শিথিল করেন অথবা স্বামীকে বিশেষ অবস্থায় ২য় স্ত্রী গ্রহণ করার অনুমতি দেন তবে তা ভিন্ন কথা।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র) ও উপরোক্ত মত পোষণ করেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং ইবনে কাইয়েম ও এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অনুরূপভাবে তারা আরো বলেন যে, উক্ত শর্তটি মৌখিত হলে চলবে। কোন কোন অবস্থায় 'উরফ' তথা প্রথা অনুযায়ী এ শর্ত আরোপিত হয়। যদি কোন পুরুষ এমন পরিবারে বিয়ে করে, যে পরিবারের মেয়েরা ২য় স্ত্রী সহ্য করে না।

---

১. Sayyid Sabiq, Fiqh, Vol-6, pp.231-232.

Dhaka University Institutional Repository

সায়খ সাঈয়ীদ সা'বিক এর নিজস্ব শব্দে এ বিষয়টি নিম্নরূপ লেখা হয়েছে-

كاأن الاسلام قيد التذ دبا لقل رةغلى العل ل، وقعره عىل أربع، فقل جعل من حق الرأة

أو وليما أن تشترط ألا يتزوج الر جل عليها فلو شرطت الزوجة فى عقل الزواجعلى زوجها

ألايتزوج عليها صح الشرط ولزم. وكان هاحق فسخ الزوج أذا لم يف بالشرط. ولايسقط حقها

فى الفسخ إلاإذا أسقطته هى. ورضيت عجخالقته.

সঠিক পন্থায় যৌন মিলনের দাবি পূরণ সহ সন্তান লাভের অধিকারঃ

যৌন মিলনের দাবি এক স্বাভাবিক দাবি। এ ব্যাপারে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই সমান। কিন্তু এ ব্যাপারে নারী সব সময় Passive নিশ্চেষ্ট, অনাগ্রহী ও অপ্রতিরোধীও। পুরুষ এ ক্ষেত্রে অগ্রসর, active-সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সেজন্যে যৌন মিলনের ব্যাপারে সাধারণত স্বামীর তরফ থেকেই আসে আমন্ত্রণ। স্ত্রী সহবাস আসলে যৌন সম্ভোগ। কিন্তু ইসলাম ইহাকে ও ধর্ম-কর্মে রূপান্তরিত করেছে।

মুসলমান বিশ্বাস করেন যে, বিবাহ করা, বংশ বৃদ্ধি করা এবং দুনিয়া আবাদ করা ধর্মীয় কর্তব্য। হাদীসে উল্লেখ আছেঃ

اتنا كحوا تنا سلوا تكثروا، فإنِي مباإ بكم الافم يوم القيا مة.

বিয়ে করো, সন্তান বৃদ্ধি করো। শেষ বিচারের দিনে আমি অন্যান্য উম্মৎদের মধ্যে তোমাদেরকে নিয়ে গর্ব করবো।[১]

পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের আকাঙ্খা শুধু মানুষ নয়, জীব জগতেও আছে। সন্তান পিতা-মাতার আনন্দের উৎস। তাই বলে সন্তান উৎপাদন করতে গিয়ে স্ত্রীর সহিত পশুরমত যৌন ক্রিয়া করলে চলবে না। ইসলাম স্বামীকে সে অধিকার দেয় নি।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ "ইতর জন্তুর ন্যায় আপন স্ত্রীর ওপর উপগত হওয়া মানুষের উচিত নহে। বরং সঙ্গমের পূর্বে দূত প্রেরণ করা আবশ্যক।" সাহাবায়ে কেরাম আরজ

---

১. ইমাম আবূ দাউদ, আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৫৮০

Dhaka University Institutional Repository

করলেন, "ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ), সহবাসে আবার দূত কেন? তদুত্তরে হুজুর বললেন, চুম্বনই সেই দূত।[১]

নারীদেহের ইন্দ্রিয়গুলো পুরুষের মতো সজাগ নয়। কোন নারীর কোন অঙ্গে যে যৌন-ক্ষুধা লুকিয়ে থাকে তা বলা কঠিন। কারো স্তনে, কারো ঠোঁটে, কারো পায়ের গোড়ালিতে কারো বা ভগাঙ্কুরে, কারো বা কেশে বা চর্মে। এক কথায় বলতে হয়, এদের সারা দেহটাই যৌন চুল্লী বা যৌন-জেনারেটর। সঙ্গমের পূর্বে দূত প্রেরণের যে নির্দেশ যৌন বিজ্ঞানী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দিয়েছেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তার ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ

যৌন চেতনা স্বভাবত স্নায়ুমন্ডলীর কেন্দ্র সমূহে প্রবল সময়ের মধ্যে যৌনবোধ জাগ্রত করা যায়। নারীদের কেন্দ্র সমূহ হচ্ছে-১। গাল, ২। ঠোঁট, ৩। ভগাঙ্কুর, ৪। স্তন ও এর বোটা, ৫। ভগদেশ, ৬। উরু, ৭। নিতম্ব, ৮। গুহ্যদ্বার ইত্যাদি।[২]

উক্ত কেন্দ্রসমূহে ঘর্ষণ, চুম্বন, আলিঙ্গন, সুড়সুড়ি দিলে স্নায়ুগুলোতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। আর এ প্রতিক্রিয়ার ফলেই আসে অনাবিল আনন্দ ও যৌন-ক্রিয়ার লিপ্সা। দূত যেমন সংবাদ আদান-প্রদান করে এক সম্বন্ধ ঘটিয়ে দেয়, তেমনি এসব প্রতিক্রিয়াগুলো নারী পুরুষের মাঝেও এক চরম আকর্ষণ ও যৌন পুলক এনে দেয়।

নারীর যৌন অধিকার পুরোপুরি মিটিয়ে দেয়ার ব্যাপারে পুরুষের কিছু দুর্বলতার ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ) পুরুষকে সচেতন করে দিয়েছেন ও জ্ঞান দান করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

"তিনটি বিষয়ে পুরুষের দুর্বলতা প্রকাশ পায়-

(১) এমন একজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল যে ব্যক্তি তাহাকে ভালবাসে কিন্তু তাহার নাম ঠিকানা স্মরণ নাই। (২) কোন একজন মুসলমান ভাইয়ের নিকট সম্মান লাভ করিয়া তাহা উপেক্ষা করিলে। (৩) চুম্বন আলিঙ্গনাদির সাহায্যে স্ত্রীর কামভাব জাগ্রত করার পূর্বে সহবাস আরম্ভ করিয়া স্ত্রীর শুক্রপাত হওয়া প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখা হইল, স্ত্রীর প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইল না।"[৩]

---

[১]. হাদিস, সংগৃহীত, কিমিয়াতে সা'আদত, ২য় খন্ড, ইমাম গাজ্জালী, তর্জমা মাওলানা, নুরুর রহমান এম, এ।
[২]. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, বৈজ্ঞানিত মুহাম্মদ (দঃ), ২য় খন্ড, ১ম প্রকাশ, ঢাকা, জুন-২০০০, পৃষ্ঠা-৮০।
[৩]. আল্-হাদীস, সংগৃহীত, কিমিয়াতে সা'আদত, ২য় খন্ড, ইমাম গাজ্জালী, তর্জমা নুরুর রহমান এম, এ, পৃষ্ঠা-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত হাদীসে নারীর যৌনক্ষুধা নিবৃত করার ক্ষেত্রে স্বামীর কি করণীয় তা বলা হয়েছে। পুরুষ নিজের তৃপ্তির কথা ভাববে নারীর কথা ভাববে না এ সুযোগ ইসলামে নেই। তাই সঙ্গমে লিপ্ত হবার পূর্বে হাসি, গল্প, আদর-সোহাগ, চুম্বন, আলিঙ্গন, দংশন, পীড়ন, আঘাত, অভিমান অনেক কিছুই প্রয়োজন। নারীর যৌন অধিকার পুরোপুরি পূরণ করতে তার সুপ্ত কামভাবে জাগ্রত করে নিতে হয়। তাই ইসলামে নারীর এ অধিকার পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পক্রিয়ার মাধ্যমে মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি করার পর দৈহিক উৎপীড়নে নারীকে যৌন তৃপ্তি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। যা হতে হবে অনাবিল শান্তি ও আনন্দের।

বৈধ উপায়ে সঙ্গম লাভের অধিকারঃ

সুখ দেখা যায় না, সুখ দাঁড়ি পাল্লাতে ও মাপা যায় না, অথচ এ সুখের জন্যই মানুষ লালায়িত। মানুষ সুখ ভোগ করে, অনুভব করে অথচ এ সুখ সৃষ্টিকারী-কে তার সন্ধান নেয় না। তার কাছে শুকুর আদায় করে মাথা নত করে না। সঙ্গম সুখ দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ। মাত্র দশ পনেরো মিনিটের সঙ্গম-সুখ মানুষকে পৃথিবীর সকল ধন সম্পদ হতে অনেক গুণ বেশী সুখী করে। আল্লাহ্‌র এ অপরিসীম নিয়ামত, বেহেশতের এ সুখ ধরায় ভোগ করে যারা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তারাই পূণ্যবান, তারাই শ্রেষ্ঠ এবাদত কারী। সঙ্গম পাপ মোচন করে,সঙ্গম সম্মান বৃদ্ধি করে, সঙ্গম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার বীজ বপণ করে ও পূণ্যের পাহাড় গড়ে তোলে। এ সঙ্গম ঘৃণ্য নয়, অনাদরণীয় নয়, অবহেলিত নয়।

স্ত্রীকে স্বামীর কৃষি ক্ষেত্র বলে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষক নিজ ক্ষেত্রের এমন স্থানেই বীজ বপণ করে, যেখানে ইহা বিনষ্ট না হয় এবং শস্য উৎপাদিত হয়। সুতরাং সে তার ক্ষেত্রের অনুর্বর ও প্রস্তরময় স্থানে বীজ বপণ না; বরং রসা ও নরম স্থানেই বপণ করে থাকে। সন্তানরূপী শস্য উৎপাদনের কৃষক হল স্বামী। তাই সন্তান উৎপাদনই তাহার বীজ বপণের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ; নিছক ক্ষণিকের আনন্দ উপভোগ নহে। স্ত্রী সহবাসেই বীজ বপণ করা হয়ে থাকে। সুতরাং অগ্র-পশ্চাৎও দেখিয়াই স্বামী বীজ বপন করবে। পশ্চাৎ দিক দিয়া বীজ বপন করলে ইহা অঙ্কুরিত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। ইহা প্রকৃতি বিরুদ্ধ, শরীআতে অপছন্দনীয় ও অসঙ্গত এবং স্বাস্থ্যনীতির বিরোধী। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেনঃ

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যে ভাবে ইচ্ছা, গমন করতে পার। কিন্তু তোমরা তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য ভাবনা কর এবং আল্লাহকে ভয় কর। আর জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহর সম্মুখীন হবে। আর (হে রাসূল) আপনি মু'মিনদিগকে (তাদের সফলতার সৌভাগ্যের) সুসংবাদ প্রদান করুন।[১]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা আবূল আলা মওদূদী বলেনঃ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে মহিলাগণ পুরুষের কেবল আনন্দ উপভোগের সামগ্রীরূপেই সৃজিত হয় নাই; বরং উভয়ের মধ্যে ক্ষেত কৃষকের সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে কৃষক কেবল আনন্দ লাভের জন্যই গমন করে না; বরং শস্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যেই গিয়া থাকে। মানবজাতির কৃষককে ও তদ্রুপ মানব-বংশ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সন্তান-সন্ততিলাভের উদ্দেশ্য লয়ে গমন করতে হবে। তুমি এই ভূমি কিরূপে কর্ষণ করবে, ইহার বিস্তারিত আলোচনা আয়াতে করা হয় নাই বটে, তবে তোমার নিকট দাবি এই, তোমার শস্যক্ষেত্রে গমন কর এবং এই উদ্দেশ্য লয়ে গমন কর যে, ইহা হতে উৎপাদন লাভ করতে হবে।[২]

আয়াত থেকে আর দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝা যায়। একটি হল নিজ বংশের স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য সচেষ্ট হও, যেন তোমরা দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার পূর্বেই তোমাদের স্থান পূরণকারী দলের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়টি হল, যাদের জন্য তোমরা স্থান পরিত্যাগ করে যাবে, তাদিগকে ধর্ম, স্বভাব-চরিত্র ও মনুষ্যত্বে ভূষিত করার জন্য যত্নবান হও। অতঃপর এই দ্বিবিধ কর্তব্য সম্পাদনে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করলেযে মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহী করতে হবে, এ বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সহিত গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করে, সে অভিশপ্ত।"[৩]

---

১. আল্-কুরআনে, ২ঃ২২৩

২. তাফহীমূল কুরআন, সূরা বাকারাহ, টিকা-২৪১-২৪২।

৩. ইমাম তিরমিযী, তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.২৪২; ইমাম ইবন মাজা, সুনান, দেওবন্দ: আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি. তাহরাত অধ্যায়, ১৩৭ নং পরিচ্ছেদ।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সহিম গুহ্যদ্বার দিয়া তার স্ত্রীর সহিত সহবাস করে অথবা গণৎকারের নিকট গমন করে, সে অবশ্য মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি যাহা অবতীর্ণ হয়েছে, তার উপর অবিশ্বাসী।[১]

ঋতুকালে স্ত্রীর সহিত সহবাস নিষিদ্ধ। কামোদ্দীপনার বশীভূত হয়ে, কেহ এই পাপ করলে কাফ্ফারা দেয়া তার অবশ্য কর্তব্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

লোকে আপনাকে ঋতুস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, ইহা অশুচি। সুতরাং ঋতুস্রাবকালে স্ত্রী সহবাস বর্জন করবে এবং যতদিন না তারা পবিত্র হয়, তাদের নিকট (সহবাসের জন্য) যাবে না। অতঃপর যখন তারা (উত্তমরূপে) পরিশুদ্ধ (পবিত্র) হবে, তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাপ্রার্থীগণকে এবং যারা পবিত্র থাকে, তাদিগকে পছন্দ করেন।[২]

এই আয়াতে ঋতুকালে স্ত্রীর নিকট গমন, তার সহিত উঠা-বসা, খাওয়া-দেওয়া ইত্যাদি নিষেধ করা হয় নাই। কেবল সহবাস হারাম করা হয়েছে। আর ইহা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ও বিধান। এইভাবে ইসলাম সর্বক্ষেত্রে নারীকে তার যথাযথ সম্মান প্রদর্শণ করেছে।

নারীর তালাক প্রাপ্তি ও প্রদানের অধিকারঃ

পারিবারিক জীবনে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় অত্যন্ত মর্মান্তিক ব্যাপার। 'তালাক' হচ্ছে এ বিপর্যয়ের চূড়ান্ত পরিণতি। নারী পুরুষের আনন্দ-ঘন মিলনে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ইহা আজীবন প্রীতিবন্ধন, সাময়িক প্রেম-নিবেদন নহে। স্বামী-স্ত্রী জীবিত থাকাকালীন এই পবিত্র বন্ধন ছিন্ন হতে পারে না। (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً) পবিত্র কুরআনে ইহাকে 'মীসাকান গালীজান'-অতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ও চুক্তিরূপে অভিহিত করা হয়েছে।[৩]

---

১. ইমাম তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা-৩১৮।
২. আল্-কুরআন, ২ঃ২২২।
৩. আল্-কুরআন, ৪ঃ২১।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত (সাঃ) বলেছেন, “বিবাহ কর কিন্তু তালাক দিও না, কারণ উহাতে আরশ কম্পিত হয়।”[১]

বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তালাক বৈধ ও আবশ্যক হয়ে পড়লেও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হালাল কার্যের মধ্যে ইহাই ঘৃণ্যতম কাজ বলে হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) বলেনঃ

বৈধ কাজসমূহের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা অপসন্দনীয় কাজ হলো তালাক।[২]

দাম্পত্য জীবনে অশান্তির যে সকল প্রতিকার রয়েছে তন্মধ্যে তালাকই সর্বশেষ প্রতিকার। এ ব্যবস্থা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। তালাক অর্থ বিচ্ছিন্ন, বন্ধনমুক্ত, বৈধতাকরণছেদ। তালাক শুধু পুরুষের জন্যই বৈধ নয়, স্ত্রীর জন্যও বৈধ। তাই স্ত্রী বা স্বামী একে অন্যকে দাম্পত্য জীবনের অশান্তি হেতু, চরম গরমিলের কারণে ব্যভিচারের দোষে তালাক দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। ইসলামের উদারনীতি নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রযোজ্য। ইহুদী, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মে নারীর অধিকার তো দূরের কথা এদের আত্মার অস্তি ত্বকেই বিশ্বাস করতো না। নারীকে শাস্তিদিয়ে, নারীকে পুতুল করে, নারীর মর্যাদা হরণ করে পুরুষ গৌরবান্বিত হতো। পুরুষ দস্যু হলেও দেবতা, চোর হলেও নমস্য, ব্যভিচারী হলেও পুজারী আর অক্ষম হলেও পরম সঙ্গম মনে করেই নারীকে দিন কাটাতে হবে এটাই ছিল পূর্ব যুগের মানুষের ধারণা। ইসলাম এই অমূলক ধারণার মাথায় কুঠারাঘাত হানল, নারীর সম্মান দিল, মান দিল, সমভাবে পুরুষের মতোই অধিকার দিল। পুরুষের পছন্দ না হলে যদি স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যায়, তবে পুরুষকে পছন্দ না হলে নারীই বা তাকে তালাক দিতে পারবে না কেন?

তালাক প্রথাটা ঘৃণ্য কথা। কেউ এ প্রথাকে অভিনন্দিত করবে না, কেননা একটা ঘর বাঁধা খুব কঠিন, সময় সাপেক্ষ। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই একে ভস্মীভূত করে দেয়া যায়। ঠিক বিবাহ ও তালাক প্রথাও তেমনি। দুটি অজানা, অচেনা প্রাণ একত্র করে ঘর করা খুবই

---

[১]. ইমাম আবূ দাউদ, সুনান, প্রাগুক্ত, তালাক অধ্যায়ঃ باب فى كر اهية الطلاق খ.২, পৃ.৬৩১; সুনান ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত, তালাক অধ্যায়, হা. নং-২০১৮।

[২]. ইমাম আবূ দাউদ, সুনান, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৬৩১।

Dhaka University Institutional Repository

কঠিন। কিন্তু একে নষ্ট করা অতি সহজ। সামান্য কয়েকটি মাত্র কথা। তাই বৈধ হওয়া সত্ত্বেও এ প্রথাকে কোন জ্ঞানী মহাজ্ঞানী মনেপ্রাণে উৎসাহিত করেন নি।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন-"যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে বিবাহ করে, সে তাহার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে; আর স্ত্রী যদি আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া আর একজনকে বিবাহ করে, তবে সেও ব্যভিচার করে।"[১]

তালাক প্রথাকে আমাদের রাসূল (সাঃ) মোটেই উৎসাহিত করেন নি। তিনি বলেছেন যে, তালাক দিলে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কম্পিত হয়। তাঁর এ মহান বাণী হতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ নিজেও খুশি হতে পারেন না। আরশে যা কিছু আছে, এমনকি ফেরেশ্তাকূলসহ তালাক দাতাকে ঘৃণার চোখে দেখে থাকে। এজন্যই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নারী ও পুরুষের প্রতি অনেক উপদেশ দিয়েছেন। নারীদের সম্বন্ধে বলেছেন যে, তাদেরকে পুরুষের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই এদের স্বভাব বক্র। ক্ষমা করাই শ্রেষ্ঠ গুণ। ছেলেদের সম্বন্ধেও অনেক মূলবান তত্ত্ব দিয়েছেন যা পূর্বে উদ্ধৃত করেছি। নিচে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দু-একটি বাণী এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করছিঃ

"বৈধ হওয়া সত্ত্বেও যা আল্লাহর নিকট অপ্রিয় তা হলো তালাক।"[২]

"যে রমণী বিনা কারণে স্বামীর নিকট তালাকের জন্য প্রার্থনা করে, বেহেশ্তের সৌরভ তার জন্য হারাম।"[৩]

"বিশেষ কোন অপ্রিয় কারণ না থাকলে স্ত্রীদিগকে তালাক দিও না। কারণ আল্লাহ্ স্বাদগ্রহণকারী পুরুষকে বা স্বাদগ্রহণ কারিণী স্ত্রীলোককে ভালবাসেন না।"(সগীর)

আমরা ওপরের বাণীগুলো হতে দেখতে পাচ্ছি যে, অপ্রিয় কারণ থাকলে যা স্বামী-স্ত্রীর জীবন বিষময় করে তোলে, একে অপরকে তালাক দিতে পারে। ইসলামের নিয়মানুযায়ী স্ত্রী-স্বামীকে তালাক দিতে পারে তখনি, যখন তার স্বামী অত্যাচারী, লম্পট ও অধার্মিক হয় অথবা স্ত্রীর ভরণ পোষণ দিতে স্বামী অপারগ হয় (মাতাল, নিরুদ্দেশ ইত্যাদি কারণে)। এখান থেকে বুঝা যায় যে, শান্তি প্রতিষ্ঠাই তালাক প্রথার একমাত্র কারণ।

---

[১]. বাইবেল: মার্ক, যীশুর বিবিধকর্ম ও শিক্ষা পরিচ্ছেদ (১০ নং Verse)
[২]. ইমাম, আবূ দাউদ, সুনান, তালাক অধ্যায়, ২য় খন্ড, পৃ.৬৩১; সুনানে কুবরা, বাইহাকী, খ.৭, পৃ.৩৩২।
[৩]. ইমাম আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৬৩১।

Dhaka University Institutional Repository

এবার আমরা দেখব কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রীকে তালাক দেয়া চলে না। এ বিষয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশ কি সেটাও সর্বজাতির জানা প্রয়োজন। কুরআনে আল্লাহ্‌ পাক বলেনঃ

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ.

"যাহারা স্বীয় পত্নীগণ হইতে পৃথক থাকিবার শপথ করে, তাহারা চারিমাস প্রতীক্ষা করিবে। অতঃপর যদি তাহারা প্রত্যাবর্তিত হয় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল করুণাময়, এবং যদি তাহারা তালাক প্রদানের ইচ্ছা করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী এবং তালাক প্রাপ্তাগণ নিজেদের জন্য তিন ঋতু পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে এবং তাহারা যদি আল্লাহ্‌ ও পরকাল বিশ্বাস করে, তবে আল্লাহ্‌ তাহাদের গর্ভে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা গোপন করা তাহাদের পক্ষে বৈধ নহে এবং ইহার মধ্যে যদি তাহার সন্ধি কামনা করে তবে তাহাদের স্বামীই তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে সমধিক স্বত্ববান; এবং নারীগণের উপর তাহাদের যেরূপ স্বত্ব আছে, নারীগণেরও তদনুরূপ ন্যায় সঙ্গত স্বত্ব আছে এবং তাহাদের ওপর পুরুষগণের শ্রেষ্ঠত্ব আছে এবং আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞানময়।"[১]

পূর্বকালে আরবে একটা প্রথা ছিল যে, স্বামী ওপর বিরাগভাজন হয়ে স্ত্রীকে পৃথক করে রাখত কষ্ট দিত। তালাক ও দিত না অথচ তার ভরণ পোষণ ও করত না। এতে স্ত্রীর ভয়ানক কষ্ট হতো। আরববাসীদের এই শপথকে 'ঈলা' বলা হতো। আল্লাহ্‌ এই ঈলার সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন চার মাস। এই চারমাসের মধ্যে স্ত্রীর মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে স্ত্রী যেমন নিজের ভুল বুঝে স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, স্বামীও তেমনি নিজ চরিত্রের দোষ কিছুটা অনুভব করে স্ত্রীর গুণাগুণ দেখতে পায়। সবদেশেই সর্বযুগে এমন ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নির্দেশ বড় সুন্দর এবং সুস্পষ্ট। এই সময়ের মধ্যে দুজন যদি সংশোধিত হয় তবে আবার তারা বিনা দ্বিধায় দাম্পত্য জীবন শুরু করতে পারে। এটা তালাকের মধ্যে গণ্য হবে না। শুধু শপথ

---

১. আল্‌-কুরআন, ২ঃ২২৬-২২৮।

Dhaka University Institutional Repository

ভঙ্গের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা অথবা আলেমদের মতে কাফ্ফারা দিতে পারে। আর যদি কোনক্রমেই মিলনের সম্ভাবনা না থাকে-স্ত্রীর অবাধ্যতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বভাব এ চার মাসে ও বিনষ্ট না হয়ে থাকে তবে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে।

স্বামী যেমন নির্দিষ্ট কারণে স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে, স্ত্রীও তেমনি অনুরূপ কারণে স্বামীকে তালাক দিতে পারে এবং 'ইদ্দত' কাল শেষে সে নারী দ্বিতীয় স্বামীকে গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া স্ত্রী কিছু ধন-সম্পত্তি বা টাকা-পয়সা স্বামীকে দিয়ে তার নিকট থেকে তালাক নিতে পারে। স্বামীকে সন্তুষ্ট করে স্ত্রী যে তালাক গ্রহণ করে শরীয়ত অনুযায়ী তাকে 'খোলা" বলা হয়। এ বিষয়ে কোরআন ও হাদীসের নির্দেশ হলোঃ

"সাধিত-বিন্-কাইসের স্ত্রী নবী (সাঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিল, 'হে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমি সাদিত-বিন-কাইসের কোন দোষ পাই না চরিত্রের বা ধর্মে কিন্তু আমি অকৃতজ্ঞতা করিতে চাই না ইসলামে থাকিয়া।' রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, 'তুমি কি ফিরাইয়া দিতে চাও তাহার বাগান? সে বলিল, 'হ্যাঁ।'

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, "সাধিত তুমি ফিরাইয়া লও তোমরা বাগান এবং তালাক দাও তাহাকে।"[১]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن

تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ○ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعاً حَكِيماً

"এবং যদি তোমরা সম্মিলিত ও সংযমী হও তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল করুণাময় এবং যদি তাহারা উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়, তবে আল্লাহ্ সুপ্রশস্ত মহাজ্ঞাণী।"[২]

স্ত্রী যদি স্বামীকে পছন্দ না করে, তার আচার ব্যবহারে খুশি না থাকে, স্বামীকে দিয়ে যদি তার যৌন-পিপাসা না মেটে, তাহলে জোর করে তাকে স্বামীর ঘর করার কোন বিধান ইসলামে নাই। নর-নারীর শান্তিময় জীবন আল্লাহ ও রাসূলের পছন্দ। জোর করে দাম্পত্য

---

[১] . সহীহ বুখারী, তর্জমা আবদুর রহমান খাঁ, তালাক পরিচ্ছেদ, হাদীস নং-৭/৬৯০; সুহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত, তালাক অধ্যায়, খ.৯, পৃ.৩৯৫।

[২] . আল্-কুরআন, ৪২৯-১৩০।

Dhaka University Institutional Repository

জীবন গড়া যায় না। প্রেমহীন পরিণয় আত্মাহীন দেহের তুল্য। আর তাই ইসলাম দাম্পত্য জীবনের ব্যাপারে নারী-পুরুষ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর মিলমিশের জন্য স্ত্রীর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইলে তাদের সমঝোতার মাধ্যমে তালাক গ্রহণই স্ত্রীর জন্য উত্তম ব্যবস্থা। স্ত্রী তালাক চাইলে বিবাহে স্বামীর যে ব্যয় হয়েছে, উহা দাবি করার অধিকার স্বামীর আছে। তার দাবি-দাওয়া পূরণে অথবা যে কোন উপায়ে তাকে সম্মত করে তালাক লওয়ার বিধান ইসলামে আছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"তবে যদি তাহাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তাহারা আল্লাহর সীমা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না এবং তোমরা যদি আশংকা কর যে, তাহারা আল্লাহর সীমারেখা (বাস্তবিকই) রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবেনা-এমতাবস্থায় স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে (স্বামী হইতে) নিস্কৃতি পাইতে চাহিলে ইহাতে (স্বামী-স্ত্রীর) কাহারো কোন দোষ নাই। এই সকল আল্লাহ্র সীমারেখা। অতএব, তোমরা উহা লংঘন করিও না এবং যাহারা আল্লাহ্র (নির্ধারিত) সীমারেখা লংঘন করে, তাহারাই অত্যাচারী।"[১]

বিবাহের সময় স্ত্রীকে যে মহর প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়, তালাকের পূর্বে তা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। এ ছাড়া স্ত্রীকে যেসব গয়নাপত্র বা সম্পত্তি বিবাহের পর দেওয়া হয় সেগুলো ফিরিয়ে নেয়া বৈধ নয়। কেননা আল্লাহ্ পাক বলেনঃ"তবে তোমরা তাহাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছ তাহা হইতে কিছু প্রতিগ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নহে।"

কুরআনে আল্লাহ্ পাক আরো বলেনঃ

---

[১]. আল্-কুরআন, ২ঃ২২৯।

Dhaka University Institutional Repository

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناًO وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً

"এবং যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করিতে ইচ্ছা কর এবং তাহাদের একজনকে ধনরাশি প্রদান করিয়া থাক, তথাপি তন্মধ্য হইতে কিছু প্রতিগ্রহণ করিও না; তবে কি তোমরা অপবাদ প্রয়োগ এবং প্রকাশ্য গুনাহ্ করিয়া উহা গ্রহণ করিবে? এবং কিরূপে তোমরা উহা গ্রহণ করিবে? বস্তুত তোমরা পরস্পর একে অন্যের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলে এবং তাহারা তোমাদের নিকট সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিল।"[১]

অনিয়মে তালাকের শাস্তিঃ

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলমিশ ও আপোষ-মীমাংসার কোন পথ বের হয়ে আসে কিনা দেখার জন্যই তিন তালাকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একবারেই তিন তালাক দিলে এর কোন সুযোগ থাকে না। বর্ণিত আছে একবারে যারা তিন তালাক দেয়, হযরত উমর (রাঃ) তাগিগকে দুর্‌রা মারতেন। একবারে যে ব্যক্তি স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, তার সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা) কে বিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেনঃ

আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণের অপরাধে সে ব্যক্তি অপরাধী।

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ভরণ-পোষণঃ

শেষ তালাকের পরই স্ত্রীকে ঘর হতে বের করে দেয়ার অনুমতি ইসলাম স্বামীকে দেয় না; বরং তার প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ইদ্দত (অপেক্ষাকাল) শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে গৃহের বের করা যাবে না। এই সময়ে তার ভরণ-পোষণ করাও স্বামীর দায়িত্ব। আর এই সময়ে সে-স্বামীর বাড়ীতেই পৃথক গৃহে অবস্থান করবে, অন্যত্র যাবে না এবং স্বামী-স্ত্রী তখন কেহ কারও সহিত দেখা সাক্ষাত করতে পারবে না।

তালাক হওয়ার পর যে সময়ের মধ্যে নারী পুনরায় অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না, তাকে ইদ্দত বলে। এই ইদ্দত তিনিটি মাসিক ঋতুকাল অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত। আর

[১]. আল্-কুরআন, ৪ঃ২০-২১।

যারা হায়েয হতে নিরাশ হয়েছে এবং যাদের এখনও হায়েয আসে নাই, তাদের ইদ্দত হল তিনটি চন্দ্রমাস। তালাকের সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকলে তার ইদ্দত হল গর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেনঃ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ

আর যে সকল স্ত্রী লোককে তালাক দেয়া হয়েছে তাহারা তিনটি মাসিক ঋতু পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।[১]

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রমাণীত হয় যে, দাম্পত্য জীবনে তালাকের ব্যাপারে ইসলাম নারীকে যথেষ্ট স্বাধীনতা প্রদান করেছে যা অন্য ধর্মে দৃষ্ট হয় না।

কন্যা বা পুত্র সন্তান জন্মের ব্যাপারে ইসলামে নারীর দায় মুক্তিঃ

কোন দম্পত্তির সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে এ দায়িত্ব কার? অনেক পরিবারের ক্রমাগত কন্যা সন্তান হলে স্বামীর অভিভাবকবৃন্দ অথবা তিনি নিজেই পুত্র সন্তান লাভের আশায় আর একটি বিবাহ করতে উদ্যত হন। অনেক সময় নারীকে শারীরিক নির্যাতন করে, এমনকি তালাক পর্যন্ত দিয়ে দেয়। কিন্তু মেয়ে সন্তান হওয়ার ব্যাপারে নারীর কোন হাত নেই। এখানে সৃষ্টিকর্তা মানুষের মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব চালু রেখেছেন। যার দায়ভার নারীর উপর বর্তায় না।

'জিন' (genes)এবং ক্রোমোসম (Chromosoms), সম্পর্কীয় অজ্ঞতার কারণেই সমাজে এ ধরণের কুসংস্কার চলে এসেছে এবং এজন্য নারীকে দায়ী করা হয়। পুরুষের বীর্যের মধ্যে X এবং Y-এ দুজাতের ক্রোমোসম থাকে। নারীর ডিম্বে শুধুমাত্র 'X' প্রকৃতির ক্রোমোসম থাকে।

পুরুষের বীর্য যৌন ক্রিয়ার ফলে নারীর ডিম্বকোষের দিকে যেতে থাকে। যদি পুরুষের Y জাতের ক্রোমোসম সম্বলিত শুক্র দ্রুতবেগে এগিয়ে গিয়ে নারীর X জাতীয় ক্রোমোসমের ডিম্বের সাথে মিলিত হতে পারে, তবে পুরুষ সন্তানের জন্ম হবে। অর্থাৎ পুরুষ সন্তানের জন্মের জন্য দায়ী পুরুষের প্রয়োজন X এবং Y জাতীয় ক্রোমোসম। যদি সহবাসের সময়

---

[১]. আল্-কুরআন, ২ঃ২২৮।

পুরুষের বীর্যের Y জাতীয় ক্রোমোসম মার্কা শুক্রকীট নারীর X ক্রোমোসম মার্কা ডিম্বের সাথে মিলিত হয়, তবে কন্যা সন্তান হবে।

নারী পুরুষের XY ক্রোমোসম জাতীয় শুক্র এবং ডিম্বানুর মিলনে হয় পুরুষ সন্তান, আর উভয়টি X অর্থাৎ দুইটি XX মার্কা ক্রোমোসম জাতীয় ডিম্বানুর শুক্রকীটের মিলনে হয় কন্যা সন্তান।

সহজে বোঝার জন্য আরো একটু বিস্তারিত ভাবে এবং দ্বিরুক্তি করে কল্পিত উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করতে পারি। ধরে নিই Y মার্কা ক্রোমোসম পুরুষ জাতীয় এবং X মার্কা ক্রোমোসম নারী জাতীয়, পুরুষের বীর্যে একই সঙ্গে X মার্কা ও Y মার্কা উভয় ক্রোমোসমই থাকে। Y মার্কা ক্রোমোসমের কারণে হয় পুত্র সন্তান এবং X মার্কা ক্রোমোসমের কারণে হয় কন্যা সন্তান।

সন্তান জন্মের জন্য নারী পুরুষ দু'জনেরই ডিম্ব এবং বীর্যের দরকার হয়। পুরুষের বীর্য হতে যদি X মার্কা ক্রোমোসোম গিয়ে নারীর X মার্কা ডিম্বের সাথে মিলিত হয় তবে সন্তান হবে কন্যা। নারীর ডিম্বে কোন Y মার্কা বা পুরুষ জাতীয় ক্রোমোসম থাকে না, তা আসবে পুরুষের শুক্র থেকে। পুরুষের বীর্য থেকে যদি Y মার্কা ক্রোমোসম নারীর ডিম্বানুতে প্রবেশ করতে না পারে, বা প্রত্যেকবারই যদি X মার্কা ক্রোমোসমই প্রবেশ করে তবেক দুটি X এর মিলনে কন্যা সন্তান হবে। পুত্র সন্তান হয় নারীর X জাতীয় ক্রোমোসমের সাথে পুরুষের Y জাতীয় ক্রোমোসমের মিলনে।

নারীকে কন্যা সন্তান জন্মের জন্য পুরুষের অজ্ঞতার কারণেই অহেতুক দায়ী করা হয়। পুরুষের দেহ হতে কি X জাতীয় ক্রোমোসম নারী দেহে যাবে অথবা Y জাতীয় ক্রোমোসম যাবে, তা একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাই জানেন। এতে যার পুত্র সন্তান হয় না তার করণীয় কিছুই নেই। ইচ্ছা করে কোন পুরুষ সহবাসের সময় তার দেহ হতে Y জাতীয় বা পুরুষ ক্রোমোসমের শুক্র নারী দেহের ডিম্বে স্বীয় প্রচেষ্টায় প্রবেশ করাতে পারে না।

বিজ্ঞানীরা আজকাল চেষ্টা করেছেন পুরুষের Y এবং X জাতীয় শুক্রকীটকে ল্যাবরেটরীর পরীক্ষার মাধ্যমে আলাদা করে নিতে। যদি এরূপ গবেষণা সফল হয়, তবে কৃত্রিম প্রজননের

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে শুধুমাত্র Y জাতীয় ক্রোমোসমের শুক্র নারী দেহে প্রবেশ করিয়ে পুরুষ সন্তান প্রাপ্তি সম্ভব হবে পারে।

কন্যা সন্তানের ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ

মেয়ে সন্তানদের ঘৃণা করো না। তারাই তোমাদের নয়ন শান্তিকর আনন্দদায়ক আপনজন।(আহ্‌মদ, আল্-তিবরানী)

রাসূল (সাঃ) আরও বলেছেন, 'প্রথম সন্তান কন্যা হওয়া মায়েদের জন্য একটি সৌভাগ্য।(মারদাবী, ইবনে আছাকীর)

রাসূলে করিম (সাঃ) আরো বলেনঃ 'যে ব্যক্তি এই কন্যাসন্তানের জন্মে অসুবিধায় পড়ল, সে যদি তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে, তাহলে এই মেয়েরা তাদের জন্য জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার কারণ হবে।'(বুখারী, মুসলিম)

পুত্র সন্তান বা কন্যা সন্তান জন্মের ব্যাপারে কুরআনে আল্লাহ বলেছেনঃ

لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ

"তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।[৪]

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে- পুত্র বা কন্যা সন্তান জন্মের ব্যাপারে নারীর কোন হাত বা দায় নেই, এ ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এভাবে ইসলামে নারীকে কন্যা সন্তান জন্মদানের দায়ভার থেকে মুক্তি প্রদান করেছে।

---

[৪] . আল্-কুরআন, ৪২:৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকান্ড

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকান্ড

নারীর ধর্ম পালনের অধিকারঃ

ইসলামের ধর্মীয় দিগন্তে নারী এবং পুরুষের সমান অধিকার রয়েছে। এবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধতা নেই। নিপীড়িত, নির্যাতিতা নারী জাতি কতোভাবেই না লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েছে অন্যান্য ধর্মে। কেউ তাদের বলত শয়তানের যন্ত্র, কেউ বলত কামড়ানো বিচ্ছু; কেউ বা বলত খল, ভীমরুল, বোলতা ও বিষাক্ত সাপ, বাধা দেয়ার কেউ ছিল না। প্রতিবাদ করার কারো সাহস ছিল না। পথে-ঘাটে ধর্ষিতা হতো, স্বামীর ঘরে পশুর মতো মার খেত, সমাজের বিচারে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিত। প্রাণের ভয়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে নিবেদন জানাবে সে সুযোগ ও ছিল না। বেদবাণী শুনলে কানে গরম সীসা ঢেলে দেয়া হতো। আঁতুর ঘরে থাকলে নারী অস্পৃশ্যা হতো।

কিন্তু ইসলাম দিল নারীর ধর্মের অধিকার। ইসলাম ধর্মে নারী আল্লাহ্‌র এবাদত করে যে কোন স্তরে উন্নীত হতে পারে। পবিত্র আল্-কুরআনে বলা হয়েছেঃ

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً.

"নিশ্চয় আত্মসমর্পণকারীগণ ও আত্মসমর্পণকারীণীবৃন্দ এবং বিশ্বাসীগণ ও বিশ্বাসীনী বৃন্দ এবং অনুবর্তীগণ ও অনুবতিনীবৃন্দ এবং সত্য পরায়ণ ও সত্যপরায়ণাবৃন্দ এবং ধৈর্যশীলগণ ও ধৈর্য্যশীলাবৃন্দ এবং বিনীতগণ ও বিনীতাবৃন্দ এবং দানশীলগণ ও দানশীলাবৃন্দ এবং উপবাসকারীগণবৃন্দ ও উপবাসকারিণী ও গুপ্তাঙ্গ সংরক্ষণকারীগণ এবং সংরক্ষণকারিণীবৃন্দ এবং আল্লাহকে অধিকতর স্মরণকারীগণ ও স্মরণকারিণীবৃন্দ ইহাদের জন্য আল্লাহ্ ক্ষমা ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।"[১]

[১]. আল্-কুরআন, ৩৩ঃ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

ওপরে বর্ণিত কোরআনের আয়াত থেকে আমরা পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহ পাক পুরুষ ও নারীকে এক সঙ্গেই সম্বোধন করেছেন যারা তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে সৎকর্ম করছে এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী চলছে।

নারীর জন্যও যে ধর্মের প্রয়োজন, নারীর কর্তব্য ও যে পুরুষের মতোই, নারীর প্রতিদান ও যে পুরুষেরই অনুরূপ-এ কথাই তিনি বুঝিয়ে দিয়ে নর-নারীর পার্থক্যের যেমন অবসান করেছেন, তেমন তাদের উৎসাহিত করে ধর্মের পথে তুলে দিয়েছে। যারা মনে করত নারী উপাসনার জন্য নয়, সৎচিন্তার জন্য নয়, দান করে পূণ্য অর্জনের জন্য নয় তাদের অন্ধ চিন্তাধারাকে এ বাণী নির্মূল করে দিয়েছে এবং নারীদের ধর্মের স্বাধীনতাকে ঘোষণা করেছে। এরূপ বাণী কোরআনে আমরা আরও বহু স্থানে দেখতে পাই।

অন্য আয়াতে কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ.

"পুরুষ বা নারী ইহাতে যে সৎকার্য করে এবং সে বিশ্বাসীও হয় তবে নিশ্চয় আমি তাহাকে পবিত্র জীবনে জীবিত রাখিব এবং তাহারা যে সৎকার্য করিয়াছিল, তৎপরিবর্তে নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে প্রতিদান প্রদান করিব।"[১]

ইসলামের যে পাঁচটি স্তম্ভ আছে কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত-এর প্রত্যেকটিতেই নারীর সমঅধিকার রয়েছে। এসবক্ষেত্রে নারীর দায়িত্ব পুরুষ স্কন্ধে বহন করে নারীদের মুক্তি দেবে বা পার করবে এ ক্ষমতা পুরুষের নেই। পাহাড়সম পুণ্য অর্জনে নারীর কোন বাধা নেই। সুদূর আরবের কাবা ঘরে গিয়ে হজ্বব্রত পালন করবে, পুরুষের সঙ্গে অনাবৃত মস্তকে কাবা প্রদক্ষিণ করবে, আল্লাহর কাছে হাত তুলে মোনাজাত করবে, এতে নারীর কোনই দোষ নেই। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এ অধিকার নারীদের দিয়েছেন। সাম্যবাদের ঝড়-তুফান তুলে নারীরা যে অধিকার চায় ইসলাম তা পুরণ করেছে তাদের ধর্মীয় জীবনে। হাদীসেও নারীর ধর্মীয় স্বাধীনতার বর্ণনা আছে।

[১]. আল্-কুরআন, ১৬ঃ৯৭।

শিক্ষা-দীক্ষা, কোরআন তেলাওয়াত, নামাজ, রোজা ও যাকাতে নারী-স্বাধীন। হযরত (সাঃ) এর সময় নারীরা ফজরের নামাজে সমস্ত শরীর আবৃত করে পুরুষের সঙ্গে মসজিদে গমন করতেন। এশার নামাজেও অনেক নারী মসজিদে গমন করতেন।(বুখারী)

ইসলাম ধর্মে নারীদেরকে ধর্মের ব্যাপারে অনেক স্বাধীনতা দিয়েছে। এমনকি আনুষ্ঠানিক ভাবে পালনকৃত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ও নারীর অংশগ্রহণে তেমন কোন বাধা নেই। আব্রু রক্ষা করে তারা সে সকল ধর্মীয় কর্ম কান্ডে যোগ দিত।

হযরত ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, "স্ত্রী (মসজিদে আসিবার) অনুমতি চাইলে, স্বামী যেন নিষেধ না করে।"[১]

স্ত্রীদের মসজিদে যাবার ব্যাপারে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নির্দেশ নিম্নরূপঃ

অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছেঃ "যদি রাত্রিকালে মসজিদে যাইতে তোমাদের স্ত্রীরা অনুমতি চায় তবে অনুমতি দিবে।[২]

উক্ত নির্দেশ পেয়ে নারীরা অনেকেই জামাতে নামাজ পড়তে মসজিদে গমন করতেন। অনেকের নির্দেশটি মনোমত না হলেও স্ত্রীদের মসজিদে গমনে বাধা দেবার সাহস তাদের হয় নি এ তত্ত্বটিও মেলে ইবনে ওমরের বর্ণনা হতে।

তিনি বর্ণনা করেছেন, "হজরত ওমর (রা) এর স্ত্রী রাত্রির ও ভোরের নামাজে মসজিদে যাইতেন। তাহার স্বামী ইহা পছন্দ না করিলে ও কখনও নিষেধ করিতে সাহসী হন নাই। কেননা হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, 'আল্লাহর দাসীদিগকে আল্লাহর মসজিদে যাইতে নিষেধ করিও না।"[৩] ইহা শুনে ইবনে ওমরের পুত্র বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি ইহাতে নিষেধ করিব। ইবনে ওমর এতে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে তিরস্কার করেন এবং সারাজীবন তার সঙ্গে কথা বলেন নি।"(মুসলিম, ইবনে মাজাহ্, আহম্মদ সালিম)

হযরত উম্মে সালমা বর্ণনা করেছেন-"নারীরা পুরুষের পশ্চাতে থাকিয়া নামাজে যোগ দিতেন। সালাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা মসজিদ হইতে সত্বর চলিয়া যাইতেন।

---

[১]. ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৩২৬।
[২]. ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৩৫।
[৩]. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁহার শিষ্যেরা সালাম উচ্চারণের পর কিছুক্ষণ বসিয়া অপেক্ষা করিতেন, পরে অন্য নামাজ পড়িতেন।"[১]

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও জুম্মার নামাজে নারীদের যোগদান ইচ্ছাধীন ছিল। বাধ্যবাধকতা কিছু ছিল না। কেননা নারীরা পুরুষের মতো মুক্ত নয়। রজঃস্বলা, গর্ভবতী, স্তন্যদান ও গৃহকর্মে জড়িত থাকাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু দুই ঈদের নামাজে সমস্ত ধরণের মেয়েদেরই যোগদানের নির্দেশ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দিয়েছে। এ তত্ত্বটি মেলে তার নিম্নোক্ত বাণী হতে-

নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ "সকল নারী এমনকি রজঃস্বলা ও অন্তঃপুরবাসিনী যুবতীরা পর্যন্ত যেন ঈদের ময়দানে যায় এবং মুসলমানদের জামাত ও দোয়ায় যোগদান করে। তবে রজঃস্বলা স্ত্রীলোকের নামাজের স্থান অন্য সকলের স্থান হইতে পৃথক থাকিবে।" একজন স্ত্রীলোক বলিল, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যদি কোন স্ত্রীলোকের চাদর না থাকে? তিনি উত্তর দিলেন, 'তাহার সঙ্গিনী তাহাদের চাদর দিবে।'[২]

ঈদ ও জুম্মার নামাজে যোগদানের প্রশ্নে অনেকেরই মনে কিছুটা গোলক ধাঁধা বাঁধার সম্ভাবনা। আমাদের দেশে কোথাও এ প্রথা দেখা যায় না। কিন্তু ইসলাম নারীদের সে অধিকার দিয়েছে। বিশেষ বিধানের সঙ্গে পুরুষ নারীদের জামাতে ইমামতি করতে পারত। হযরতের সময়ে নারীরা নারীদের জামাতে ইমামতি করত। হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) (হযরতের পত্নীদ্বয়) তারাবীর নামাজে ও ফজরের নামাজে স্ত্রীলোকদের ইমামতি করতেন।[৩]

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইসলাম নারীদের ধর্ম পালনের বেশ অধিকার দিয়েছে। দ্বীনের দাওয়াত এবং ধর্মীয় অন্যান্য ক্রিয়াকর্মে তাদের পূর্ণ অধিকার আছে। আল্-কুরআনে বলা হয়েছেঃ

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

[১]. ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.২৯০।
[২]. ইমাম বুখারী, সহীহ,প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৩৩১।
[৩]. ইবনে শয়বাঃ প্রভৃতি হতে মৌলানা আব্দুল হাইয়ের উমরাতুর রীআয়াঃ টীকায় উল্লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

মুমিন নর-নারী একে অপরের বন্ধু। তারা সৎকাজে নির্দেশ দেয়, অসৎ কাজ নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়। আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করে তাদের প্রতি আল্লাহ্ দয়া পরবশ হবেন।[১]

উপরোক্ত আয়াত হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে ইসলাম নারীর ধর্ম পালনের যথাযথ অধিকার বা স্বাধীনতা দিয়েছে।

ইসলামী বিপ্লবে নারীর অংশ গ্রহণের সুযোগঃ

মহানবী (সাঃ) এর যুগের কোন কোন নারীর ধারণা হলো যে, ইসলামের নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুষের অবদান হবে বেশী। তাঁরা রাসূলের নিকট গমন করে সম্মুখে বসে থাকতে পারেন এবং আনুগত্যের শপথ নিতে পারেন।

নারীদের পক্ষে যে কোন সময় মহানবী (সাঃ) সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হওয়া অসুবিধাজনক। তারা পুরুষের ন্যায় ইসলামের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে পারে না।

কয়েকজন নারী আল্লাহ্র নবী (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন তারাও কি পুরুষের ন্যায় জীনের সর্বক্ষেত্রে আনুগত্যের শপথ নিতে পারেন? মহানবী (সাঃ) তাদেরকে জানালেন যে, তাদেরও পুরুষের অনুরূপ অধিকার আছে।

রাসূল (সাঃ) তিনি মেয়েদের বায়াত গ্রহণ বা আনুগত্যের শপথ নেয়ার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিলেন, যেদিন তারা এসে দ্বীনি জীবন যাপনের "বায়াত" বা আনুগত্যের শপথ নিতেন।

এ সম্পর্কে আল্-কোরআনে বলা হয়েছেঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

[১]. আল্-কুরআন, ৯ঃ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

হে নবী (সাঃ)! মোমিন নারীগণ যখন আপনার নিকট এসে 'বায়াত' করে এ মর্মে যে তারা আল্লাহ্‌র সংগে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যাভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না এবং কুৎসা রটনা করে বেড়াবে না, সৎকাজে 'বায়াত' বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন।[১]

কৃতকর্মের শাস্তি এবং পুরস্কারের ব্যাপারে নারী-পুরুষের মধ্যে ইনসাফ করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে শারীরিক দুর্বলতার কারণে নারীকে কম শাস্তি দেয়া হয়। আল্-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ

অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষ অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না। তোমরা একে অপরের অংশ।[২]

আল্-কোরআনে আরও বলা হয়েছেঃ

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً

নারী বা পুরুষ কেহ সৎকাজ করলে ও মুমিন হলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাঁদের প্রতি এক অণু পরিমান ও জুলুম করা হবে না।[৩]

স্বামীর পূণ্য বা পাপের কারণে স্ত্রী পুরস্কৃত হবে না এবং শাস্তিও পাবে না, তাঁরা নিজেদের আমলের জন্যই পুরস্কৃত হবে অথবা শাস্তি পাবে। ফেরাউন ছিল আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং ধর্মত্যাগী অভিশপ্ত। কিন্তু তার স্ত্রীকে আল্লাহ মুমিনদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। একজন কাফেরের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাকে শাস্তি পেতে হবে না, বরং আল্লাহ মুমিনদের জন্য ফেরাউন পত্নীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। আল্-কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.

---

১. আল্-কুরআন, ৬০ঃ১২,

২. আল্-কুরআন, ৩ঃ১৯৫,

৩. আল্-কুরআন, ৪ঃ১২৪,

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ মুমিনদের জন্য উপস্থিত করেছেন ফেরাউন পত্নীর দৃষ্টান্ত যে প্রার্থনা করেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং আমাকে উদ্ধার কর ফেরাউন ও তার দুস্কৃতি হতে এবং জালিম সম্প্রদায় হতে।[১]

অন্যদিকে নবী পত্নী হওয়ার কারণে ও কোন নারীকে তার অপরাধের জন্য ক্ষমা করা হবে না। এ দু'জন পথ ভ্রষ্টা নারী ছিলেন হযরত নূহ্ এবং লুৎ(আ)-এর পত্নী। তাদের সম্বন্ধে আল্-কুরআনে বলা হয়েছেঃ

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ

فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ

আল্লাহ কাফেরদের জন্য নূহ (আ) এবং লুৎ (আ) এর স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করছেন। ওরা ছিল আমার দুই সৎকর্মশীল বান্দার অধীন। কিন্তু তারা নবীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে নূহ্ এবং লুৎ (আ) তাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারত না এবং তাদেরকে বলা হবে জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সংগে তোমরাও উহাতে প্রবেশ কর।[২] সুতরাং আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ইসলাম নারীকে ইসলামী বিপ্লবে অংশ গ্রহণেরও সুযোগ করে দিয়েছে।

জেহাদের ব্যাপারে সমতাঃ

দেশ ও ধর্ম রক্ষায় ইসলাম নারী পুরুষকে সমভাবে দায়িত্ব দিয়েছে। জেহাদের দায়িত্ব শুধু পুরুষের উপর নয়, নারীর উপরও। আল্লাহ্ বলেছেনঃ

انْفِرُواْ خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

অভিযানে বের হয়ে পড়ে হালকা অবস্থায় হোক ভারী অবস্থায় হোক (রণসম্ভার বেশী হোক, কম হোক)। সংগ্রাম করো আল্লাহ্র পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে।[৩]

---

১. আল্-কুরআন, ৬৬ঃ১১,
২. আল্-কুরআন, ৬৬ঃ১০,
৩. আল্-কুরআন, ৯ঃ৪১,

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আয়াত নারী এবং পুরুষের উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। তবে নারীরা তাদের শক্তি সামর্থ মত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে। তাদের আশ্বারোহী হয়ে এবং অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা ইসলাম আরোপ করেনি।

মুসলিম নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষের সহযাত্রী হতো। তারা যোদ্ধাদেরকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করতো। তাদের কাজ ছিল আহতদের সেবা-শুশ্রুষা করা, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মৃতদের সরিয়ে নেয়া, যোদ্ধাদেরকে অস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধসামগ্রী সরবরাহ করা। এরূপ দায়িত্ব পালনে তাদেরকেও মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে হতো।

বিবাহিতা মহিলাগণ যুদ্ধে অংশগ্রহণের পূর্বে স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করতো। অবিবাহিতাদের তেমন বাধ্য বাধকতা ছিল না। যে সমস্ত ক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রচন্ডতা তীব্র হতো, সকল নারীই তখন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতো। অস্ত্রনিয়েও শত্রুকে আক্রমন করতো। নারী বলে তারা পিছু হটে থাকতো না। ধর্ম ও দেশ রক্ষায় তারা পুরুষের ন্যায় মৃত্যুবরণ করতো।

মহীয়সী মহিলা খানছা নিজে উপস্থিত থেকে তাঁর সন্তানদেরকে জেহাদে উৎসাহিত করতেন। তিনি তাঁর ৪টি সন্তানকে নিজে উপস্থিত থেকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় উৎসর্গ করেছেন। তাদের মৃত্যুর খবর পেয়ে অশ্রু বিসর্জন করেছেন। কিন্তু সংগে সংগে শুকরিয়া আদায় করেছেন এই বলে, আল্লাহর রাস্তায় তাদের শাহাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে সম্মানিত করেছেন। যদিও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও লড়াইয়ের দায়িত্ব প্রতিটি মুসলমানের উপর ন্যাস্ত এবং শুধু পয়গাম্বর (সাঃ) এ জন্য আদিষ্ট নন।[১]

অহুদ যুদ্ধে একজন মহিলা সাহাবীর বীরত্ব গাঁথা অমর হয়ে আছে। তিনি হলেন সাহাবীয়া নাসিবা বিনতে কা'ব। অহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয়ের পর বহু সংখ্যক দুশমন আল্লাহর নবীকে একযোগে আক্রমন করে। আক্রমন কালে তারা তলোয়ার, বল্লম এবং তীর ব্যবহার করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাসূল (সাঃ) কে হত্যা করা।

এই সংকটময় অবস্থায় নাসিবা বিনতে কা'ব তলোয়ার এবং তীর নিয়ে শত্রুর সংগে মরণপণ যুদ্ধ করেছিলেন। আহত হয়েও তিনি ওহ! আমার মোহাম্মদ বলে চিৎকার করেছিলেন। দেহে বহু সংখ্যক আঘাতের ফলে তার প্রচুর রক্তপাত হয় এবং তিনি মাটিতে পড়ে যান।

---

[১]. নিউজ লেটার, ২৮ তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ইরান দূতাবাস, মার্চ-এপ্রিল, ২০০৬, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৭।

কিন্তু যখন তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নেয়া হয় তখন ও তিনি জিজ্ঞাসা করতে থাকেন আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) কি দুশমনের থেকে নিরাপদ হয়েছেন?[১]

সূতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইসলাম নারীদেরকে প্রয়োজনে জেহাদে অংশগ্রহণের ব্যাপারেও পুরুষের ন্যায় সমতা প্রদান করেছে।

আল রা'বী বিনতে মু'য়াজ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমাদের কাজ ছিল যোদ্ধাদেরকে পানি পান করানো এবং তাদের সেবা করা। আহত ও মৃতদেরকে আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দিতাম এবং মদিনায় পাঠিয়ে দিতাম।[২]

তখনকার দিনে পুরুষ সাহাবীগণই কাফেরদের মধ্যে যারা বন্দী হতো তাদের পক্ষে সুপারিশ করতেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মহিলাদেরকেও একইরূপ অধিকার দান করেন।

নবী করীম (সাঃ) এর নেতৃত্বে ছয়টি যুদ্ধে যোগদান কারী একজন মহিলা সাহাবী বলেছেনঃ

كنا ندا وى الكلى ونقوم على المرضى.

আমরা আহতদের জখমের ওপর ব্যান্ডেজ করতাম এবং রোগাক্রান্তদের চিকিৎসা বা সেবা-শুশ্রুষা করতাম।[৩]

সবচেয়ে বড় কথা এই মহিলারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের জন্য বিশেষ সম্মান ও পরকালের মহা কল্যাণ লাভের উপায় মনে করে এই সব কাজে অংশগ্রহণ করত। সুতরাং ইসলামে নারীদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণে সুযোগ করে দিয়ে তাদের যথাযথ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

স্বাধীন মত প্রকাশ ও পরামর্শ দানের অধিকারঃ

উপরোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, ইসলামী সমাজের ভাল-মন্দ ও লাভক্ষতির ব্যাপারে মুসলিম মহিলারা কখন ও নিঃসম্পর্ক বা নীরব-নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকতে পারে না। কেননা সমাজের ভাঙ্গা-গড়া, উন্নতি-অবনতি ও কল্যাণ-অকল্যাণের সাথে নারী-পুরুষ সকলেরই নিবিড় ও অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান। আবার সমাজের কল্যাণ সাধিত

১. Ibn Kathir Al-Bidayah, vol-42, pp. 34, 35.
২. ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.১০৫৬।
৩. ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল কুশায়রী, সহীহ, আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি., সহীহ, জিহাদ অধ্যায়, হাদীস নং-১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

হলে তার সুফল নারী সমাজ ও সমানভাবে ভোগ করে। এমতাবস্থায় কল্যাণ সাধনের কাছ থেকে কিছুতেই দূরে সরে থাকতে পারে না। সমাজ জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে তা ব্যক্তিগত হোক বা সামাজিক-সমষ্টিরই হোক নিজেদের অভিমত ও হৃদয়াবেগ প্রকাশের অবাধ অধিকার ইসলামে সর্বোতভাবে স্বীকৃত। মৌখিক ভাবে প্রকাশ, লেখনী চালানো ইত্যাকার যে কোন উপায়ে হোক, নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে এই মত প্রকাশের অধিকার ইসলামে তারা অনায়াসে ভোগ করতে পারবে। এই অধিকার থেকে কেউই তাদের বঞ্চিত রাখতে পারে না।

নারীদের একান্ত নিজস্ব ব্যাপারে বিয়ে, খোলা তালাক গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে-ইসলামী শরীয়াত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, অন্য কেউ নিজের সিদ্ধান্ত তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারে না। এ পর্যায়ে যা কিছু করা হবে, তা করতে হবে তাদের মতের ভিত্তিতে।

রাসূলে করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

একবার বিবাহিতা নারীকে বৈধব্য বা তালাক প্রাপ্তির পর পুনরায় বিয়ে দেয়া যাবে কেবল মাত্র তখন, যখন সে তা করার পরামর্শ দেবে। অনুরূপভাবে কুমারী মেয়েকে বিয়ে দেয়া যাবে শুধুমাত্র তার অনুমতি পাওয়ার পর।[১]

ইয়াতীম মেয়েদের বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে ও সর্বপ্রথম তাদের সাথে পরামর্শ করতে হবে। কেননা তারা ইয়াতীম বলে বহু উদ্দেশ্য পরায়ণ স্বার্থপর ব্যক্তি তাদের ওপর নানাভাবে জুলুম-নির্যাতন চালাতে পারে, শরীয়াতের দেয়া অধিকার থেকেও তাদের বঞ্চিত করতে পারে; তাদের বিয়ে নিয়ে টালবাহানা করতে পারে। এ কারণে বিশেষভাবে তাদের মতামত নিয়েই তাদের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে, এর পূর্বে নয়।

ইসলামী শরীয়াত যে নারীকে যাবতীয় ব্যাপারে দায়িত্বশীল বানিয়েছে, তা এভাবেই তাদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দিয়ে কার্যকর হতে পারে।

রাসূলে করীম (সাঃ) আরও বলেছেনঃ اَمِرُوا النِّسَاءَ فِىْ بَنَا تِهِنَّ.

স্ত্রীলোকদের সাথে তাদের কন্যাদের ব্যাপারে পরামর্শ কর।

বস্তুতঃ জীবনের যে সব ব্যাপারে স্ত্রীলোকেরা অন্যদের তুলনায় অধিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী, তুলনামূলকভাবে ভাল ও বেশী জানে, যেসব ব্যাপারে তাদের সেই জ্ঞান ও

---

[১] . আহমদ ইবন হাম্বল, মুসনাদে আহম্মদ, প্রাগুক্ত, বিবাহ অধ্যায় খ.১, পৃ.২১৯; ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.১৯৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে সমাজকে উপকৃত হতে হবে। নারী সমাজের সাথেও পরামর্শ করা এবং তাদের মতামত জানা ছিল রাসূলে করীম (সাঃ)-এর একটা স্থায়ী রীতি। হযরত হাসান বসরী বলেছেনঃ নবী করীম (সাঃ) প্রায়শঃই পরামর্শ করতেন, এমনকি স্ত্রীলোকদের সাথেও। তাদের পরামর্শও তিনি গ্রহণ করতেন।[১]

এই পরামর্শ গ্রহণের ব্যাপারে কোন বিষয় নির্দিষ্ট ছিল না। জীবনের যাবতীয় ব্যাপারেই তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা হত। তাতে কোন একটা দিকও বাদ পড়ত না।

হুদাইবিয়ার সন্ধির একটি শর্ত ছিল, এই বছর মুসলমানরা উমরা না করেই ফিলে যাবে। তাই রাসূলে করীম (সাঃ) সাহাবায়েকিরাম (রাঃ) কে হুদাইবিয়াতেই ইহরাম খুলে ফেলা ও সঙ্গে করে নিয়ে আসা পশুগুলো জবাই করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সাহাবাগণ যেহেতু এ সন্ধি ও সন্ধির শর্তসমূহ দেখে বিশেষ ভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন, সে কারণে তাঁরা কেউ রাসূলে করীম (সাঃ) এর এই নির্দেশ পালনে কোন তৎপরতাই দেখালেন না। এইরূপ অবস্থা দেখে রাসূলে করীম (সাঃ) হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এর নিকট দুঃখ প্রকাশ করলেন। তিনি সাহাবাদের মনস্তত্ত্ব লক্ষ্য করে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে পরামর্শ দিলেনঃ "আপনি এরপর কাউকে আর কিছুই না বলে যা কিছু করার আপনি নিজেই অগ্রসর হয়ে করে ফেলুন। দেখবেন, সকলেই আপনার দেখাদেখি সব কাজই করবেন। তখন আর কেউ আপনার আদেশ পালনে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হবে না।"

রাসূলে করীম (সাঃ) এই পরামর্শ সানন্দে গ্রহণ করলেন এবং যখনই তিনি করণীয় সব কাজ করলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) ও তাঁর অনুসরণ শুরু করে দিলেন। এভাবে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)এর যথার্থ ও সুচিন্তিত পরামর্শ উপস্থিত অচলাবস্থা দূর করতে সক্ষম হল এবং বাস্তবভাবে প্রমাণ করে দিল যে মহিলাদেরও যথেষ্ট জ্ঞান বুদ্ধি আছে এবং তাদের পরামর্শ জাতীয় জীবনের অনেক সমস্যারই সমাধান করতে সক্ষম।[২]

সুতরাং ইসলাম পরামর্শদানের ক্ষেত্রেও নারীদের পিছিয়ে রাখেনি। রাসূলে করীম (সাঃ) এর পর খুলাফায়ে রাশেদীন ও তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে মহিলাদের দেয়া পরামর্শ গ্রহণ করতেন। একটি বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ

---

[১]. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ'আস সাজিসতানী, সুনান আবূ দাউদ, কানপুর, আল-মাত্বা'আ, আল-মদীদী, ১৩৭৫ হি. নিকাহ অধ্যায়, ২৩ নং পরিচেছদ; ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, কায়রো, মাত'আ আশ্শারকিল ইসলামিয়া, ১৯৯৫, খ.২, পৃ.৩৪।

[২]. ইমাম বায়হাকী, আস্ সুনানুল কুবরা, বৈরুত, দারুল ফিকর, তারিখ বিহীন, খ.১, পৃ.১৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উমর (রাঃ) অগ্রবর্তী সামষ্টিক বিষয়াদিতে মত দিতে সক্ষম লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। এমন কি এই ধরণের ব্যাপারে বিবেক বুদ্ধির অধিকারীণী কোন মহিলা হলেও তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। তাঁর দেয়া পরামর্শে কল্যাণের কোন দিক দেখতে পেলে কিংবা কোন ভাল পছন্দনীয় জিনিস পেলে তা তিনি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতেন।(السنت الكبرى بيهقى)

হযরত শিফা (রাঃ) হিজরতের পূর্বেই ঈমান এনেছিলেন। তিনি নবী করীম (সাঃ) এর নিকট বায়'আতও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বুদ্ধি বিবেচনায় খুবই মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। জীবনীকার ইবনে আবদুল বার লিখেছেনঃ

হযরত উমর (রাঃ) পরামর্শ দান ও মত প্রকাশে তাঁকে অগ্রবর্তী স্থান দিতেন তিনি (কথাবার্তায়) তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতেন এবং তাঁকে অন্যদের ওপর বিশেষ মর্যাদা দিতেন। (الاستيعاب)

হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা) সম্পর্কেও এই ধরণের নীতি অনুসরণ সংক্রান্ত বিবরণ গ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃত হয়েছে। খলীফা নির্বাচনে পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের মতামত ও গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবেই ইসলাম যুগে যুগে অবহেলিত নারীকে পরামর্শদানের সুযোগ প্রদান করে তাদের স্বাধীন মত প্রকাশের মর্যাদাকে কে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

নারীর মানসিক অধিকারঃ

প্রতিটি জীবই চায় তার স্বাধীন মত অনুযায়ী চলা ফেরা করতে ও বেঁচে থাকতে। এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেই তার বিরুদ্ধে জুলুম করা হয়। মানুষ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তার অধিকার সবার উপরে। অথচ এ মানুষ এজন আর একজনের অধিকারকে নির্মমভাবে হরণ করে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। সমাজের সব সুযোগ, সুকীর্তি ও সুখ-সম্পদ লুটে নিতে চায়। ক্রীতদাসী প্রথা, সহমরণ ও সতীদাহ প্রথা, আমরণ বৈধব্য প্রথা যুগ যুগ ধরে নারীদের প্রাণে যে অসীম জ্বালা দিয়ে এসেছে তার বিবরণ দেবার মত ভাষা আমার নেই। তবুও একটু আলোচনা না করে পারছিনা। কেননা নারীর অধিকারের উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করছি। তাই এর উপর একটু আলোকপাত করে দেখতে চাই যে পূর্বে নারীর মনকে স্বীকার করা হতো কি না। তাদের মনের স্বাধীনতা ছিল কি না। মানসিক অধিকার তাদের দেয়া হয়েছিল কি না।

প্রাচীনকালে মিশর ব্যাবিলন, অ্যাসিরিয়া প্রভৃতি দেশে রাজা-মহারাজা বা গণ্যমান্য কোন ধনী ব্যক্তির মৃত্যু হলে তাকে সমাধিস্থ করার সময় বা দাহ করার সময় তার স্ত্রী, দাসী, খাট-

Dhaka University Institutional Repository

পালঙ্ক এবং কিছু খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে দেয়া হত। তারা মনে করত পরপারে গিয়ে ঐ ব্যক্তি স্ত্রী, দাসী ও খাদ্যাভাবে ভয়ানক কষ্ট পাবে। যে সব হতভাগী নারী ও দাসী এসব খ্যাতনামা রাজা-বাদশাদের মনের খোরাক জোটাত তাদের কি মনের স্বাধীনতা ছিল? তারা কি স্বাধীন ও প্রফুল্ল মনে স্বামীর কবরে শয্যা রচনা করত? জোর করে, জুলুম করে ও অত্যাচার করে, এসব নারীর মানবিক অধিকারকে ছিনিয়ে নিয়ে মানসিক স্বাধীনতার কবর দিত।

ঠিক এ প্রথারই ছোঁয়া লাগে প্রাচীন হিন্দু ধর্মে। তাদের সময় সতীত্বকে প্রমাণ করতে মেয়েরা স্বামীর মৃত্যুর পর চিতায় তার গলাধরে অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে যেত এবং প্রমাণ করত যে, তারা সতী। মানুষ কেন, পতঙ্গ ছাড়া এমন কোন সৃষ্ট জীব নেই, যারা আগুনে ভয় করে না। মেয়েরা রাগের বশবর্তী হয়ে, দুঃখে অসহ্য জ্বালা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে গলায় ফাঁস ঝোলাতে পারে, পানিতে ডুবে মরতে পারে কিন্তু জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপিয়ে মরতে পারেনা।

এমন দৃষ্টান্ত বিরল। উম্মাদিনী ছাড়া এ প্রকৃতি কোন নারীরই হয় না। অথচ এদের টেনে হেঁচড়ে স্বামীর চিতায় পোড়ানো হতো, তারা পালিয়ে রক্ষা পেতনা। প্রাণ ফেটে কেঁদে ও কোন মহাত্মার হৃদয় গলাতে পারত না। স্বামীর মৃত্যুর পর কি তাদের বেঁচে থাকবার ইচ্ছে হতো না? ছেলে-মেয়ে নিয়ে কি স্বামীর স্মৃতি মুত্যুর পূর্ব পর্যন্ত হৃদয়ে বহন করার বাসনা তাদের জাগত না? কত মেয়ে শুধু বাঁচার আশায় নিজেকে অসতী বলেও আখ্যায়িত করত অথচ নিষ্ঠুর সমাজ ব্যবস্থা এদের ছাড়ত না।

স্বামী বিদেশে প্রাণত্যাগ করলে, স্বামীর কাপড়-চোপড় চিতায় দিয়ে ঐ সঙ্গেই স্ত্রীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে পোড়ানো হতো। কেউ পারে নাই এ প্রথা রোধ করতে। সম্রাট আকবর যার প্রতাপে সমগ্র ভারত কাঁপত, হিন্দু সম্প্রদায় যাকে ভয় ও ভক্তিতে দিল্লীশ্বর উপাধি দিয়েছিল; তিনিও এ কুপ্রথা ভারত থেকে তুলে দিতে পারেন নি। সর্বশেষে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে সতীদাহ প্রথাকে দন্ডনীয় অপরাধ বলে আইন প্রণয়ন করেন এবং হিন্দু বিধবা নারীদের রক্ষা করেন। কোন্ নিষ্ঠুর ধর্মযাজক যে এমন কু-প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন যার ফলে লক্ষ লক্ষ নারী আত্মাহুতি দিয়েছে, এদের করুণ আবেদনকে ঘৃণাভরে অবজ্ঞা করে দগ্ধিভূত করেছে। ধর্মের কুসংস্কার শুধু সমাজেই নয়, সমাজের মহান ব্যক্তিদেরও অন্ধ করে

Dhaka University Institutional Repository

ফেলে। সমাজকে এরূপ নৃশংসতা, বর্বরতা ও মহাপাপের হাত থেকে উদ্ধার করেছে একমাত্র ইসলাম।

ইসলামের নবী তথা সমগ্র মানুষের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এ জন্যেই অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করেন নি। মুনাফেকের সকরুণ নিবেদনকে ও সহানুভূতির সঙ্গে শ্রবণ করেন নি। সত্যের জন্য তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তরবারী ধরতে হয়েছে। তাই মুসলমানগণ আজ মুক্ত। মুসলীম রমণীগণ আজ স্বাধীন। এভাবেই ইসলাম নারীদিগকে তাদের মানসিক অধিকার প্রদান করে তাদেরকে সঠিক মর্যাদা প্রদান করেছে।

নারীর শিক্ষার অধিকারঃ

ইসলামী আকীদা, বিশ্বাস ও সংস্কৃতিতে শিক্ষা ও জ্ঞাণের চর্চার গুরুত্ব অত্যধিক। আল্-কুরআনের প্রথম আয়াত হলো শিক্ষা সম্বন্ধে। সামাজিক জীবনে নারীর আর একটি অধিকারের প্রশ্ন আছে-সেটা হল শিক্ষা। নারীদের শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। নারীরা যদি শিক্ষিতা না হয়, তাহলে তাদের ঔরস থেকে শিক্ষিত, ভদ্র, উদার, সৎ ও মহৎ সন্তান আশা করা যায় না। যৌন বিজ্ঞান না শিখলে সে নারী স্বামীকে খুশি করতে পারে না। অপবিত্রতার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। ছেলেমেয়েকে সুশিক্ষা দিতে পারবে না। দাম্পত্য জীবনে শান্তিও নিয়ে আসতে পারবে না। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা না করলে সংসারে উন্নতি করতে পারবে না। সংসারকে মধুময় করে তুলতেও পারবে না। ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞান শিক্ষার ও যে প্রয়োজন নেই তা নয়। জ্ঞান পুরুষকে যেমন উন্নত ও মহৎ করে, নারীকেও তেমনি আলোকিত ও সুন্দর করে। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, প্রেম-প্রীতি শিক্ষারই অবদান। শিক্ষা বিহীন নারী কি ভাবে পূণ্যের বিকাশ করে? কিভাবে আল্লাহ, রাসূল ও সৃষ্টজীবের সঙ্গে পরিচিত হয় ও ঘনিষ্ঠ প্রেম গড়ে তোলে? তাই পুরুষের ন্যায় নারীরও শিক্ষার প্রয়োজন। অতীব প্রয়োজন।

যে যুগে আরবদের গতিবিধি আরব উপত্যকায় সীমাবদ্ধ ছিল, তখন মহানবী (সাঃ) আরবদেরকে জ্ঞানার্জনের জন্য সুদূর চীনদেশে যেতে বলেছেন।

শিক্ষা পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট নয়। জ্ঞান চর্চাকারী নারী-পুরুষ সকলের জন্য প্রয়োজন। আল্লাহ্র নবী (সাঃ) বলেছেনঃ طلب العلم فريضة على كل مسلم.

Dhaka University Institutional Repository

“প্রত্যেক মুসলমানের (নর-নারীর) উপর জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরয।”[১]

উক্ত হাদীস হতে প্রতীয়মান হয় যে, নারীকেও পুরুষের পাশাপাশি শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তবে একটা প্রশ্ন তবুও থেকে যায় যে, কোন ধরণের শিক্ষা নারীর জন্য অতীব প্রয়োজন? আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষা, না ধর্মীয় শিক্ষা, না গার্হস্থ্য জীবনের শিক্ষা? এর জবাব হল সুশিক্ষা-তা যে কোন দেশের বা যে কোন জাতিরই হোক না কেন? শিক্ষার জন্য সুদূর চীনদেশে যাবার নির্দেশ আমাদের নবী (সাঃ) দিয়েছেন এবং একথাও বলেছেনঃ “তুমি জ্ঞান বিজ্ঞানকে গ্রহণ কর এবং যেখান হইতেই তুমি উহাকে গ্রহণ করনা কেন তাতে তোমার কোন ক্ষতি নাই।”

সেখানে ইউরোপীয় শিক্ষাগ্রহণ করা চলবে না একথা বলা সঙ্গত হবে না। রেল, বাস, ট্রাক, উড়োজাহাজ, ঘড়ি, সাইকেল, সাবান, বাসন, তেল, বিদ্যুৎ, ইঞ্জিন, পাখা, রেডিও, বাল্ব, প্রেস, মেশিন, কলম সবই যখন ব্যবহার করা চলে তখন সে সব তৈরীর বিদ্যা অর্জন করা চলে না এমন গোঁড়ামির কথা আমাদের নবী (সাঃ) ও বলেন নি। আমরাও বলতে চাইনা। এ প্রসঙ্গ আবূ সাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ “তোমরা নিশ্চয়ই অনুসরণ করিবে পূর্ববর্তীদের বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে, যদিও তাহারা যাইয়া থাকে কোন গুইসাপের গর্তে-তোমরাও যাইবে উহাতে। আমরা বলিলাম-হে রাসূল (সাঃ) পূর্ববর্তীরা ইহুদি ও খ্রীষ্টানগণ কী? নবী (সাঃ) বলিলেন-নয়তো কে?”[২]

জ্ঞান সীমাবদ্ধ নয়-অসীম। তাই একে আহরণ করতে হলে মহামনীষী ও বিজ্ঞানীদের পুস্তক, সংস্কৃতি ও সভ্যতা গ্রহণ করা দোষণীয় নয়। যে জ্ঞান মহান সৃষ্টিকর্তার সন্ধান দেয়, যে জ্ঞান সমাজ, দেশ ও জাতির বৃহত্তম কল্যাণে আসে, যে জ্ঞান হৃদয় আলোকিত হয়, সেই জ্ঞানই অর্জন করা নারী-পুরুষের জন্য ফরজ।

পবিত্র কুরআন-হাদীসে ইল্‌মের বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেনঃ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء

[১]. ইমাম ইবনে মাজাহ, সুনান, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৮১।

[২]. সহীহ বুখারী, (তজবীদ) ২য় খন্ড, তর্জমা-আল্‌হাজ্ব আব্দুর রহমান খাঁ, সৃষ্টি প্রারম্ভ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা নং-২৫২; ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, ইলম অধ্যায়,باب اتباء سنن اليهود النصارى খ.৪, পৃ.২০৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাগণের মধ্যে কেবল আলিমগণই তাঁহাকে ভয় করিয়া থাকে।[১]

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"যাহাদের ইলম আছে, আর যাহাদের ইলম নাই তাহারা কি সমান? (নিশ্চয়ই নহে)।"[২]

উপরোক্ত আয়াত সমূহ প্রমাণ করে ইসলামে নারীকে শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট তাগীদ দেয়া হয়েছে। একজন শিক্ষিতা নারীর মতামত যে একজন শিক্ষিতা পুরুষের মতই ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ তা নিচের বর্ণনা থেকে বুঝা যায়।

মোহ্রানার পরিমাণ বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করে হযরত উমর (রাঃ) এক সময় মসজিদে ঘোষণা করেছিলেন যে মোহরানার পরিমাণ হ্রাস করতে হবে।

নামাজের পর এক মহিলা তার নিকট এসে তাঁকে বললেন যে, হযরত উমর (রাঃ) যা বলেছেন তা ঠিক নয়। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি উল্লেখ করলেন যে আল্লাহ্ মোহরানার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেননি। তিনি আল্-কুরআনের আয়াত পাঠ করে শোনালেনঃ

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً

"তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির করো এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থ ও দিয়ে থাক, তবুও উহা থেকে কিছুই ফেরৎ গ্রহণ করো না। তোমরা কি তাদের বিরুদ্ধে কোন অপবাদ দিয়ে এবং পাপাচারণ করে উহার কিছু ফেরত গ্রহণ করবে?"[৩]

হযরত উমর (রা) নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং বললেন যে তাঁরই ভুল হয়েছে এবং মহিলা যা বলেছে তা-ই সঠিক।[৪]

মোটকথা ইসলামে নারী শিক্ষাকে মর্যাদার সহিত বিবেচনা করা হয়েছে। শিক্ষিত নারীর মতামতকেও গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করা হত। আদর্শ ইসলামী পরিবারের নারীর দায়িত্ব বহুবিধ। পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছাড়াও ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং বাস্তবায়নের

---

১. আল্-কুরআন, ৩৫ঃ২৮
২. আল্-কুরআন, ৩৯ঃ৯
৩. আল্-কুরআন, ৪ঃ২০
৪. Al-Qurtubi Al-Zami, vol-5, p.99 and Shaltaur Al-Qur'an Wal-Mar'ah, p.386.

Dhaka University Institutional Repository

বিরাট দায়িত্বভার যে প্রতিটি নর-নারীর উপর অর্পিত রয়েছে, ইহা বলাই বাহুল্য। এমতাবস্থায় ইসলামী জ্ঞান অর্জন যে নারীর জন্য কতটুকু প্রয়োজন, তা সহজেই অনুমেয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

الدنيا ملعونة وملعون ما فيها الاذ كرالله وما ولاه وعالما ومتعلما.

অর্থ হচ্ছে-"আল্লাহ্‌র যিকর (স্মরণ) ও ইহার নিকটস্থ বস্তুসমূহ এবং আলিম (ধর্ম জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তি) ও ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণকারী ব্যতীত গোটাদুনিয়া ও দুনিয়াতে যতকিছু আছে, সকলই অভিশপ্ত (অর্থ্যাৎ আল্লাহ্‌র নি'আমত হইতে বঞ্চিত)।"[১]

ইসলামী জ্ঞান মুসলমানের জীবনের চালিকাশক্তি। যে পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর চরিত্র এবং জ্ঞান যত উন্নত, সে পরিবারের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্য পরিবেশ ততটা সুন্দর ও মনোরম হবে। সুতরাং পরিবারের পার্থিব ও অপার্থিব সার্বিক মঙ্গলের নিমিত্তে নারীর ইসলামী শিক্ষা অর্জন করা এবং তদানুযায়ী পরিবারকে পরিচালনা করা নিতান্ত আবশ্যক।

রাসূলে করীম (সাঃ) এর সময়ে জ্ঞান-চর্চার যে সব মজলিস অনুষ্ঠিত হত, মহিলারা সেসবের অদূরে পর্দার অন্তরালে উপস্থিত থেকে তা থেকে যথেষ্ট উপকার লাভ করতেন। তাঁরা রাসূল (সাঃ)-এর ভাষণ শুনার জন্য স্বতন্ত্রভাবে একত্রিত হতেন। ইসলাম সম্পর্কে নির্ভূল জ্ঞান অর্জনই ছিল এসব শিক্ষা সমাবেশে তাঁদের উপস্থিতির মূখ্য উদ্দেশ্য। রাসূলে করীম (সাঃ) নিজেও মহিলাদের দ্বীন-ইসলাম শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ চিন্তা বিবেচনা করতেন ও সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। কোন সময় যদি তিনি মনে করতেন যে, মহিলারা তাঁর কোন কথা ঠিকমত শুনতে পারেনি, তাহলে তাদের নিকটে উপস্থিত হয়ে সে কথার পুনরাবৃত্তি করতেন।

কোরআন শরীফে অন্তত ৭৫০জায়গায় তার অনুসারীদের পড়াশুনা করতে, জ্ঞানার্জন করতে, গভীরভাবে অনুধাবন করতে এবং নানান বিষয়ের ওপর চিন্তা-ভাবনা করতে বলা হয়েছে। কিন্তু কোথাও বলা হয়নি জ্ঞানার্জন করার যোগ্য শুধুমাত্র ছেলেরাই। এসব নির্দেশ নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং কোরআনের আয়াতের মর্মার্থানুযায়ী,

---

[১]. ইমাম তিরমিযি, সুনান, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৩১৮; ইমাম ইবনে মাজাহ, যুহুদ অধ্যায় , ৩য় পরিচ্ছেদ,

Dhaka University Institutional Repository

নারী-পুরুষ উভয়েই জ্ঞানার্জনের অধিকারী। আর সেকথা মহানবী (সাঃ)ও জানিয়েছেন অত্যন্ত দ্বিধাহীনভাবেঃ

"জ্ঞান ইমানদারের হারানো মানিক। যেখানেই পাবে তুলে নেবে।"

এভাবেই ইসলাম নারীকে ইসলামী আইনের বিধান তথা দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের সুযোগ দিয়ে শিক্ষার ব্যাপারে নারীকেও বঞ্চিত করেনি তার অধিকার থেকে।

ইসলামে নারীর সামাজিক মর্যাদাঃ

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামে নারীর মর্যাদা কেমন, তা অনুমান করা যায় এভাবে সমাজ জীবনে বিপরীত লিঙ্গ পুরুষকে গুরুত্ব সহকারে নারী সম্পর্কে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সমাজ জীবনে তাদের সাথে "সদ্ভাবে" চলতে হবে। অর্থ্যাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরুষদের উপর দায়িত্ব চেপে দেয়া হয়েছে, সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। পবিত্র কালামে ইরশাদ হচ্ছে-

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً

"নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যার মধ্যে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।[১]

মো'আশারাত শব্দের অর্থ-মিলেমিশে জীবন যাপন করা, সে অর্থে উক্ত আয়াতে একদিকে আল্লাহ তায়ালা পুরুষদেরকে নারীদের সাথে মিলেমিশে চলার জন্য পরিস্কার নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে সদ্ভাবে চলার শর্তারোপ করেছেন। উক্ত আয়াতে ম'রূপ'-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূবকর জাস্সাস রাযী হানাফী (রঃ) নাফকাহ্ তথা পারিবারিক ব্যয়, মোহর, ন্যায়পরায়ণতার উল্লেখ করেছেন-

কর্কশ ভাষা, স্ত্রী থেকে বিমুখতা এবং অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে কষ্ট দিবে না। অকারণে তার সামনে রুষ্টতা প্রদর্শণ, বদ মেযাজসহ এরূপ অন্যান্য কর্মসমূহ থেকে বিরত থাকবে।[২]

---

[১]. আল্-কুরআন, ৪ঃ১৯।
[২]. আবূ বকর জাস্সাস, আহ্কামুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০১।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত ব্যাখ্যার আলোকে মিলেমিশে সদ্ভাবে জীবন যাপন করার অর্থ হল, কোমলমতি নারীর সাথে কোমলতার সাথে আলাপ করতে হবে। মহব্বত ও ভালবাসার সাথে চলাফেরা করতে হবে। আলাপ চারিতায় যেন মিষ্টতা প্রদর্শিত হয়, শাসন ও কঠোরতা যেন না হয়।

এমনি ভাবে কার্যতভাবেও প্রত্যেক কাজে যা জীবন সঙ্গীনীর অংশের জিনিস হয়, যেন তাতে অন্যের প্রতি সাধারণ আকর্ষণও না থাকে। কারণ এতে সে এমন ভেঙ্গে পড়ে যে, পৃথিবীর সকল আনন্দ তার জন্য কষ্টে রূপান্তরিত হয়।

আল্-কুরআন সমাজ জীবন সম্পর্কে শুধু এ বলেই শেষ করেনি যে, "নারীদের সাথে সমাজ জীবনে সদ্ব্যবহার করা পুরুষদের জন্য খোদাকর্তৃক দায়িত্ব।" বরং তাদের সাথে ক্ষতির যত পথ রয়েছে সবগুলোকে বন্ধ করার জন্য তালাক প্রাপ্তা নারীর ব্যাপারে পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা দিয়েছে-

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟.

আর তোমরা তাদেরকে জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে আটক রেখো না।[১]

উদ্দেশ্য এই যে, বিবাহের সম্পর্ক যেমন পূর্বে জ্ঞাত হয়ে গেছে রহমত ও মায়ামমতার সম্পর্ক। আত্মার প্রশান্তির সম্পর্ক। হৃদয় টানের সম্পর্ক। এ সম্পর্কের সাথে ক্ষতির কোন সর্ম্পক নেই। সুতরাং এই সম্পর্কের জোড়া যখনই ভেঙ্গে যাবে তাকে যেন ক্ষতির আশংকা না থাকে। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে পুরুষ কর্তৃক স্ত্রীকে কষ্ট দেয়া, তার সাথে সামাজিক জীবনে সীমাতিক্রম ও জুলুম করা, তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং বেখেয়াল ও বেপরোয়াভাবে প্রদর্শণ করা নাজায়েয ও নিষিদ্ধ।

সমাজ জীবনে সৃষ্টিগতভাবে এমন কিছু মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠে, যাদের সাথে দাম্পত্য জীবনের পূর্বে তার সাথে কুদরতীভাবে সম্পর্ক হয়েছিল। যার কারণে তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে বাধ্য। মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী, চাচা-চাচী, ফুফা-ফুফু, নানা-নানী ইত্যাদি সম্পর্ক একটি বংশের বেষ্টনীর মধ্যে থাকে। বিয়ের পর নারী যেন উক্ত আপন আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে ইসলাম সেদিকেও নজর রেখেছে।

---

[১]. আল্-কুরআন, ২:২৩১

Dhaka University Institutional Repository

বাহ্‌রুর রায়েক গ্রন্থে রয়েছে-"বিশুদ্ধ ফাতাওয়া হচ্ছে, স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ক্রমে অথবা অনুমিত ছাড়া প্রত্যেক জুমু'আর দিন আপন মা-বাবার সাথে সাক্ষাত করতে পারবে। এমনি ভাবে বছরে একবার আত্মীয়-স্বজনের সাথে মিলিত হতে পারবে।[১]

শরহে বেকায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে, "প্রত্যেক জুমু'আয় স্ত্রীকে তার মা-বাবার সাথে এবং মা-বাবাকে তার সাথে সাক্ষাত করার ব্যাপারে স্বামী প্রতিবন্ধক হতে পারবে না। এ ছাড়া মাহরাম আত্মীয়-স্বজনের সাথেও বছরে একবার সাক্ষাত করার পথে স্বামী বাধা দিতে পারবে না।"[২]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী আইন যেভাবে নারীকে অধিকার দিয়েছে-আপন মাতা-পিতা ও মাহরাম আত্মীয় স্বজনের সাথে জন্মগত চাহিদা পূরণে সাক্ষাত করার জন্য এবং তার সামাজিক অধিকার বাস্তবায়নে স্বামী বাধা না দিতে। তদ্রুপ তার মাতা-পিতা ও মাহরাম আত্মীয়-স্বজনকেও অধিকার প্রদান করেছে-তাদের প্রিয় তনয়া, আদরের দুলালীকে দেখার জন্যে তার স্বামীর গৃহে যেতে। তাদের উক্ত সামাজিক অধিকার আদায়ে স্বামী কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। এমনকি মাতা-পিতা কাফির হলেও না।

উক্ত অধিকারের ভিত্তিতে যখন আবূ সুফিয়ান কাফির থাকাকালীন সময়ে কোন এক কাজে মদীনায় এসেছে। তখন নবী রমণী উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা (রাযি) এর নিকট সাক্ষাত করতে এসেছিল। (কেননা, আবূ সুফিয়ান হল উম্মে হাবীবা (রাযি) এর পিতা।)

ইসলামের প্রতিটি শাখায় যেহেতু নেকী ও আক্‌ওয়ার উপর ভিত্তি, সেহেতু সামাজিক অধিকারের স্বাধীনতার পাশাপাশি এদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, স্বাধীনতা যেন বন্ধনহীন রূপ ধারণ না করে এবং তা দ্বারা সমাজ জীবনে যেন ফ্যাসাদ সৃষ্টি না হয়।

ফাতহুল কাদীর কিতাবে আছে, "সেখানেই নারীদের জন্য ঘরের বাইরে যাওয়ায় আমরা বৈধতা সাব্যস্ত করেছি, উক্ত বৈধতার জন্য শর্ত হলো, তারা সাজ-সজ্জা করতে পারবে না এবং এমন আকৃতি অবলম্বন করতে পারবে না, যা পুরুষের দৃষ্টি ও হৃদয়ের মনযোগের জন্য আহ্বানকারী হয়।"[৩]

---

[১]. আমিন আস্ শাহির, ফাতাওয়া শামী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১০৫৩।
[২]. আবুল হাসান, শরহে বেকায়া, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৭৭।
[৩]. আমিন আস্ শাহির, ফাতাওয়া শামী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১০৯৫

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সামাজিক অধিকার বঞ্চিতা নারীকে ইসলাম ধর্মই তার যথাযথ সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করে তাদের সামাজিক অবস্থানের উন্নয়ন ঘটিয়াছে।

জীবন ব্যবস্থা ও আইনের অভিন্নতাঃ

প্রাচীন কালের ধর্মসমূহ নারী ও পুরুষকে অভিন্ন মর্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিল না। তাতে উভয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আইন রচিত হয়েছে। প্রত্যেক লিঙ্গের লোকদের জন্য দেয়া হয়েছে আলাদা-আলাদা জীবন ব্যবস্থা। কিন্তু ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যে সমান ভাবে অনুসরণীয় জীবন বিধান বিধিবদ্ধ করেছে।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً

মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীলোক যে-ই হোক আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ দিয়ে থাকলে সেই ব্যাপারে এদের কারুরই কোন এখতিয়ার থাকে না। যে লোকই আল্লাহ্র ও তার রাসূলের নাফরমানী করবে, সে-ই সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত হবে।[১]

পবিত্র কুরআনে আরও ঘোষিত হয়েছেঃ

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً

যে লোক পুরুষ কিংবা নারী কোন সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না।[২]

এককথায় বলা যায়, নারী ও পুরুষের জন্যে একই জীবন বিধান বিধিবদ্ধ হয়েছে। কারুর জন্যে স্বতন্ত্র বা ভিন্নতর কোন ব্যবস্থা দেয়া হয়নি ইসলামে। মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ও করা হয়নি, যদিও মান-মর্যাদার দিক দিয়ে সাধারণভাবে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে বা স্তরে ভাগ করা হয়েছে মানুষকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নারী পুরুষ উভয়ে একই আদর্শের

---

১. আল্-কুরআন, ৩৩ঃ৩৬
২. আল্-কুরআন, ৪ঃ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

অনুসারী একই পথের পথিক। এই জিহাদের মুজাহিদ যদিও প্রকৃতি ও স্বরূপের দিক দিয়ে নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক ও অভিন্ন নয়।

কিন্তু ক্ষেত্র ও কর্মের পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের কাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সর্বোতভাবে এক ও অভিন্ন। ব্যক্তিগত ও খুঁটিনাটি ব্যাপার ছাড়া সামগ্রিক বিষয়াদির যে কয়েকটি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তার সংখ্যা মাত্র ৬-৭টি। তবে প্রায় সর্ব বিষয়েই ইসলাম বিশেষ করে জীবন ব্যবস্থা ও আইনের দিক থেকে নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে প্রায় এক ও অভিন্ন।

কর্মক্ষেত্রে নারীঃ

নারী সমাজে কর্মতৎপরতা কেবলমাত্র বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞান অর্জনেও চিন্তা গবেষণার ক্ষেত্র পর্যন্ত ই সীমাবদ্ধ থাকবে, ইসলাম এমন কথা বলেনি। বাস্তাব কাজে যথার্থ ভূমিকা পালনের জন্যেও ইসলাম এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র তাদের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী যেমন জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা লাভে অগ্রসর হতে পারে, তেমনি কৃষ্টি ও ব্যবসায়ের কাজে অংশগ্রহণ করায়ও তারা সম্পূর্ণ অধিকারী। জীবিকার জন্যে বিভিন্নকাজ করার, শিল্প কারখানা স্থাপন, পরিচালনা বা তাতে কাজ করারও অধিকার রয়েছে নারীদের। সেই সঙ্গে সমাজ ও জাতির বহুবিধ সামষ্টিক কাজ আঞ্জাম দেওয়া ও তাদের জন্যে কিছুমাত্র নিষিদ্ধ নয়। বস্তুত অনুমতি এক কথা আর বাস্তবে তা চর্চা করা একান্তই জরুরী হওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। নারীর এসব কাজে ঝাপিয়ে পড়ুক, ইসলামে তা কাম্য নয়। নারীদের মধ্যেও এ ধরণের কাজে অংশগ্রহণের আগ্রহ-উৎসাহ থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে কাউকে নিরুৎসাহিত করা ইসলামের রীতি নয়। সে উৎসাহ উদ্দীপনা নির্মূল করতে চেষ্টাও করেনি ইসলাম। বরং তার বাস্তব চরিতার্থতার অনুমতিটুকু দিয়ে রাখা হয়েছে মাত্র। তার অর্থ, একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়লে নারী এই অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করতে পারে অকুণ্ঠ চিত্তে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। রাসূলে করীম (সাঃ) একবার জিহাদে গমনকারী লোকদেরকে সামুদ্রিক সফর করার বিরাট বিরাট সওয়াব ও মর্যাদার কথা বললে উম্মে হারাম নাম্মী এক মহিলা সাহাবী বললেনঃ 'হে রাসূল (সাঃ) দোয়া করুন, আমি যেন এই জিহাদী সফরে শরীক হতে পারি। রাসূলে করীম তা-ই করলেন। অথচ এটা জানা কথা যে, জিহাদে গমন নারীদের জন্যে ফরয করা হয়নি ইসলামে। এ থেকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মেজাজ

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতি স্পষ্টত ফুটে উঠে। সামাজিক সামষ্টিক কাজ থেকে নারীরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকুক তা ইসলামে আদৌ কাম্য নয়।

নারীদের জন্য স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রের মধ্যেই তাদেরকে চিরজীবন সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে, তার বাইরে তারা উঁকি মেরেও তাকাবে না, ইসলামে তা-ও কোন পছন্দনীয় ব্যপার নয়। তাই বলে, বাইরের কাজে কর্মে অংশগ্রহণ করা নারীদের নিষেধ করা না হলেও বরং তার অনুমতি দেয়া সত্ত্বেও সাধারণ ভাবে তাদের জন্য তা পছন্দ করা হয়নি। তবে তার অর্থ এ-ও নয় যে, নারীরা ঘরের বাইরে কখনই যাবে না এবং বাইরের দরকারী কাজও তারা করবে না।

একজন মহিলা তালাকপ্রাপ্তা হয়ে ইদ্দত পালন কালে ঘরের বাইরে গিয়ে নিজের বাগানর খেজুর গাছের ডালা কেটে বিক্রী করার অনুমতি চাইলে রাসূলে করীম (সাঃ) জবাবে বললেনঃ اخرجى فجدى نخبك لعلك ان تصل قى منه او تفعلى خيرا.

ক্ষেতে যাও,অতঃপর নিজের খেজুরগাছ কাট (আর বিক্রী কর)। এই টাকা দ্বারা সম্ভবত তুমি দান-খয়রাত অথবা অন্য কোন ভাল কাজ করতে পারবে। (আর এভাবে তা তোমার পরকালীন কল্যাণ লাভের ও নিমিত্ত হবে।)[১]

একথা বলে নবী করীম (সাঃ) হযতর জাবির (রা) এর খালাম্মাকে মানবতার কল্যাণমূল কাজ করার জন্যে উৎসাহ দিলে। উক্ত হাদীস থেকে এও জানা যায় সৎ ও কল্যাণমূলক কাজের উদ্দেশ্যে নারীরা ঘরের বাইরে যেতে পারে। প্রাথমিক কালের মুসলিম মহিলারা প্রয়োজনের তাগিদে ঘরের বাইরে, হাটে-বাজারে ও ক্ষেতে-খামারেও চলে যেতেন। এই ব্যাপারে বিশেষ ধরণের কোন নিষেধ ছিল না।

পর্দার বিধান নাজিল হওয়ার পর হযরত উমর (রাঃ) হযরত সওদা (রাঃ) কে ঘরের বাইতে দেখতে পেয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। হযরত সওদা (রাঃ) এই ব্যাপারটি নবী করীম (রাঃ) এর নিকট প্রকাশ করেন। কিছুক্ষণ পরই নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি ওহী নাজিল হয়। তখন তিনি হযরত সওদা (রাঃ)কে ডেকে বললেনঃ

---

[১]. ইমাম আবূ দাউদ, সুনান, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৭১৭।

Dhaka University Institutional Repository

"হ্যাঁ, প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি তোমাদের জন্যে রয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।"(মুসনাদে আহমদ)

রাসূলের সময়কার মুসলিম মহিলাদের কর্মতৎপরতা দেখে একথা বলিষ্ঠ ভাবেই বলা যেতে পারে যে, মুসলিম মহিলারা কাজের প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে পারেন। ইসলামী সমাজে এ ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতার অবকাশ নেই। প্রাথমিক যুগের ইসলামী সমাজে মহিলারা চাষাবাদের কাজও করতেন, গৃহপালিত জন্তুপালনের কাজও করতেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর কন্যা হযরত আস্‌মা (রাঃ) ছিলেন হযরত জুবাইর (রাঃ) এর স্ত্রী। তিনি নিজেই তাঁর ঘোড়াকে খাবার দিতেন, পানি পান করাতেন। এ ছাড়া ঘরের যাবতীয় কাজ ও তাঁকেই করতে হত। তিনি নিজে বাড়ী থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত জমি থেকে খেজুরের বীজ তুলে আনতেন।

কীলাহ্ নাম্নী এক মহিলা রাসূলে করীম (রা) নিকট উপস্থিত হয়ে বললেনঃ

আমি একজন স্ত্রীলোক। আমি ক্রয়-বিক্রয় অর্থাৎ ব্যবসা করি। পরে সে মহিলা রাসূলে করীম (সাঃ) এর নিকট ব্যবসায় সংক্রান্ত কয়েকটি মাসালা ও জিজ্ঞেস করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর বেগম নিজে ঘরে বসে শিল্পকর্ম করতেন এবং তা বিক্রী করে ঘর সংসারের খরচাদি চালাতেন। একদিন তিনি নবী করীম (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেনঃ

"আমি একজন কারিগর মেয়েলোক। আমি তৈরী করা দ্রব্য বিক্রী করি। এছাড়া আমার, আমার স্বামী এবং আমার সন্তানদের জীবিকার অন্য কোন উপায় নেই।

রাসূলে করীম (সাঃ) বললেনঃ এভাবে উপার্জন করে তুমি তোমার ঘর-সংসারের প্রয়োজন পূরণ করছ। এতে তুমি বিরাট সওয়াবের অধিকারী হবে।"(طبقا تلابن سعل)

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উপার্জনের জন্য কাজ করা ও সে জন্যে ঘরের বাইরে যাওয়া নারীদের জন্য নিষিদ্ধ নয়। তবে তা যে সীমার মধ্যে থেকে করতে হবে, একথা খুলে বলার প্রয়োজন পড়ে না।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলাদের স্বতন্ত্র সংগঠন করার অধিকারঃ

শিশু সন্তানের লালন-পালনের ব্যাপারে নারীদের যোগ্যতা যখন পুরুষের তুলনায় বেশী এবং একারণে পুরুষদের উপর তাদের অগ্রাধিকারও দেয়া হয়েছে। তখন সমাজের সে-সব ক্ষেত্রে তাদের সেবামূলক কর্মক্ষমতা অধিক অবদান রাখতে সক্ষম এবং যে-সব ক্ষেত্রে এই নারীসুলভ সেবা শুশ্রুষামূলক কার্যাবলী অপরিহার্য বিবেচিত হবে, সেই সবক্ষেত্রে তাদেরকেই অগ্রসর করা হবে, এ-ই তো স্বাভাবিক। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, এ উদ্দেশ্যে তাদের ব্যক্তিগত চেষ্টা সাধনার পাশাপাশি সামষ্টিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানোর অনুমতি তাদের জন্যে থাকতে হবে। ইসলামী শরীয়াত এ ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না। এ কারণে নবী করীম (সাঃ)ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে মহিলাদের কোন স্বতন্ত্র সংগঠন ছিল কিনা, এ প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। কেননা সামাজিক সংগঠন সংস্থা গড়বার কারণ থাকলেই তা গড়ে ওঠে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিভিন্ন দ্বীনী ও সামাজিক প্রয়োজনে স্ত্রীলোকেরা সমবেত হয়েছেন। অনেক সময় তারা মিলিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা-বিবেচনা করেছেন এবং নিজেদের ধ্যান-ধারণা ও বাস্তব সমস্যাগুলো রাসূলে করীম (সাঃ) এর সমীপে পেশ করেছেন। তিনিও সেসব বিষয়ের সমাধান তাদের বলে দিয়েছেন।

এইসব ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে, বহুসংখ্যক মহিলা একত্রিত হয়ে সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে রাসূলে করীম (সাঃ) এর সমীপে উপস্থিত হলেও তাঁরা সকলেই এক সঙ্গে কথা বলেন নি, নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে নেত্রী পদে বাছাই করে তার মাধ্যমে কথা বলেছেন। সেই মহিলা নেত্রী যা কিছু বলেছেন, তাতে তিনি নিশ্চই সকলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, যেমন বর্তমানের কোন সংগঠন-সংস্থার নেতা সাধারণত করে থাকেন।

একদা হযরত জায়েদ (রাঃ) এর কন্যা হযরত আসমা (রাঃ) নেত্রী হিসেবে রাসূলে করীম (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেনঃ

انى رسول ورا ائى من جما عة النساء المسلمين كلهن يقلن بقو لى وعلى مثل رأى. (الاستيعاب)

আমার পশ্চাতে মুসলিম মহিলাদের যে দল রয়েছে আমি তাদেরই প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত হয়েছি, তাঁদের সকলেই আমার কথা বলেছেন এবং আমি যে মত পোষণ করি, তাঁরাও সেই মতই পোষণ করছেন।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বীন-ইসলামের নীতি ও আদর্শের দৃষ্টিতে বিবেচনা করা হলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে, মহিলাদের স্বতন্ত্র সংগঠন সংস্থা গড়ে তেলার অধিকার রয়েছে।

নারীরা পুরুষের থেকে আলাদাভাবে জামা'আতের সাথে নামায পড়তে পারে। উম্মে আরাক্বা নাম্মী মহিলা সাহাবীকে নবী করীম (সাঃ) নিজেই নির্দেশ দিয়েছিলেন ঘরের লোকদের নিয়ে একত্রে নামায পড়তে ও তাতে ইমামতি করতে।

তাইমা বিন্‌তে সালমা বলেছেনঃ হযরত আয়শা (রাঃ) মাগরিবের ফরয নামাযের ইমামতি করেছেন। তিনি মহিলাদের সঙ্গে কাতারে দাঁড়িয়েছেন এবং উচ্চস্বরে কেরাআত পাঠ করেছেন।(আল্‌-মুহাল্লা, ইবনে হাজম)

অন্য এক হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছেঃ

হযরত আয়েশা (রা) নামাযের আযান দিতেন, ইকামত বলতেন, মহিলাদের ইমামতি করতেন এবং তাদের মাঝখানে দাঁড়াতেন।

জামা'আতের সাথে নামায মুসলিম উম্মতের সংগঠন-সংস্থার একটা ক্ষুদ্র নমুনা। এ কারণে নামাযের ইমামতিকে 'ক্ষুদ্র পরিসর নেতৃত্ব' বলা হয়। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, মহিলাদের ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ও শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে তাদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলা শুধু যে জায়েয তাই নয়, একান্ত জরুরীও বটে। তাই নারীর এসব সংগঠন ও সংস্থাকে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক সামষ্টিক পর্যায়ের কার্যাবলী সমাধান করার পূর্ণ স্বাধীনতা ও সুযোগ ইসলামে দেয়া হয়েছে।

উত্তরাধিকারে পার্থক্য এবং নারীর স্থানঃ

ইসলামে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেয়া হয়নি। একথাটি বলার জন্য সমালোচকরা উত্তরাধিকারের বিষয়টি উল্লেখ করে। কন্যা উক্তরাধিকার সূত্রে পুত্রের অর্ধেক। সমালোচকরা এ যুক্তিটিই বেশির ভাগ উল্লেখ করে থাকে। এমন কি সাধারণতঃ সূরা-নিসার একটি আয়াতের অংশবিশেষ উল্লেখ করে থাকে। তা হলোঃ

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ

Dhaka University Institutional Repository

এক পুত্রের অংশ দু'কন্যার সমান।[১] আয়াতে এই অংশটির পুরা আয়াত এবং উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় অন্যান্য আয়াতের সংগে একত্রে দেখাই সংগত হবে। সবগুলো আয়াত একসংগে দেখলে মতামতটি অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ হবে এবং বোঝা যাবে যে, নারীরা কোন্ ক্ষেত্রে বেশী এবং কোন্ ক্ষেত্রে কম পেয়ে থাকে।

প্রাক-ইসলামী যুগে নারীদের পৈত্রিক বা কোন সম্পত্তি উত্তরাধিকারের বিধান ছিল না। পক্ষান্তরে তাদেরকেই অন্যরা উত্তরাধিকার সূত্রে ভাগ বাটোয়ারা করে নিত। উদাহরণ স্বরূপ পুত্রেরাই বৈমাত্রিক মাতাদের স্বামীর উত্তরাধিকারী হতো।

বিত্তশালী আরবগণ বিভিন্ন শ্রেণীর এবং স্তরের স্ত্রী সংরক্ষণ করতো। কোন বিত্তবান বহু সংখ্যক স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করলে সন্তানেরা বিমাতাদেরকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত এবং যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতো। এ সমস্ত কুপ্রথার বিলোপ করে নারীকে সম্পত্তির অধিকার ইসলামই প্রথম দিয়েছে। আল কোরআনে বলা হয়েছেঃ

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً

পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং নারীরও অংশ আছে তা অল্পই বা বেশীই হোক। তা এক নির্ধারিত অংশ।[২]

ইসলামের আর্বিভাবের পূর্বে নারীর আত্মীয়-স্বজনদের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের বিধান ছিল না। ইসলামই সর্বপ্রথম আইন সংগত অধিকার প্রদান করে। তবে, কে কতটুকু সম্পত্তির অধিকারী হবে অবস্থা ভেদে উহার পার্থক্য হয়।

এখন উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় আয়াত গুলিতে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ

[১]. আল্-কুরআন, ৪ঃ১১।
[২]. আল্-কুরআন, ৪ঃ৭।

Dhaka University Institutional Repository

تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً ٥ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

“আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন। এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান। কিন্তু বেকল কন্যা দুয়ের অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির $\frac{২}{৩}$ অংশ আর এক কন্যা থাকলে তারজন্য $\frac{১}{২}$ অংশ। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে পিতা-মাতা প্রত্যেকে পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির $\frac{১}{৬}$ অংশ। মৃতব্যক্তি নিঃসন্তান হলে এবং পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হলে মাতা পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ। মৃতব্যক্তির ভাই-বোন থাকলে মা পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ। এসবই সে যা অছিয়ত করে তা দেয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর।

তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের নিকটতর তা তোমরা অবহিত নও।

যদি কোন নারী বা পুরুষের দূর সম্পর্কীয় উত্তরাধিকারী থাকে এবং তার পিতা-মাতা বা সন্তান না থাকে এবং একটি ভাই অথবা বোন থাকে তবে, প্রত্যেকেই পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ। কিন্তু তারা যদি দুই এর অধিক হয় তবে তারা পারে $\frac{১}{৩}$ অংশ। এ ব্যবস্থা তাদের ঋণ পরিশোধের পর।”[১]

উপরোক্ত বর্ণনা হতে দেখা যায় যে নারীর উত্তরাধিকার কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ অপেক্ষা বেশী হয়, কখনও সমান হয়, কখনও কম হয়।

উক্ত আয়াতের বর্ণনায় নারীর অবস্থা দেখা যাকঃ

১। পুরুষের অংশ বেশীঃ পিতার মৃত্যুর পর পুত্র পাবে ২ ভাগ এবং কন্যা পারে ১ ভাগ।

---

[১]. আল্-কুরআন, ৪ঃ১১-১২।

Dhaka University Institutional Repository

২। পুরুষ এবং নারীর সমান অংশ প্রাপ্তিঃ এক ব্যক্তি মারা গেল, তার উত্তরাধিকারী হলো তার পুত্র, কন্যা এবং পিতা-মাতা। এক্ষেত্রে পুত্রের পরিত্যক্ত সম্পত্তির $\frac{১}{৬}$ ভাগ পাবে মা $\frac{১}{৬}$ ভাগ পাবে বাবা। এক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষ (পিতা-মাতা) সন্তানের সম্পত্তির সমান অংশই পাচ্ছে।

৩। ভাই-বোন যদি কোন দূরবর্তী আত্মীয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় তবে, ভাই এবং বোন (পুরুষ এবং নারী) উভয়েই $\frac{১}{৬}$ ভাগ হিসাবে সমান অংশই পাবে; কেউ বেশী নয়-কেউ কমও নয়।

৪। নারী বেশী অংশের উত্তরাধিকারঃ যদি কোন ব্যক্তি কন্যা এবং পিতা রেখে মারা যায় তবে কন্যা পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ এবং পিতা পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ।

কি পরিমাণ সম্পত্তি একজন উত্তরাধিকার সূত্রে পেল তা দ্বারা নারী এবং পুরুষের পরাস্পরিক মর্যাদা নির্ণয় হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অংশ পেয়ে থাকে, কখনও কখনও কম।

উত্তরাধিকার সূত্রে তাদেরকে বেশী দেয়া হয় যাদের আর্থিক দায়িত্ব বেশী। ভাই আর বোনের কথাই ধরা যাক। ভাই পরিবারের সকল নারী এমনকি ভগ্নীর ভরণ-পোষণের জন্য দায়ী। সে বিয়ে করলে স্ত্রীকে মোহরানা দেয় এবং তার সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

ভগ্নীর বিয়ে হলে সে মোহরানা পায় এবং তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে তার স্বামী। পিতার মৃত্যুর পর বয়স্ক ভ্রাতা এবং অবিবাহিত ভগ্নী রইল। ভগ্নী পিতার সম্পত্তি যা পাবে ভাই তার দ্বিগুণ পারে এটা সত্য। কিন্তু, ভগ্নী অর্ধেক পাইলেও তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব ভ্রাতার উপর। ভ্রাতা এ কথা বলতে পারবে না যে আমি তোমার দ্বিগুণ সম্পত্তি পেয়েছি বটে; কিন্তু আমাকে আমার ৫টি সন্তানকে খাওয়াতে হয়, মাকে, ফুফুকে দেখতে হয় সেহেতু আমি তোমার ভরণ পোষণের জন্য দায়ী নই। তুমি তোমার সম্পত্তি হতে নিজের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করো।

Dhaka University Institutional Repository

সূরা নিসার আয়াত নং ১১, ১২ এবং ১৭৬ দ্বারা উত্তরাধিকারের নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিস্তারিত বিষয়গুলো নবী (সাঃ) ফয়সালা করে দিয়েছেনঃ

হাদীসে বর্ণিত আছে, "হযরত সা'দ ইব্‌নে আবি রাবি'র (রাঃ) স্ত্রী তাঁর কন্যাকে নিয়ে রাসূল (সাঃ) এর নিকট এলেন। তিনি বললেন, ওহে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! এ দু'টি হযরত সা'দ ইবনে রাবি'র (রা) কন্যা। তাদের পিতা আল্লাহ্‌র রাস্তায় অহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তাদের পিতৃব্য সা'দ ইবনে রাবি'র (রাঃ) সব টাকা পয়সা নিয়ে গেছেন। তাদেরকে কিছুই দেননি। টাকার অভাবে তাদের বিয়েও হচ্ছে না। রাসূল (সাঃ) বললেন, 'আল্লাহ্ নিশ্চয়ই এ বিষয়ে আমাদেরকে পথ প্রদর্শণ করবেন। এর পরেই উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াত গুলো নাযিল হয়।

রাসূল (সাঃ) তখন সা'দের কন্যাদ্বয়ের পিতৃব্যকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে বললেন। সা'দের সম্পত্তির $\frac{২}{৩}$ অংশ দুই কন্যাকে দিয়ে দাও এবং তাদের মাতাকে দাও $\frac{১}{৮}$ অংশ বাকীটুকু তোমার।[১]

ইসলামে ভ্রাতাকে ভ্রাতার সম্পত্তির ক্ষেত্রবিশেষে উত্তরাধিকারী করেছে। সা'দ ইবনে আবি রাবি (রা) যদি কোন সম্পত্তি না রেখে মারা যেতেন তবে তাঁর ভ্রাতাকে তাঁর কন্যাদ্বয় এবং তাঁর বিধবা স্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হতো যে পর্যন্ত না তাদের অন্যত্র বিবাহ ঠিক হতো।

সুতরাং ইসলামী অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় নারীর প্রাপ্ত সম্পদ, মোহরানা এবং ভরণ-পোষণের সুযোগ সুবিধাসহ মোট আর্থিক প্রাপ্তি থেকে আর্থিক ও সাংসারিক দায়দায়িত্ব (যে সব দায়বদ্ধতা নারীর ওপর বর্তায় না) বাদ দিলে নর-নারীর সামগ্রিক জীবনের যে অর্থনৈতিক চিত্র পরিষ্ফুট হয়, তাতে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে-ইসলামে পুরুষের চেয়ে নারীর সুযোগ সুবিধা অনেক বেশী। যা পরবর্তীতে দেয়া সারণী থেকে আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

আর একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি অন্যভাবে বঝা যেতে পারেঃ

ধরা যাক দুজন যাত্রী দেশের এক প্রান্ত থেকে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা শুরু করল। একই তহবিল থেকে একজনকে পাথেয় দেওয়া হল ৫০০/- টাকা, অপরজনকে দেওয়া হল ২৫০/- টাকা, রিজার্ভ ফান্ড হিসাবে ১৫০/- টাকা এবং একটি ফ্রি টিকিট। যদি টিকিটের মূল্য

[১]. ইমাম তিরমিযী, সুনান, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৪১৪।

Dhaka University Institutional Repository

৪০০/- টাকা হয় তাহলে প্রথম যাত্রীর অন্যান্য খরচ বাবদ থাকবে (৫০০-৪০০)=১০০/- টাকা এবং অপর জনের থাকে (২৫০+১৫০)=৪০০/- টাকা। ফ্রি টিকিটের অর্থ যদি সংসারের অর্থনৈতিক দায়কে ধরা হয়, তাহলে একথা প্রমাণিত সত্য যে, "ইসলাম নারীকে সংসারের অর্থনৈতিক দায়মুক্তি দিয়ে তার স্বভাব ও প্রকৃতিকে হেফাযত করেছে এবং মোহরানার ব্যবস্থা করে সকল নারীকে বিশেষত নিঃস্ব নারীকেও দিয়েছে অর্থনৈতিক অঙ্গীকার।[১]

ইসলামে নারীরা এইরকম আর্থিক অধিকার পেয়েছে প্রায় দেড় হাজার বছর আগেই।

নিম্নে সারণীতে নারীর উত্তরাধিকারের অবস্থান দেখানো হলঃ

প্রাপ্তি									মোট			
লিঙ্গ	পিতা	পুত্র	স্বামী	মাতা	কন্যা	স্ত্রী	অন্যান্য		প্রাপ্তি	দায়	দায়বাদে	মন্তব্য
							মোহরানা	ভরণপোষণ				
নর	১/৬	১/২	১/৪	×	×	×	×	×	২২/২৪	পরিবারের সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব	সঞ্চয় + (?)	সাধারণতঃ নিঃস্ব বা ঋণ-গ্রস্থ
নারী	×	×	×	১/৬	১/৪	১/৮	মর্যাদা অনুসারে	সারাজীবনের ভরণপোষণ	১৩/২৪ + মোহরানা + ভরণ পোষণ	×	১৩/২৪ + মোহরানা	আর্থিক ঝুঁকিহীন জীবন

উপরোক্ত সারণী হতে বুঝা যাচ্ছে যে, উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ইসলামে পুরুষের চেয়ে নারীর প্রতি সুবিচার করা করা হয়েছে।

প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, স্নেহ ও মমতা দিয়েই এ সংসার জীবন। এর যে কোন একটির অভাব ঘটলেই সংসার হয় বিষময়। নারী যদি পুরুষের মত অধিকার না পায়, সংসার জীবনে যদি ক্রীতদাসীর মতো স্বামীর নিকট ব্যবহার পায় তবে এ দুনিয়া তার নিকট দোজখ হয়ে দাঁড়ায়। একই পিতার সন্তান হয়ে কন্যা চিরজীবন সম্পত্তি, স্নেহ ও মমতা হতে বঞ্চিত হবে ইসলাম তা স্বীকার করেনা। পিতার চোখে ছেলে ও মেয়ে একই। এটাই ইসলামের শিক্ষা। এ ভাবে ইসলাম নারীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্তিতে ও অধিকার প্রদান করেছে।

---

১. ইসলাম ও নারী, সম্পাদক আবুরিদা, পাগুক্ত: পৃষ্ঠা-২৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে নারীর মালিকানা অধিকারের মর্যাদাঃ

সর্বপ্রকারের অর্থনৈতিক লেনদেনে যেরূপ অধিকার ইসলাম পুরুষকে দিয়েছে, সেরূপ অধিকার নারীকে ও দিয়েছে। নারী তার সকল সম্পদে দখল ও হস্তক্ষেপ করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। সম্পদ অধিকারে রাখা এবং সক্রিয়ভাবে উপার্জনে অংশ গ্রহণের অধিকার ইসলাম নারীকেও দিয়েছে।

ইসলাম নারীদিগকে সম্পদের অধিকার দিয়েছে। ইসলামের উত্তরাধিকার আইন এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অনেক ধর্মই মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে উত্তরাধিকার হতে নারীদিগকে বঞ্চিত করেছে। কিন্তু ইসলাম নিকট আত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তাদের সুনির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেনঃ

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً

"পুরুষের অংশ রহিয়াছে সেই সম্পদে, যাহা তাহাদের মাতাপিতা এবং ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজনগণ রাখিয়া গিয়াছে। আর নারীদের জন্যও অংশ রহিয়াছে সেই সম্পদে। সেই সম্পদ কম হউক বা বেশি হউক, উহাতে তাহাদের অংশ নির্ধারণ করা হইয়াছে।"[১]

আহ্ওয়ালুস শাখছিয়্যাহ ফিল আহকামে উল্লেখ আছে-

"স্ত্রী যদি বুদ্ধিমান বালেগা হয়, তবে তার সম্পদে কারো অধিকার নেই। বরং সে নিজেই উক্ত সম্পদে দখল ও হস্তক্ষেপের মালিক। তার ক্ষমতা আছে, তার কিছু সম্পদ অথবা পূর্ণ সম্পদের উপর কাউকে উকিল বানিয়ে দেয়া তদ্রূপ কোন অভিভাবক তার মোহরের উপর উকিল বানানো ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।"

ফাতাওয়া আলমগীরীতে আছে, "পিতার ক্ষমতা নেই মেয়ের মোহর অন্য কাউকে হেবা তথা দান করে দেয়ার। এটা হচ্ছে সকল আলেমগণের অভিমত।"

বাদায়ে গ্রন্থে রয়েছেঃ "হ্যাঁ! নারীর নিজের ক্ষমতা রয়েছে আপন খুশীতে জবরদস্তি ছাড়া নিজের মোহর কম করে দেয়া অথবা ক্ষমা করে দেয়ার।"

হিদায়াগ্রন্থে আছেঃ যদি নারী স্বীয় মোহরের কিয়দাংশ মাফ করে দেয়, তবে তা শুদ্ধ হবে।

---

১. আল্-কুরআন, ৪ঃ ৭।

Dhaka University Institutional Repository

আলমগীরীতে উল্লেখ আছেঃ "মাফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য তার সন্তুষ্টি থাকা জরুরী। যদি জবর দস্তির কারণে মাফ করে, তাহলে মাফ সহীহ্ ও বিশুদ্ধ হবে না।"

যেহেতু প্রত্যেক নারীর তার মোহরের মালিকানা আছে। তাই তার ক্ষমতা আছে যে কোন ভাবে তার মোহরে হস্তক্ষেপ করার। তাতে কারো হস্তক্ষেপের অধিকার নেই। এটা হল ইসলামী আইনের মাস্আলা।

এর উপর ভিত্তি করে নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, তার সম্পদে সব ধরণের বৈধ হস্তক্ষেপকে বাস্তবায়ন করার। তাই তার ক্ষমতা আছে তার মোহরের টাকা দিয়ে যে কোন কিছু খরিদ করার, স্বীয় মোহর দিয়ে যা ইচ্ছা খরিদ করবে বা স্বামী অভিভাবক বা অন্য যে কাউকে দান করে দিবে।[১]

রাসূল (সাঃ) এর যুগে প্রতিটি নারী তার মালিকানা অধিকার বুঝত। নিজেই নিজের সম্পদে সবধরণের হস্তক্ষেপ করত এতে স্বামী বা অন্য কোন আত্মীয় স্বজনের দখল থাকত না।

একদা হযরত উম্মে সালমা (রা) রাসূল (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করে, "আমি যদি আবূ সালমার বাচ্চাদেরকে সদ্কা দেই তাহলে সওয়াব পাব কি? কেননা তারা আমার সন্তান। রাসূল (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, তাদেরকে সদকা দান কর। তাতে সওয়াব পাবে।"[২]

সুতরাং নারীদের এই অধিকার (তাদের আপন সম্পদের উপর পূর্ণ ক্ষমতা ও মালিকানার মধ্যে কারো দখল নেই। বরং সে নিজেই নিজের সম্পদে পূর্ণ ক্ষমতা বান) ইসলামী আইনের বিশেষত্ব সমূহের একটি।

ইসলাম নারীদিগকে অর্থউপার্জনের অধিকার দিয়েছে। অর্জিত ধন নিজের নিজের দখলে রাখার অধিকারও তাদের আছে।পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ.

"পুরুষদের জন্যও তাহাদের উপার্জনের নির্দিষ্ট অংশ রহিয়াছে এবং নারীদের জন্যও তাহাদের উপার্জনের নিদিষ্ট অংশ রহিয়াছে।"[৩]

সুতরাং আমরা উপরোক্ত আলোচনা হতে উপলব্ধি করতে পারছি যে, ইসলাম নারীকে অর্থ উপার্জন ও সম্পদের মালিকানা নিজের অধিকারে রাখার সুযোগ প্রদান করেছে ।

---

১. আহওয়ালুস শাখদিয়্যাহ, পৃষ্ঠা-২০৮।
২. ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৫১৭।
৩. আল্-কুরআন, ৪ঃ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

নারীর পর্দা বা হিজাব

Dhaka University Institutional Repository

পর্দা বা হিজাব

ইসলামে নারীর শালীনতা ও সম্ভ্রম সংরক্ষণের অধিকারঃ

অন্ধকার যুগের সামাজিক পরিবেশের একটা চিত্র তুলে ধরার জন্য পবিত্র কুরআনে যে সব প্রয়োজনীয় আয়াত বর্ণিত হয়েছে, এসব আয়াতে অন্ধকার যুগের বিভিন্ন বদভ্যাস,কুসংস্কার ও অশ্লীলতার নিন্দা ও সমালোচনা করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে প্রচলিত নোংরামীর জন্য তাদের তিরস্কার ও ভৎর্সনা করা হয়েছে । সাথে সাথে এমন সব আইন বিধি ও প্রণয়ন করা হয়েছে যার বাস্তবায়ন করে ঐসব অপরাধ প্রবনতা, নোংরামী ও অশ্লীলতা থেকে তারা মুক্তি পেতে পারে ।

পর্দা প্রথার অর্থ নারীজাতির মর্যাদা রক্ষা। এপ্রথা বহুকাল থেকেই চলে আসছে। বেদও পূরাণএর কিছু বর্ণনা দেখলে মনে হয় ব্যভিচারে সমগ্রদেশ গ্রাস করেছিল। মুনি-ঋষিদের স্ত্রীগণও রক্ষা পায়নি ।

পুরাণে আছেঃ "দীর্ঘতমা মুনি ও তাঁর স্ত্রীকে অপরের ভোগ্যা জেনে সতীত্বের নিয়ম স্থাপন করেন।

বেদে আছেঃ "মনু সংহিতার মতে, পুত্র দ্বাদশ প্রকারের। তার মধ্যে স্ত্রীলোকের অবিবাহিতা অবস্থায় যে সন্তান জন্ম লাভ করত তাকে বলা হতো 'কালীন'। গর্ভবতী কুমারীর বিবাহের পর জাত সন্তান 'সহোচ'। বিধবার পুনরায় বিবাহেরর পর জাত সন্তান 'পৌণভব'। ব্রাক্ষ্মণাদি উচ্চতর জাতির ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জাত সন্তান 'শৌদ্র'।"[১]

পর্দা প্রথা যদি মানা হতো তা হলে ব্রাক্ষ্মণ, মুনি-ঋষী তাদের স্ত্রীগণ কিভাবে অন্যের দ্বারা ধর্ষিতা হয়ে গর্ভবতী হতেন? পর্দার মাথায় কুঠারাঘাত হেনে শুধু হিন্দুরাই নয়, খ্রীষ্টান, ইহুদি ও মুসলমানগণও অবাদ মেলামেলার সুযোগ নিচ্ছে। হযরতের আবির্ভাবের পূর্বে আরবের নারীগণ ইচ্ছামতো ধর্ষিতা হতো। এরা তখন মুসলমান ছিল না, ছিল পৌত্তলিক, খ্রীস্টান, ইহুদি। সে অন্ধকার যুগে নারীর অবস্থা ছিল শোষিতা, নিপীড়িতা ও নির্যাতিতা।

[১]. সুবল চন্দ্র মিত্রের, সরল বাংলা অভিধান, ৮ম সং. নিউ বেঙ্গল, (প্রাঃ) কলিকাতা-১৯৮৫, পুত্র শুব্দের ব্যাখ্যায়,

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম নারীকে পূর্ণ মানবিক মর্যাদার উচ্চতম পর্যায়ে এনে আসন দিয়েছে। ইসলাম নারীকের শিক্ষাদীক্ষায় ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে এমনকি অধ্যাত্মিকভাবে ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছে। পূর্বে যেখানে নারীকে মানুষ বলে স্বীকৃতি দিতে ও সবাই প্রস্তুত ছিল না, সেখানে ইসলামেই শুধু তাকে পূর্ণ মানুষ বলে ঘোষণা করেছে এবং তাকে সেবা করা ও শ্রদ্ধা করাকে আল্লাহর ইবাদতের সমতুল্য বলে ঘোষণা করেছে।

মানব-প্রকৃতি, বিশেষত নারী প্রকৃতিতে যে লজ্জাশীলতা আছে, এর সংরক্ষণ অতীব জরুরী। পরস্পর দেখা সাক্ষাতের ব্যাপারে ইসলাম নির্ধারিত সীমালংঘন না করাই এর প্রকৃষ্ট উপায়। আসলে ইসলামে আনুগত্যের ভিত্তি হল ঈমান।

মানুষ সৃষ্টির সেরা। সুতরাং তার বৈশিষ্ট্য রক্ষা কল্পে ইসলাম মানুষের মান-সম্মান ও তার বৈবাহিক জ্ঞাতিত্ব রক্ষা করে এবং এ জন্যই তার যৌন উত্তেজনাকে সীমিত রাখার নির্দেশ দেয়। ইসলাম যৌন বাসনাকে সংযত করে, নষ্ট করে না। আবার ইতর প্রাণীর ন্যায় মনের আনন্দে বিচরণ করে যেখানে সেখানে যৌন বাসনা চরিতার্থ করার অনুমতিও প্রদান করে না; বরং সুনির্দিষ্ট বিধি নিষেধ দ্বারা ইসলাম যৌন বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করে।এই বিধি নিষেধ মেনে চললে সমাজে কোন প্রকার যৌন সমস্যার উদ্ভব সম্ভব নয়। কারণ, যৌন বাসনা অসংযত ভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে এমন যাবতীয় বিষয়ই ইসলামে নিষিদ্ধ হয়েছে। আর তাই নারীর সম্ভ্রম ও শালীনতা রক্ষার্থে নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ

“নারীরা আড়ালে থাকার বস্তু। আড়াল হইতে নারী বাহির হইলেই শয়তান তার প্রতি উঁকি মারে।[১]

এর ব্যাখ্যায় বলা যায়-নারী যদি পর্দা মেনে না চলে তবে সে বিপথ গামী হতে উস্কানী যোগায় তার প্রদর্শিত লোভনীয় অঙ্গগুলো। আর তখনই পুরুষের লুলোপ দৃষ্টি পড়ে নারীর ওপর। যা তার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

নারী শালীনতা সংরক্ষণে ইসলামী ব্যবস্থাঃ (হিজাব)

হিজাব সম্পর্কে আল্লাহ্‌র নির্দেশঃ নারী শালীনতা সংরক্ষণ কালে দৃষ্টি সংযম, গুপ্তাঙ্গের হিফাজত এবং নারী সৌন্দর্য প্রদর্শনে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে সম্বোধন করে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেনঃ

---

[১] . বুখারী শরীফ, তর্জমা মাওলানা শামসুল হক। ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্টা-৩৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ○ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ.

"হে রাসূল! ইমানদারগণকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং যৌন অঙ্গের হিফাজত করে। ইহাই তাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা। তারা যা কিছুই করে, আল্লাহ্ তা'আলা তৎসম্পর্কে অবশ্যই অবগত আছেন। আর ঈমানদার নারীদিগকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং নিজের যৌন অঙ্গের হেফাজত করে ও যা স্বতঃই প্রকাশ হয়ে পড়ে, উহার ব্যতীত তারা যেন তাদের যীনাত অর্থাৎ সৌন্দর্য প্রদর্শণ না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। তাদের স্বামী ও, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, আপন ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র, আপন ভগিনী পুত্র, তাদের আপন স্ত্রী লোকগণ, স্বীয় অধিকারভূক্ত অনুগত দাস-দাসী, যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্মন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত অপর কারও নিকট যেন তারা নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। (আর নারী দিগকে আরও আদেশ করুন) তারা যেন পথ চলার সময় এমন পদধ্বনি না করে যাতে অপ্রকাশিত সৌন্দর্য পদধ্বনিতে প্রকাশ হয়ে পড়ে।"[১]

এই আয়াতে নারী ও পুরুষ উভয়কেই তাদের দৃষ্টি অবনমিত করে রাখতে ও তাদের গুপ্ত অঙ্গের হিফাজত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু নারীর জন্য ইহাই যথেষ্ট নয় বলে তাদেরকে আরও অতিরিক্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তা হল তারা যেন নিজেদের যীনাত (সৌন্দর্য) প্রদর্শণ না করে, তবে যা এমনিতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে, সেটা ভিন্ন কথা। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন চাদর দ্বারা ঢেকে রাখে এবং পথ চলাকালে তারা যেন খুব সাবধানতা অবলম্বন করে। পদধ্বনিতে যেন তাদের অপ্রকাশিত সৌন্দর্য প্রকাশ না হয়ে পড়ে।

---

[১]. আল্-কুরআন, ২৪:৩০-৩১।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে নারীর সতীত্বের মর্যাদাঃ

কুরআন মাজীদ যেহেতু আল্লাহ্ তায়ালার আখেরী ও পূর্ণ সংবিধান, তাই তার আঁচলে মানবজাতির জান-মাল ও ইজ্জত আবরু হেফাজতের পূর্ণ বিধান রয়েছে।

ইজ্জত-আবরু রক্ষার ব্যাপারে আল্ কুরআন যেসব কাজকে অপরাধ সাব্যস্ত করেছে, সেগুলোকে ফিক্হের পরিভাষায় "হদ্দ" (দন্ডবিধি) বলে তা দুই প্রকার। নারীদের সাথে ব্যাভিচার ও ব্যাভিচারের অপবাদ। ইজ্জত আবরুর ব্যাপারে আল্ কুরআন নারীকে এত উচ্চ স্থান দিয়েছে যে, তার ইজ্জত রক্ষার জন্য হদ্দ জারী করেছে। এ ব্যাপারে পুরুষের যে অপবিত্র চাহিদা নারীর উপর প্রভাব ফেলতে পারে, তা বন্ধের জন্য সংরক্ষণের তদবীর নির্ধারণ করেছে।

সতীত্ব রক্ষার প্রথম তদবীরঃ (ব্যবিচার না করা)

যদি কোন পুরুষ নারীর আবরুকে ধ্বংশ করে বা তার সতীত্বের উপর হস্তক্ষেপ করে ও নারীকে বাধ্যতামূলক অপকর্মে লিপ্ত করে। এমতাবস্থায় পুরুষকে পাথর নিক্ষেপ করা হবে অথবা একশত বেত্রাঘাত করা হবে। যেহেতু নারী নিরপরাধ তাই তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। হ্যাঁ! যদি নারী-পুরুষের উভয়ের সম্মতি থাকে, তবে উভয়কে দন্ডবিধি প্রদান করা হবে, যেহেতু তারা উভয়েই সমান অপরাধী।

সর্বপ্রথম উক্ত ব্যবিচারের অপরাধের ভয়াবহতার দিক লক্ষ্য রেখে আল্ কুরআনে তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَا تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً

"আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়োনা। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।"[১] উক্ত আয়াতে এই নির্দেশ নেই যে, ব্যভিচার করো না। বরং নির্দেশ হচ্ছে, তার কাছেও যেয়ো না। অর্থাৎ, সে সমস্ত কাজের নিকট ও যেয়োনা, যেগুলো ব্যবিচারের কাছাকাছি এবং ব্যভিচার পর্যন্ত তোমাকে পৌঁছে দিবে।

---

[১]. আল্-কুরআন, ১৭ঃ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

এবার বাকী রইল ব্যভিচারের বিষয়। সে ব্যাপারে নির্দেশ হচ্ছে, তা অশ্লীল কাজ ও পরিস্কার মন্দ পথ। আশ্লীলতার ব্যাপারে নির্দেশ হচ্ছে-

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

আপনি বলে দিন, আমার পালন কর্তা কেবল মাত্র অল্লীল বিষয় সমূহ হারাম করেছি যা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে।[১]

অর্থাৎ অশ্লীল বিষয় আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছে। যেহেতু ব্যভিচার অশ্লীল, তাই আল্লাহ তায়ালার নিকট তা হারাম।

অশ্লীলতা সম্পর্কে অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে-

وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ

তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন।[২]

অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা হল, যেন সমাজে আশ্লীলতা প্রকাশ না পায় ও তার বান্দারা অশ্লীল কাজে লিপ্ত না হতে পারে। অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে সীমাতিক্রম করা।

অতএব ব্যবিচারে লিপ্ত হওয়া মানে আল্লাহ্‌র সীমালংঘন করা ও তার নির্ধারিত সীমাতিক্রম করা। এটা আল্লাহ্‌র নিকট জঘন্য অপরাধ। তাই "আল্লাহ্ তায়ালার সীমা" সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে-

تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا

"এই হলো আল্লাহ্ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা। অতএব এর কাছেও যেও না।[৩] অন্য আয়াতে হাঁ এবং না উভয় দিকের ফলাফল পরিস্কার করে বর্ণনা করে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُO وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ.

[১]. আল্-কুরআন, ৭ঃ-৩৩।
[২]. আল্-কুরআন, ১৬ঃ৯০।
[৩]. আল্-কুরআন, ২ঃ৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

"এগুলো আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা, যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ মত চলে, তিনি তাকে জান্নাত সমূহে প্রবেশ করাবেন। যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবেশ হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হল বিরাট সাফল্য। কেউ কেউ আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে। তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।[১]

অতএব ব্যভিচার হতে সংরক্ষণের তদবীর সমূহ হতে প্রথম তদবীর হচ্ছে-আল্-কুরআনে তা হারাম হওয়ার বিষয় বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, এ কাজ অশ্লীল ও হারাম। আল্লাহ্র সীমা লংঘন করা। যার ফলাফল হল জাহান্নামের বেদনা দায়ক শাস্তি।

সতীত্ব রক্ষার দ্বিতীয় তদবীরঃ (যিনা না করা)

সতীত্ব রক্ষার দ্বিতীয় তদবীর রাসূল (সাঃ) এর ভাষায়-

ব্যভিচারের গুনাহ শিরকের গুনাহের সমান। যিনা শিরকের সমান। শিরকের পর বড় গুনাহ হল যিনা। শিরকের পর তার চেয়ে বড় পাপ আর নেই যে, এমন রেহমে বীর্যপাত করা যা তার জন্য হালাল ছিল না।[২]

যিনার কারণে আল্লাহ্র লজ্জা আসে। আল্লাহ্র শপথ! কোন নারী বা পুরুষ যিনা করার ব্যাপারে আল্লাহর চেয়ে অধিক আত্মসম্ভ্রমবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি কেউ নেই। আল্লাহর কসম! তিনি সম্পর্কে আমি যা জানি, যদি তা তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা হাসি কমিয়ে দিয়ে বেশি কাঁদতে। [৩]

যিনাকারীর মুখ জাহান্নামের অগ্নিদ্বারা জ্বালানো হবে। যিনাকারীদের মুখ জাহান্নামের আগুনে ভস্মিভূত করা হবে। অগ্নিতে তাদের মুখ জ্বলে উঠবে।[৪]

ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর চামড়া কেঁচি দ্বারা কাটা হবে। আমি মিরাজ রজনীতে দেখেছি, কতিপয় লোকের চামড়া কেঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। আমি জিবরাঈল (আঃ) কে জিজ্ঞেস করে অবহিত হলাম যে, এরা সে সকল নারী-পুরুষ, যারা যিনার জন্য সাজ-সজ্জা করত।[৫]

---

[১]. আল্-কুরআন, ৪ঃ১৩-১৪।
[২]. কানযুল উম্মাল, বৈরুত, ১৯৮১ইং, খ.৫, পৃ.৩১৪।
[৩]. ইমাম বুখারী, সুনান, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৩৫৪।
[৪]. ইমাম তিবরিযী ইবন তাবরানী, সগীর, বৈরুত, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৩ ইং, খ.২, পৃ.১৪০৯।
[৫]. ইমাম বায়হাকী, বায়হাকী, প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ.২৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত হাদীস সমূহ হতে শিক্ষাই পাই যে আখেরাতের কঠিন শাস্তির ভয় দেখিয়ে ইসলাম নারীর সতীত্ব রক্ষার প্রয়াস চালিয়েছে। অন্যদিকে ব্যভিচারী মানুষ নয়; পশুর চেয়ে ও অধম। এজন্য ইহাকে দন্ডনীয় অপরাধ সাব্যস্ত করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেনঃ

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ উভয়কে একশত করে বেত্রাঘাত কর এবং আল্লাহর আইনের ব্যাপারে তাদের প্রতি কখনও অনুকম্পাশীল হবে না যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনে থাক। আর তাদিগকে শাস্তি প্রদানকালে মুসলমানগণের একটি দল যেন উহা দেখার জন্য উপস্থিত থাকে।[১]

নারী ও পুরুষ উভয়েই অবিবাহিত অবস্থায় ব্যবিচার করলে প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করার নির্দেশ এই আয়াতে প্রদান করা হয়েছে। ব্যভিচার স্বেচ্ছায় বা অনিচছায়,বল প্রয়োগে বা উভয়ের সম্মতিক্রমে, যে প্রকারেই হউক না কেন, দয়ার বশীভূত হয়ে বা অন্য কোন কারণে এই শাস্তি কমানো যাবে না।

ইসলামে শাস্তির বিধান প্রতিরোধমূলক। এইজন্যই লোকজনের উপস্থিতিতে শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন তারা উহা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে। ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হয়ে পড়ে এবং এমন জঘন্য কাজে কখনও লিপ্ত না হয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, অবিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করলে রাসূল (সাঃ) তাকে এক বছরের জন্য নির্বাসন ও আইনগত দন্ড অর্থাৎ একশত বেত্রাঘাত নির্দেশ দিয়েছেন।[২]

অবিবাহিত ব্যক্তির এই দন্ডের উদ্দেশ্য হল, বেত্রাঘাত দ্বারা দৈহিক শাস্তি ও জনসমক্ষে অপরাধীকে লজ্জা প্রদান এবং নির্বাসন দ্বারা প্রিয় বস্তু হতে তাকে দূরে সরিয়ে রাখা, যাতে সে মানিসক শাস্তিও ভোগ করে। দৃষ্টান্ত ও প্রতিরোধমূলক শাস্তি এরূপ হয়ে থাকে।[৩]

---

[১]. আল্-কুরআন, ২৪ঃ২

[২]. ইমাম র্বুখারী, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.২০০৫; ইমাম মুসনাদে আহমদ, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৪৫৩।

[৩]. শাহ্ ওলীউল্লাহ (র) হুজ্জাতুল্লাহিল; থানবী, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া-১৮৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

"গামিদ বংশের জনৈকা নারী যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট এসে ব্যভিচার করেছে বলে স্বীকার করল, তখন তিনি তার জন্য বক্ষ পর্যন্ত গভীর এক গর্ত খনন করালেন এবং তৎপর (তাকে গর্তে নামায়ে) লোকজনকে তার উপর প্রস্তর নিক্ষেপের আদেশ দিলেন। অনন্তর তারা প্রস্তর নিক্ষেপের দ্বারা হত্যা করে ফেলল।[১]

যদি চারজন স্বাধীন মুসলমান পুরুষ কোন পুরুষ বা নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের সাক্ষ্য প্রদান করে এবং স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সে ব্যবিচার কার্য করেছে বলে চাক্ষুষ প্রমাণ দেয়, তবে বিচারক তার উপর প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু দন্ডের আদেশ প্রদান করবেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"যাহারা সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর তাহারা স্বপক্ষে চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করিতে না পারে, তাহাদিগকে আশি বেত্রাঘাত কর এবং ভবিষ্যতে কখনও তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিও না। আর এমন লোকেরাই দুষ্কর্মশীল, পাপী। যদি তৎপর তাহারা তওবা করে ও নিজেদের কার্য সংশোধন করে, তবে নিশ্বয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু।[২]

যৌন অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে ব্যভিচারের জন্য কঠিন শাস্তি বিধিবদ্ধ হয়েছে যেন সমাজে কেহই এই জঘন্য পাপ করতে সাহসী না হয়। আবার কেউ যেন মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি না করে, তজ্জন্য ইসলাম ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ প্রদান কারীদের ও শাস্তির বিধান রেখেছে। এভাবেই ইসলামে নারীর সতীত্ব রক্ষার ব্যবস্থা করেছে।

সতীত্ব রক্ষার তৃতীয় তদ্বীরঃ (গায়েরে মাহরামের সহিত নির্জন সাক্ষাত ও স্পর্শ থেকে বিরত থাকা)

সতীত্ব রক্ষার তৃতীয় তদবীর হল, গায়েরে মাহ্রামের সাথে অবাধ মিলামিশা থেকে বারণ করা হয়েছে। এ ধরণের অবাধ মিলামিশাই অধিকাংশ যিনার কারণ। তাই ইসলাম নারীর সতীত্বের হেফাজতের জন্য আইনগত আবশ্যক করে দিয়েছে যে, গায়ের মাহরাম নারী-

---

১. ইমাম আবূ য়ুসূফঃ কিতাবুল খারাজ, উর্দূ সংস্করণ, মাকতাবায়ে চেরাগে রাহ্,করাচী-১৯৬৬, পৃষ্ঠা-৪৬১-৪৬২।
২. আল্-কুরআন, ২৪ঃ৪-৫।

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষ অবাধভাবে মিলামিশা করতে পারবে না। রাসূল (সাঃ) হতে এ ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যে গুলোতে অবাধ মিলামিশা থেকে বারণ করা হয়েছে। এরূপ কয়েকটি হাদীস নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ"গায়েরে মাহরামের নিকট প্রবেশ করা সম্পর্কে হযরত উক্‌বা বিন আমের (রা) বলেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন-গায়রে মাহরাম নারীর নিকট প্রবেশ করা থেকে বিরত থেকো।[১]

শুধুতাই নয় গায়রে মাহ্‌রাম মহিলার ঘরে শয়ন হতে বারণ করা হয়েছে। হযরত জাবের (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (রা) ইরশাদ করেন-

কোন ব্যক্তি কোন গায়রে মাহরাম বালেগা মহিলার ঘরে স্বামী বা মাহ্‌রাম বিহীন রাত্রি যাপন করা উচিত নয়।[২]

যৌন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকল্পে ইসলাম নারীর সহিত অপর পুরুষের নির্জন সাক্ষাৎকার একেবারে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

হযরত ওমর (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, "রাসূলে করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-"যখন কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে এক স্থানে বসে, তখন সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি শয়তান থাকে।"(তিরমিযী)

উপরোক্ত হাদীসে বুঝানো হয়েছে গায়রে মাহরাম নারী ও পুরুষ একাকীত্বে বসতে পারবে না। কারণ একাকীত্বের সুযোগে তারা শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে খারাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে।

ইসলাম স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের সাথে অবাধ মিলামিশা করতে বারণ করেছে। হযরত উক্‌বা ইবন আমের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ "সাবধান, নির্জনে মহিলাগণের নিকট যেও না। একজন আনসার জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, দেবর সম্বন্ধে আপনি কি বলবেন? তিনি উত্তরে বলেনঃ সে তো মৃত্যু তুল্য।"[৩]

[১]. ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.২০০৫.
[২]. ইমাম মুসলিম, সহীহ, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.১৭২২।
[৩].ইমাম আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ বিন 'ঈসা তিরমিযী, সুনান, রিয়াদ, দারুস সালাম, ২০০০, রিদা অধ্যায়, ১৬ নং পরিচ্ছেদ; ইমাম মুসনাদে আহমদ, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.১৪৯; ইমাম বুখারী, সহীহ, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য নারী এসকল লোককে এমন ভাবে ভয় করা উচিত, যেমন মৃত্যুকে ভয় করে। হযরত মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ) এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর "লুমআত" গ্রন্থে লিখেছেন-

"নিকট আত্মীয়দের ব্যাপারে ভয় বেশি এবং তাদের পক্ষ থেকে ফিৎনায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনা ও বেশি। কেননা তাদের একাকীত্ব গ্রহণ করা ও মিলামিশা করা দোষণীয় মনে করা হয় না।"

সুগন্ধি ব্যবহার করে যখন নারী গায়রে মাহরামের মজলিসে যায় তখন সে ব্যভিচারিণীর হুকুমে। হাদীসে আছেঃ "নারী যখন আতর ও সুগন্ধি ব্যবহার করে এমন মজলিসে অংশ গ্রহণ করে, যেখানে গায়েরে মাহরামও আছে, তবে সে ব্যভিচারিণীর অন্তর্ভূক্ত।"[১]

এখানে নারীকে উগ্র প্রসাদনী বা সুগন্ধি ব্যবহারে করে কোন পুরুষ মহলে যেতে নিষেধ করেছেন কারণ এতে নারীর প্রতি পুরুষ যৌন আবেদন অনুভব করতে পারে।

নারীকে স্বামী ব্যতীত অপর পুরুষের পক্ষে স্পর্শ করা ও ইসলামে নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ

যার সহিত তার কোন বৈধ সম্পর্ক নাই, এমন কোন নারীর হস্তযদি কেহ স্পর্শ করে তবে কিয়ামত দিবসে তার হাতের উপর জ্বলন্ত অগ্নি রাখা হবে।[২]

নির্জন সাক্ষাত বা গায়রে মাহরামকে স্পর্শ ইসলামে নিষিদ্ধ। কোন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে পুরুষ না থাকলে সেখানে যাওয়া উচিত নয়। এ ব্যাপারে কুরআনে আল্লাহ্ ইরশাদ করেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ○ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

[১]. ইমাম আবু দাউদ, সুনান, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৬২৫।
[২]. ইবন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, তারিখ বিহীন. খ.৯, পৃ.৩২৩।

Dhaka University Institutional Repository

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কাহারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না লইয়া ও তাহাদিগকে সালাম না দিয়া প্রবেশ করিও না। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যাহাতে তোমরা সতর্ক হও। যদি তোমরা গৃহে কাহাকেও না পাও, তাহা হইলে তোমাদিগকে যতক্ষণ না অনুমতি দেওয়া হয়, ততক্ষণ উহাতে প্রবেশ করিও না। যদি তোমাদিগকে বলা হয় ফিরিয়া যাও, তবে তোমরা ফিরিয়া যাইবে। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা যাহা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। যেই গৃহে কেহ বাস করে না, যাহাতে তোমাদের জন্য উপকার থাকিলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোন দোষ নাই এবং আল্লাহ জানেন যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং যাহা তোমরা গোপন কর।"[১]

এভাবে গায়রে মাহরামের সহিত নির্জন সাক্ষাতকে নিরুৎসাহিত করে নারীর সতীত্বকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছে ইসলাম।

সতীত্ব রক্ষার চতুর্থ তদবীরঃ (পর্দা প্রথা ও দৃষ্টি নিয়ন্ত্র)

নারীর সতীত্ব রক্ষার চতুর্থ তদবীর অবলম্বন করা হয়েছে, যা নারীদের জন্য পর্দাপ্রথা ও দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা আবশ্যক করে। কারণ, এ ব্যাপারে ফিৎনার প্রথম দরজা হল বেপর্দা ও দৃষ্টিপাত। কারণ গায়রে মাহরাম (যাদের সহিত বিবাহ হারাম নহে) নারী পুরুষের পরস্পর দর্শনে উভয়ের জন্য অনাচারের সৃষ্টি হতে পারে। অনাচার হওয়া স্বভাবিক এবং দর্শন হতে উহার সূত্রপাত ঘটে। তাই ইসলামে দৃষ্টি সংযত করার নির্দেশ দিয়ে প্রথমেই ইহার পথ রুদ্ধ করা হয়েছে। কুদৃষ্টিতে দর্শনকে চক্ষুর ব্যভিচার বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু চলাফেরা করার সময় কারো উপর দৃষ্টি না পড়া সম্ভব নহে। সুতরাং প্রথম দৃষ্টি মাফ আর দ্বিতীয় দৃষ্টি হিসাব-নিকাশ যোগ্য।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ

يا على لاتتبع التطرة النظرة فان لك الاولى وليس لك الاخرة-

"হে আলী! প্রথম দৃষ্টির পর দ্বিতীয়বার তাকাইবে না। প্রথম দৃষ্টি ক্ষমা করা হইবে। কিন্তু দ্বিতীয়বার তাকাইলে ইহা ক্ষমা করা হইবে না।"(আবূ দাউদ, তিরমিযী)

[১] . আল্-কুরআন, ২৪ঃ২৭-২৯।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং কোন মহিলার উপর যদি হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে তবে প্রথম দৃষ্টিকে শরীয়াতে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়বার দৃষ্টি নিক্ষেপ নিষিদ্ধ হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) আরও বলেছেনঃ

"যে ব্যক্তি কোন আজ্নবী (যার সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ নহে, এমন অপরিচিতা) নারীর প্রতি যৌন লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কিয়ামত দিবস তার চোখে উত্তপ্ত গলিত শীশা ঢালা হবে।"(ফাতহুল কাদীর)

আবশ্যকতার সময়ে আইনের শিথিলতাই ন্যায় বিচার দাবি করে। তাই চিকিৎসার জন্য বা মোকদ্দমার বাদী-বিবাদী অথবা সাক্ষীরূপে দেখা আবশ্যক হলে এই দেখাতে দোষ নাই। কোন নারী আগুনে পড়েছে, পানিতে ডুবছে অথবা কারো সতীত্ব নষ্ট হচ্ছে এমতাবস্থায় কেবল দেখাই নয়; বরং স্পর্শ করতে হলেও তাকে উদ্ধার করার নির্দেশ শরীয়াতে আছে।

দৃষ্টি অবনত সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হচ্ছেঃ

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ○ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা রয়েছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শণ না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার উড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে।[২]

[২]. আল্-কুরআন, ২৪:৩০-৩১।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত আয়াতে দৃষ্টি নত করার নির্দেশ রয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে, নারী পুরুষ সর্বদা দৃষ্টি অবনত রাখবে, বরং উদ্দেশ্য হল, সে সমস্ত বস্তুসমূহ থেকে দৃষ্টিনত রাখবে, যেগুলোর দিকে মুসলমানের দৃষ্টিপাত করা হারাম। আল্লামা ইমাম আবূ বকর জাস্সাস রাযী (র) লিখেছেনঃ "উক্ত নির্দেশ দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, আমাদের উপর যে বস্তুসমূহের দিকে দৃষ্টি হারাম করা হয়েছে, সেগুলো থেকে দৃষ্টি অবনতের নির্দেশ রয়েছে। এ কারণে যে, সম্বোধিত ব্যক্তিরা উক্ত উদ্দেশ্যের ব্যাপারে জ্ঞাত আছে। তাই এ বস্তু সমূহের উল্লেখ করেননি।"[১]

পর্দা সম্পর্কে আল্-কুরআনে নির্দেশ হচ্ছে-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً

"হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হয়। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"[২]

আল্লামা ইমাম আবূ বকর রাযী হানাফী (র) উক্ত আয়াতের আলোকে লিখেছেনঃ অর্থাৎ উক্ত আয়াত হতে বুঝা যায়, যুবতী মেয়েদেরকে বেগানা পুরুষ হতে নিজের চেহারা ঢাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, (ঘর থেকে) বের হওয়ার সময় পর্দানশীল ও সতীত্ব প্রকাশ করবে। যাতে লম্পটরা তাদের প্রতি লালসিত না হতে পারে।[৩]

সুতরাং নারীর প্রতি ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে-নারীগণ বের হওয়ার সময় চাদর জামা ও ওড়না ব্যবহার করবে যাকে পর্দা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

সতীত্ব রক্ষার পঞ্চম তদবীরঃ (সতর্ ঢাকা)

সতীত্ব রক্ষার পঞ্চম তদবীর অবলম্বন করা হয়েছে নারীদের পোষাকের ব্যপারে বিশেষ নিয়মাবলী প্রবর্তন করে। দেহের যে অংশ আবৃত করা ফরয (অবশ্য কর্তব্য), ইসলামে পরিভাষায় ইহাকে সতর বলে। তাফসীরে কাবীরে উল্লেখ আছে-ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে

---

১. আবু বকর ইবনে জাস্সাস ই. ফা. বা., আহ্কামুল কুরআন, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩১৪।
২. আল্-কুরআন, ৩৩ঃ ৫৯।
৩. আহ কামূল কুরআন, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৭২।

Dhaka University Institutional Repository

আরব নারীরা একে অপরের সম্মুখে নিঃসংকোচে উলঙ্গ হয়ে কাবা শরীফের তওয়াফ করত। স্নান ও মলত্যাগের সময় তারা উলঙ্গ থাকত। নারীরা এমন ভাবে পোষাক পরিধান করত যাতে তাদের বক্ষ, বাহু, ও কোমরের কিয়দংশ অনাবৃত থাকে। আজকাল নারীদের অবস্থা মোটেই উহা হতে ভিন্ন নয়। ইসলাম এই নগ্নতা নিষিদ্ধ করেছে এবং নারী-পুরুষের সতর নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেনঃ

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

হে আদম সন্তান! তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করা ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদের পরিচ্ছদ দিয়াছি।[১]

এই আয়াতের মর্ম অনুসারে নারী-পুরুষ উভয়ের দেহ আবৃত করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে রাসূলে কারীম (সাঃ) বলেনঃ

কোন পুরুষ কোন পুরুষকে এবং কোন নারী কোন নারীকে যেন উলঙ্গ অবস্থায় না দেখে।(মুসলিম)

অপর এক হাদীসে আছে তোমরা কেহ যখন স্বীয় স্ত্রীর নিকট গমন কর, সে যেন তখনও তার সতর আবৃত রাখে এবং গাধার ন্যায় একেবারে উলঙ্গ হয়ে না পড়ে।(ইবনে মাজাহ্)

এই নির্দেশাবলীর সঙ্গে সঙ্গে নারী পুরুষের সতর ও পৃথক পৃথক ভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

পুরুষের সতরঃ নাভী হতে হাঁটু মধ্যবর্তী অংশ পুরুষের সতর। কেবল স্ত্রী ব্যতীত অপর কেহই এই অংশ দেখতে পারবে না।

নবী করীম (সাঃ) বলেনঃ "হাঁটুর উপর হতে নাভীর নীচে যা আছে, উহা ঢাকিবার অংশ।"(দার কুতনী)

সুতরাং নারীর ন্যায় পুরুষেরও শরীরের ঐ অংশ আবৃত করে রাখতে হবে।

নারীর সতরঃ মুখমন্ডল ও হাতের কব্জী পর্যন্ত ব্যতীত সমস্ত শরীরই নারীর সতর। স্বামী ব্যতীত পিতা, ভ্রাতা ইত্যাদি সকল পুরুষের নিকটই এই সতর খোলা রাখা নিষিদ্ধ।

---

[১]. আল্-কুরআন, ৭ঃ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

নবী করীম (সাঃ) বলেনঃ "বালিকা সাবালিকা হলে তার দেহের কেবল মুখমন্ডল ও কব্জী পর্যন্ত হস্তদ্বয় ব্যতীত কোন অংশই দৃষ্টিগোচর হওয়া সঙ্গত নহে।"[১]

উক্ত হাদীসের মূল হল, চেহারা ও কব্জিদ্বয় ছাড়া নারীর পূর্ণশরীর সতর, অর্থাৎ তা ঢাকা ওয়াজিব। স্বামী ছাড়া সে কারো সামনে সতর উম্মোচন করতে পারবে না এবং তার দিকেও কেউ দৃষ্টিপাত করতে পারবে না এবং বৈধ হবে না। এমনকি এক নারীর জন্য অন্য নারীর সতর দেখা ও জায়েয নাই।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পাতলা কাপড় ব্যবহার করার ব্যাপারে হাদীসে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেনঃ لعن الله الكا سيات العاريات.

"আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ সেই সকল নারীর উপর, যারা কাপড় পরিধান করেও উলঙ্গ থাকে।"[২]

যারা এমন মিহি বস্ত্র পরিধান করে যে, যার ভিতর দিয়ে দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখা যায়, তাদিগকে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলা হয়েছে।

"একদা রাসূল (সাঃ) এর শালী আসমা (রা) এমন একটি পাতলা পোষাক পড়ে এলেন, যার দ্বারা শরীর আবৃত হয় না। বরং কাপড়ের নিম্ন ভাগের শরীর উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তখন রাসূল (সাঃ) মুখ ফিরিয়ে নিলেন ও তাঁকে সতর ঢাকার মাসআলা বলে দিলেন।"(মিশকাত)

মোদ্দাকথা হল, নারীর জন্য এমন পাতলা কাপড় পরিধান করা জায়েজ নেই, যা দ্বারা সতর আবৃত হয় না।

রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ "যে সকল নারী কাপড় পরিধান করেও উলঙ্গ থাকে, অন্যদের নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে ও নিজেরাও অন্যদের প্রতিআকৃষ্ট হয় এবং বড় উটের মত মাথা নেড়ে অহংকার করে চলে, তারা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।"[৩]

আরব জাহেলিয়াতের নারীগণ ওড়নার ব্যাপারে অনেক অসর্তক ছিল। তারা ওড়নাকে পিছনের দিকে ফেলে দিত। তাদের জামার বক্ষের অংশ প্রসস্ত থাকত। যার কারণে তাদের

---

[১]. আল ফিকহুল ইসলামী, ৩/২৫৮।

[২]. ইমাম মুসলিম, সহীহ, ৩য় খ. পোষাক ও সজ্জা অধ্যায়,

[৩]. ইমাম মুসলিম, সহীহ, পোষাক ও সজ্জা অধ্যায় (باب النساء الكاسيات الماريات الماعلات الميلات) হাদীস নং-১৬৮০। আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রীবা, বক্ষ ও তার চারপাশ উন্মুক্ত থাকত। ইসলামের দৃষ্টিতে যেহেতু এটা বেপর্দা ও হারাম, তাই ওড়না সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে- وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

"তারা যেন তাদের মাথার উড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে।"[১]

উক্ত আয়াতের আলোকে আল্লামা যামাখশারী (রহ) তাফসীরে কাশ্‌শাফে লিখেনঃ তাদের বক্ষের অংশ প্রশস্ত থাকত। যার ফলে তাদের গ্রীবা, বক্ষ ও বক্ষের চারপাশ উন্মুক্ত থাকত। তারা ওড়না পিছনে ফেলে দিত। ফলে তাদের গর্দানসমূহ, বক্ষসমূহ ও তার চারপাশ খোলা থাকত। এ কারণে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন ওড়না সম্মুখের দিকে ঝুলিয়ে দেয়। যাতে সবকিছু ঢাকা থাকে।

হযরত উমর (রাঃ) বলেনঃ নারীদিগকে এমন আট-সাট কাপড় পরিধান করতে দিও না যাতে শরীরের গঠন পরিস্ফুট হয়ে পড়ে। কারণ এতে করে পুরুষ মানুষ নারীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দিবে এং তাদের মধ্যে কামভাব জাগ্রত হবে যা নারীর জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে।

জাহেলিয়াত যুগের নারীরা অলংকার পরিধান করে ফিৎনার উপকরণ সমূহ সাথে নিয়ে পুরুষ মঞ্চের সৌন্দর্য বর্ধিত করত। জামার পরিধান করে ফিৎনার উপকরণ সমূহ সাথে নিয়ে পুরুষ মঞ্চের সৌন্দর্য বর্ধিত করত। জামার কাট-সাট এত নিপুন হত যে, শরীরের আকৃতি ও গঠন দর্শকের দৃষ্টি তাদের দিকে কেড়ে নিত।

ইসলাম ধর্মে উগ্রতার কোন স্থান নেই। মহিলাদের চলার সময় যেন পা হেলিয়ে না চলে সে সকল সৌন্দর্য গোপন রাখে যে গুলো প্রকাশ হয়।

পোশাক সম্পর্কে একটি মূল কথা অবশ্যই সকলকে স্মরণ রাখতে হবে। সে মূল কথাটি বলা হয়েছে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

হে আদম সন্তান, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের জন্যে এমন পোশাক নাযিল করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থানকে আবৃত করে এবং ভূষণও। আর তাকওয়ার পোশাক, সে তো অতি

[১]. আল্-কুরআন, ২৪ঃ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তম-কল্যাণকর। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাসমূহের মধ্যে একটি। সম্ভবত লোকেরা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে।[১]

প্রথমত আয়াতে গোটা জাতিকে-সমস্ত আদম সন্তাদের সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষই এর মধ্যে শামিল অর্থাৎ পরবর্তী কথা সমস্ত মানুষের পক্ষেই অবশ্য পালনীয়।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌ পোশাক ও ভূষণ নাযিল করেছেন। পোশাক এমন, যা মানুষের-স্ত্রী-পুরুষ সকলের লজ্জাস্থানসমূহকে পূর্ণ মাত্রায় আবৃত করে, তার কোন অংশই অনাবৃত-উলঙ্গ থাকে না, আল্লাহ্‌ শুধু পোশাকই নাযিল করেন নি সেই সঙ্গে তিনি ভূষণ-শোভাও মানুষের জন্যে নাযিল করেছেন। অন্য কথায়, একটা পোশাক পরাই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে যথেষ্ট নয়, যবুথবুভাবে দেহাবয়ব আবৃত করলেই চলবে না, সে সঙ্গে তাকে ভূষণ-শোভা বৃদ্ধিকারকও হতে হবে।

ইসলাম ধর্মের আর্বিভাব হয়েছিল, যেন মানব বংশকে সঠিক মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। যে নারীকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মনে করা হত, যৌন চাহিদার কড়ি হিসেবে ব্যবহার করা হত ও সমাজে যাদের ইজ্জত আবরু ছিল না, তাদের জান-মাল ও ইজ্জত অবরু পূর্ণ সংরক্ষণ করা। ইসলাম একই নির্দেশে বর্বর যুগের সকল সৌন্দর্য প্রদর্শণকে হারাম করে দিয়েছে। তাদেরকে পর্দাকরার নির্দেশ দিয়েছে।

সতীত্ব রক্ষার ষষ্ঠ তদবীরঃ (অনুমতি প্রার্থনা)

অনুমতি প্রার্থনার মাসআলাকে সতীত্ব রক্ষার ষষ্ঠ তদবীর হিসেবে অবলম্বন করা হয়েছে। বালেগ পুরুষকে মহিলাদের ঘরে বিনা অনুমতি ও অবহিত করা ব্যতীত প্রবেশ করা থেকে বারণ করা হয়েছে। যাতে হঠাৎ মহিলাদের ঘরে ঢুকে তাদেরকে এমন অবস্থায় দেখতে না পায়, যা লজ্জা ও সম্ভ্রমের খেলাপ। যেমন মাথায় কাপড় অথবা ওড়না ফেলে মাথায় তৈল দিচ্ছে বা আপন সাজ-সজ্জায় মশগুল আছে বা নিত্য পরিহিত কাপড় রেখে সাধারণ কাপড় পরে গোসলের প্রস্তুতি নিচ্ছে বা স্বামীর সাথে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে আছে বা ঘরে একা বা বেপরোয়াভাবে নিদ্রা যাচ্ছে অথবা খোলামেলা সন্তানকে দুগ্ধদান করছে ইত্যাদি।

---

[১]. আল্-কুরআন, ৭ঃ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

সূরা নূর-এর মধ্যে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আহকাম রয়েছে। যেমন একস্থানে ইরশাদ হচ্ছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যগৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং সালাম প্রদান না কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।"[১]

উক্ত আয়াতে সে সকল লোকের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যারা সে গৃহের অধিবাসী নয়। অর্থাৎ, যদি কোন ব্যক্তি অন্যের ঘরে প্রবেশ করতে চায়, তবে তার জন্য জরুরী, সে যেন অনুমতি প্রার্থনা ও সালাম প্রদান করা ছাড়া প্রবেশ না করে।

বস্তুত আয়াতটিতে মুসলিম-নারী পুরুষের পরস্পরের ঘরে প্রবেশ করার প্রসঙ্গে এক স্থায়ী নিয়ম পেশ করা হয়েছে। মেয়েলোক নিজের ঘরের অভ্যন্তরে সব সময় পূর্ণাঙ্গ আচ্ছাদিত করে থাকা মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় মুহারম বা গায়রে মুহারম কোন পুরুষেরই প্রবেশ করা মোটেই সমীচীন নয়। জানান না দিয়ে মেয়েদের অপ্রস্তুত অবস্থায় গৃহে প্রবেশ করলে নারী দেহের যৌনাঙ্গের প্রতি নজর পড়ে কামভাব জাগ্রত হয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠে গোটা পরিবারকে তছনছ্ করে দিতে পারে। তাই ভিন পুরুষের নজর থেকে বাঁচার জন্যই এ ব্যবস্থা ইসলামে পেশ করা হয়েছে।

জাহেলিয়াতের যুগে এমন হতো যে, কারো ঘরের দুয়ারে গিয়ে আওয়াজ দিয়েই টপ্ করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করত, মেয়েদেরকে সামলে নেবারও কোন সময় দেয়া হত না। ফলে কখনো ঘরের মধ্যে পুরুষকে একই শয্যায় কাপড় মুড়ি দেয়া অবস্থায় দেখতে পেত, মেয়েদেরকে দেখত অসংবৃত বস্ত্রে।

এ জন্যে কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

---

[১]. আল্-কুরআন, ২৪ঃ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

"সেই ঘরে যদি কোন লোক না পাও তবে তাতে তোমরা প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তোমাদেরকে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হবে। আর যদি তোমাদেরক ফিরে যেতে বলা হয়, তাহলে অবশ্যই ফিরে যাবে। এ হচ্ছে তোমাদের জন্যে অধিক পবিত্রতর নীতি। তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ মাত্রায় অবহিত রয়েছেন।"[১]

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী ও হুযায়ফা (রাঃ) বলেছেনঃ یستأذن علی ذوات المحارم.

মুহারম মেয়েলোকদের কাছে যেতে হলেও প্রথমে অনুমতি চাইতে হবে।

কারো বাড়ির সামনে গিয়ে প্রবেশ-অনুমতির জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হলে দরজার ঠিক সোজাসুজি দাঁড়ানও সমীচীন নয়। দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে নজর করতেও চেষ্টা করবে না।

নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছেঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) বলেনঃ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى بات قوم لم يستقيل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الايمن اولايسر فيقول السلام عليكم.

"নবী করীম (সাঃ) যখন কারো বাড়ি বা ঘরের দরজায় এসে দাড়াতেন, তখন অবশ্যই দরজার দিকে মুখ করে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন না। বরং দরজার ডান কিংবা বাম পাশেসরে দাড়াতেন এবং সালাম করতেন।"(আবূ দাউদ)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ

لوان امرأ اطلع عليك بغيراذن فخذ فته بحصاة ففقات عينه ماكان عليك ضلع.

"কেউ যদি তোমার অনুমতি ছাড়াই তোমার ঘরে মধ্যে উঁকি মেরে তাকায়, আর তুমি যদি পাথর মেরে তার চোখ ফুটিয়ে দা, ও তাহলে তাতে তোমার কোন দোষ হবে না।"(বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ)

অনুমতি না পাওয়া গেলে কিংবা ঘরে কোন পুরুষ লোক উপস্থিত নেই বলে যদি ঘর থেকে চলে যেতে বলা হয় তাহলে অনুমতি প্রার্থনাকারীকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। তার সেখানে

---

[১]. আল্-কুরআন, ২৪ঃ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

আরো দাঁড়ানো এবং কাতর কণ্ঠে অনুমতি চাইতে থাকা সম্পূর্ণ গর্হিত কাজ। ইসলাম এরূপ কাজের অনুমতি দেয়নি। শুধু নারীর সম্ভ্রম রক্ষা ও হিফাজতের নিমিত্ত্ব।

এবার দেখা যাক সে সব লোক যারা ঘরে থাকে তাদের অনুমতি চাওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত হল, শরয়ী বাঁদী এবং নাবালেগ বাচ্চারা ফজরের নামাজের পূর্বে, দ্বিপ্রহরের সময় এবং ইশার পর বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারবে না। এছাড়া অন্য যে কোন সময় আসতে পারবে। এমন কেন? তার কারণ দর্শানো হয়েছে যে, এ তিনটি সময় পর্দা করার সময়। ইরশাদ হচ্ছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"হে মুমিনগণ! তোমাদের দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত-বয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে। ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র খুলে রাখ এবং ইশার নামাজের পর। এ তিন সময় তোমাদের দেহ খোলার সময়। এ সময়ের পর তোমাদের ও তাদের জন্য কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়। এমনিভাবে আল্লহ্ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[১]

অর্থাৎ ফজরের নামাজের আগে তাদের নিকট বিনা অনুমতিতে যেয়ো না। হতে পারে, সেই প্রিয় মুহূর্তে এমন এক গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে রয়েছে যে, অজান্তে তাদের সতর খোলা রয়েছে। এ অবস্থা দ্বিপ্রহরে ও হতে পারে যখন সবাই খানা আহার করে বিশ্রাম করে এবং অল্প কিছুক্ষণের অলসতার নিদ্রায় শুয়ে পড়ে। ইশার পর সাধারণতঃ রাত্রকালীন পোষাক পরে সবাই আপন-আপন স্থানে বেপরোয়াভাবে ঘুমিয়ে পড়ে। তাই সে সময়গুলোতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে যে, অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করো না।

পরিবারের অবশিষ্ট লোকদের বিধান হল, যখন আসবে যেন হঠাৎ প্রবেশ না করে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ

---

[১]. আল্-কুরআন, ২৪ঃ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যখন বয়োপ্রাপ্ত হয়, তারাও যেন তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অনুমতি প্রার্থনা করে। এমনিভাবে আল্লাহ তাঁর আয়াত সমূহ তোমাদের নিকট বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[১]

অর্থাৎ, যখন ঘরে বসবাসকারী বাচ্চারাও বয়োপ্রাপ্ত হবে এবং জাতিগত অনুভূতি ও যৌন চাহিদার সাথে পরিচয় লাভ করবে, তখন তাদের জন্যও অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে।

"মোদ্দাকথা হল, নিজ ঘরে অবস্থানকারীরাও তথায় যেতে হলে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন হঠাৎ ঢুকে না পড়ে। হ্যাঁ! আপন ঘর ও অন্য ঘরের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে যে, অনুমতি প্রার্থনা আপন ঘরের জন্য মুস্তাহাব, যেন অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। যাতে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে না হয়। কিন্তু অন্যের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাওয়া শুধু মুস্তাহাব নয়, বরং ওয়াজিব।"[২]

বাকী রইল, প্রথমে অনুমতি চাওয়া বা সালাম দেয়া। তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও যদি অনুমতি পাওয়া না যায়, তবেই এরূপ করতে হবে। হযরত আবূ সায়ীত খুদরী একবার হযরত উমর ফারুকের দাওয়াত পেয়ে তাঁর ঘরের দরজায় এসে উপস্থিত হলেন এবং তিনবার সালাম করার পরও কোন জবাব না পাওয়ার কারণে তিনি ফিরে চলে গেলেন।

পরে সাক্ষাত হলে হযরত উমর ফারুক বললেনঃ مامنعك ان تاتينا.
তোমাকে দাওয়াত দেয়া সত্ত্বেও তুমি আমার ঘরে আসলে না কেন? তিনি বললেনঃ

انی اتیت فسلمت علی بابك ثلاثافلم یرد علی فرجعت وقدقال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا استاذن احدکم ثلاثا فلم یؤذون له فلیرجع.

আমিতো এসেছিলাম, আপনার দরজায় দাঁড়িয়ে তিবার সালাম ও করেছিলাম। কিন্তু কারো কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে আমি ফিরে চলে এসেছি। কেননা নবী করীম (সাঃ) আমাকে

---

১. আল্-কুরআন, ২৪ঃ৫৯।
২. রাহমানী, আল্লামা আব্দুস সামাদ, নারী মুক্তি কোন পথে, বাড কম্পিউটার এন্ড পাবলিকেশন্স, অনুঃ মুঈনুদ্দীন তৈয়বপুরী, মুফতী, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-২৫০০, পৃষ্ঠা-৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেনঃ তোমাদের কেউ কারো ঘরে যাওয়ার জন্যে তিনবার অনুমতি চেয়েও না পেলে সে যেন ফিরে যায়।(বুখারী, মুসলিম)

এর ব্যাখ্যায় ইমাম হাসান বসরী বলেছেনঃ
তিনবার সালাম করার মধ্যে প্রথমবার হল তার আগমন সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া দ্বিতীয়বার সালাম প্রবেশের অনুমতি লাভের জন্যে এবং তৃতীবার হচ্ছে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা। কেননা তৃতীয়বার সালাম দেয়ার পরও ঘরের ভেতর থেকে কারো জবাব না আসা সত্যই প্রমাণ করে যে, পরে সালামের জওয়াব দেয়ারমত কোন পুরুষ নেই।

পুরুষ উপস্থিত নেই-এমন ঘরের মেয়েদের কাছ থেকে যদি কোন সাধারণ দরকারী জিনিস পেতে হয়; কিংবা একান্তই জরুরী কোন কথা, কোন সংবাদ জানতে হয়, তা হলে পর্দার বাইরে দাঁড়িয়েই তা চাইতে হবে, জিজ্ঞেস করতে হবে।

প্রথমে সালাম করবে। উক্ত অভিমতের সাথে হযরত কিলদা বিন জুম্বল (রা) একমত প্রকাশ করে বর্ণনা করেছেনঃ "আমি রাসূল (সাঃ) এর দরবারে হাজির হয়ে না সালাম দিলাম, না অনুমতি নিলাম। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, ফিরে গিয়ে বলঃ আসসালামু আলাইকুম প্রবেশ করার কি অনুমতি আছে?"[১]

সতীত্ব রক্ষার সপ্তম তদবীরঃ (বিনাপ্রয়োজনে ঘরের বাইর না হওয়া)

সতীত্ব রক্ষার জন্য সপ্তম তদবীর অবলম্বন করা হয়েছে যে, প্রয়োজনে বাইরে গেলে জাহেলিয়াত যুগের মহিলাদের মত বাইরে যেয়োনা। অন্যথা ঘরে থাক। আর যেতেই যদি হয় তবে ইজ্জত অব্‌রু রক্ষার্থে হিজাবের সহিত যেতে হবে।

ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً

"এবং তোমরা তোমাদের ঘরের অভ্যন্তরে মজবুত হয়ে স্থিতি গ্রহণ করো- স্থায়ীভাবে বসবাস করো এবং তোমরা প্রথম কালের জাহিলিয়াতের নারীদের মত নিজেদের রূপ সৌন্দর্য ও যৌবনদীপ্ত দেহাঙ্গ দেখিয়ে বেড়িও না।"[২]

---

[১]. তাফসীরে মাযহারী, পৃষ্ঠা-৪৮৭।
[২]. আল্-কুরআন, ৩৩ঃ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

আয়াতের প্রথম অংশে মেয়েলোকদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের ঘরেই স্থায়ীভাবে দৃঢ়তা সহকারে বসবাস করে। আর দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছে ঘরের বাইরে গিয়ে জাহিলী যুগের নারীদের মত লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে ভিন পুরুষদের সামনে হেসে গলে ঢলে পড় না, নিজেদের রূপ সৌন্দর্য ও যৌবনদীপ্ত দেহের ক্লান্তি দেখিয়ে বেড়িও না, আয়াতের প্রথমাংশ ঘর সম্পর্কে আর দ্বিতীয়াংশ ঘরের বাইরের সাথে সংশ্লিষ্ট।

আয়াতে ঘরে অবস্থান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়নি, নিষেধ করা হয়েছে জাহেলী যুগের নারীদের মত নির্লজ্জভাবে চলাফেরা করতে।

কুরআনের উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী করীম (সাঃ) মুসলিম মহিলাদের সম্বোধন করে বলেছেনঃ اذن لكم ان تخرجن لحاجتكن فى الخارى بغير لفظ لكم.

তোমাদেরকে তোমাদের প্রয়োজনের দরুন ঘরের বাইরে যেতে অনুমতি দেয়া হয়েছে।[১]

আল্লামা আলূসীর ভাষায় বলা যায়ঃ

المراد بالامربالاستقرار الذى يحصل به وقارهن وامتيارهن على سائر النساء بان يلازمن

البيوت فى اغلب اوقاتهن ولايكن خراجات ولاجات طوافات فى الطرق والاسواق وبيت الناكى.

মেয়েদেরকে ঘরে অবস্থান করতে নির্দেশ করা হয়েছে, কেননা এরই দ্বারা তাদের মর্যদা ও বিশিষ্টতা সাধারণ মেয়েদের উপর প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এর সঠিক অর্থ এই যে, তারা বেশির ভাগ সময় ও সাধারণত ঘরেই অবস্থান করবে এবং তারা খুব বেশি বাইরে গমনকারিণী, খুব বেশি লোকজনের ভিড়ে প্রবেশকারিণী, এবং হাটে-ঘাটে, দোকানে বিপণীতে ও লোকজনের ঘরে ঘরে যাতায়াতকারিণী হবে না।

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে "তাবাররুজ" করোনা। এ তাবাররুজ শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা জামালুদ্দীন আল-কাসেমী লিখেছেনঃ

'তাবাররুজ' মানে-হাস্যলাস্য ও লীলায়িত ভঙ্গীতে চলা, রূপ-সৌন্দর্যের প্রদর্শণী করা, ভিন্ পুরুষের মনে যৌন স্পৃহা জাগিয়ে তোলা, খুব পাতলা ফিনফিনে কাপড় পরা-যা মেয়েদের

[১]. ইমাম আবূ আবদুল্লাহ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, রিয়াদ, দারুস সালাম, ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

শরীর আবৃত্ত করে না, গলদেশ, কণ্ঠহার ও কানের দুল-বালার চাকচিক্য জাহির করা এবং এ ধরণেরই অন্যান্য কাজ।(محاسن التاويد ج ١٣ص ٤٨٤٧)

"মুব্রাদ বলেনঃ انتبدى من محاسنهاما يجب عليها ستره. মেয়েলোকের যে রূপ-সৌন্দর্য ঢেকে রাখা কর্তব্য, তাকে জাহির করাই হচ্ছে" 'তাবাররুজ'।[১]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা শাওকানী লিখেছেনঃ

وكان نساء الجاهلية تظهرمايقبح اظهاره حتى كانت المرأة تجلس مع زوجهاوخليلها فينفرد خليلها بمافو ق الازارالى على وينفردزوجها بهادون الازارالى لسفلها وربما سال احرشها صاحيه البدل.

জাহিলিয়াতের যুগে মেয়েরা তাদের দেহের অশ্লীল অঙ্গসমূহ উন্মুক্ত ও অনাবৃত করে চলত। এমনকি এক একজন মেয়েলোক তার স্বামী ও প্রণয়ীকে নিয়ে একসঙ্গে বসত। প্রণয়ী তার বস্ত্রের উপরিভাগ নিয়ে সুখ ভোগ করত আর স্বামী পরিতৃপ্ত হত তার দেহের বস্ত্রাবৃত নিম্নভাগ ব্যবহার করে। আবার কখনো কখনো একজন অপর জনের কাছ থেকে তার জন্যে নির্দিষ্ট অংশ অদল বদল করে নিতেও চাইত।[২]

এসব উদ্ধৃতি থেকে জাহেলিয়াতের নারী চরিত্র ও তদানীন্তন সমাজের বাস্তব ও প্রকৃত চিত্র উদঘাটিত ও উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে। মেয়েরা ঘর থেকে বেরুতে পারে। আয়াতে তা নিষেধ করা হয়নি, নিষেধ করা হয়েছে বাইরে গিয়ে এসব কাজ করতে, যা উপরের উদ্ধৃতিসমূহ থেকে প্রতিভাত হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে এই হচ্ছে জাহিলিয়াত-জাহিলিয়াতের "তাবাররুজ" যার সাথে এ যুগের সভ্যতা সংস্কৃতিসম্পন্না নারী সমাজের পূর্ণ মিল ও সাদৃশ্য স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে হাটে বাজারে, দোকানে-বিপণীতে পথে-পার্কে, হোটেল-রেস্তোরায় ও ক্লাবে-মিটিং এ। আর কুরআন মজীদে উপরোক্ত আয়াতাংশে এসব কাজকেই নিষেধ করা হয়েছে, চিরতরে হারাম করে দেয়া হয়েছে। যদিও নবী করীম (সাঃ) মেয়েদের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। পক্ষান্তরে একথাও বলেছেনঃ –وبيو تهن خيرلهن

"তাদের জন্য তাদের গৃহে অবস্থানই মঙ্গলজনক।"

---

[১]. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, পরিবারও পারিবারিক জীবন, (২য় প্রকাশ) খায়রুল প্রকাশনীঃ ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-২৮০।
[২]. মোল্লা আলী ক্বারী (র.), ফাতহুল কাদীর, ৪র্থ খন্ড, ২৬৯ পৃষ্ঠা।

Dhaka University Institutional Repository

নামাযের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ইবাদতের জন্যও নারীদিগকে জামাআতে শামিল হওয়ার নিমিত্তে উৎসাহিত করা হয় নাই।

হযরত উম্মে হুমায়দ সাইয়িদা (রাঃ) বলেঃ হে আল্লাহ রাসূল! আপনার সহিত নামাজ পড়তে আমার মন চায়। তিনি বললেনঃ আমি জানি। কিন্তু তোমার নিজের কামরায় নামাজ পড়া অপেক্ষা এক নিভৃতস্থানে নামায পড়া তোমার জন্য উৎকৃষ্ট। তোমার মহল্লার মসজিদে নামায পড়া অপেক্ষা তোমার বাড়ীতে নামায পড়া উৎকৃষ্ট এবং জামে'মসজিদে নামায হতে তোমার মহল্লার মসজিদে নামাজ পড়া উৎকৃষ্ট।[১]

অপর এক হাদীসে আছে-
"নারীর স্বীয় কামরায় নামাজ অপেক্ষা নিভৃত কক্ষে নামায উৎকৃষ্ট এবং কুঠুরী অপেক্ষা চোরা কামরায় নামায উৎকৃষ্ট।"(আবূ দাউদ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরও বলেনঃ حيرمساجل النساء قعر بيو هن
"গৃহের কোণই নারীদের জন্য উত্তম মসজিদ।"[২]
এর অর্থ হল গৃহের কোণে নামায পড়লেই নারীদের জন্য মসজিদে জামায়াতে নামাজ পড়ার সওয়াব মিলবে। অর্থাৎ নারীর মসজিদে গিয়ে নামায পড়ার অনুমতি থাকলেও পর্দার খাতিরে তাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এভাবে ঘরের বাইরে না যেয়ে বা প্রয়োজনে গেলেও তার সীমা নির্ধারণ করে দিয়ে ইসলাম নারীর আবরু ও সম্ভ্রম রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করেছে।

নারীদের ইজ্জত আবরু ও সতীত্ব রক্ষার নিমিত্তে আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ হচ্ছে-"তারা নিজের গৃহে থাকবে। পাপের বাসনা নিয়ে বাহিরে যাবে না, যেমনটি ছিল জাহেলী যুগে" উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য মোটেই এই নয় যে, হাত-পা বেধে ঘরে বসে থাকবে এবং বাইরে যেতে পারবে না।

তাফসীরে মাযহারীতে আছেঃ

সারকথা হল, "গৃহভ্যন্তরে অবস্থান করবে" এর উদ্দেশ্য কখনো এই নয় যে, হজ্জ করার জন্য মক্কা শরীফে যাবে না। মাতা-পিতার সাথে সাক্ষাতের জন্য তাদের নিকট যাবে না এবং স্বীয় প্রয়োজন পূরণে বাইরে যাবে না। কিন্তু জরুরী হল, প্রত্যেক কাজ সে সীমাসমূহের

[১]. ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, আল মুসনাদ, কায়রো, মাত্বা' আ আশ্শারকিল ইসলামিয়া ১৮৯৫ খ্রী. খ.২, পৃ.৭৬-৭৭।
[২]. ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, মুসনাদে আহমদ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯৮।

মধ্যেই করতে হবে, সেগুলোর সাথে যেগুলোকে সীমিত করা হয়েছে। যেমন হজ্জের জন্য সফর অবশ্য করবে,কিন্তু মাহ্‌রাম ছাড়া নয়।

আলোচ্য আয়াত হতে বুঝা যায়, নারী গৃহেই অবস্থান করবে এবং ইহাই তার কর্মক্ষেত্র। কিন্তু অনিবার্য কারণে সে গৃহের বের হতে পারবে। তবে বিনা প্রয়োজনে রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য বের হতে পারবে না। দরকার বশতঃ গৃহের বের হতে হলে নারীর অবশ্য পালনীয় বিষয় এইঃ

১) দূরের রাস্তা হলে কোন মুহরিম পুরুষকে সঙ্গে নিতে হবে।

২) সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্যের প্রদর্শণী করা এবং অলংকারাদির ঝন-ঝনানি শব্দ শোনানো যাবে না।

৩) এমন মিহি পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা যাবে না যার মধ্য দিয়ে দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখা যায় এবং গোটা দেহ চাদর তথা বোরখা দিয়ে ঢেকে নিতে হবে।

৪) পরিধেয় বস্ত্র এমন আট-সাট হবে না যেন দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিলক্ষিত হয়।

৫) কারো সাথে কথা বলতে হলে কোমল কণ্ঠে লালিত্য ও নমনীয়তার সহিত কথা বলবে না।

৬) অমুসলমান ও পুরুষের পোশাক পরিধান করতে পারবে না।

৭) আল্লাহ্‌ ভীতি ও লজ্জা শরম সর্বদা অন্তরে থাকতে হবে।

৮) প্রয়োজন শেষ হলে অনতিবিলম্বে নিজগৃহে ফিরে আসতে হবে।

শেষকথাঃ

যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা দমন ও নারীর শালীনতা সংরক্ষণের ইসলামী বিধান অতিসংক্ষেপে উপরে বর্ণিত হল। পূর্ববিকারহীন উন্মুক্ত মন ও সুস্থ প্রকৃতি অতিসহজেই বুঝতে পারবে, এটি দার্শনিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং গোটা মানবতার কল্যাণে অবশ্য পালনীয়। ইসলাম যৌন বাসনাকে বিনষ্ট করতে চায় না; বরং একে সুসংযত মধ্যপন্থায় এনে মানব বংশ এবং সভ্যতা রক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রদান করে। আজকাল নারীর স্কুল কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কারণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাদি বুঝে জীবন সংগ্রামে তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে হবে। অন্যথান তাদেরকে প্রতিবেশী জাতি সমূহের পেছনে পড়ে থাকতে হবে। এই অজুহাতে কেউ কেউ হয়তবা নারী শালীনতার ইসলামী

Dhaka University Institutional Repository

বিধান কিছুটা শিথিল করা আবশ্যক মনে করতে পারে। মেয়েদের উপযোগী শিক্ষা অবশ্যই তাদেরকে দিতে হবে, ইহা কেউই অস্বীকার করে না। কিন্তু ইসলামী বিধান রক্ষা করে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা অনায়াশেই করা যায়। তাদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। এতে নারী পুরুষ অবাধ মেলামেশার পথ ও রুদ্ধ হয়। সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আইনের কঠোরতা কিছুটা লাঘব করা যেতে পারে। তবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেই এর আবশ্যকতা যাচাই করতে হবে। আইনের কঠোরতা কেবল তখনই লাঘব করা যেতে পারে যখন আইনের আসল উদ্দেশ্য এতে বিনষ্ট না হয়ে পড়ে। দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা রক্ষা, অপরিমিত যৌনবাসনা দমন এবং যৌন উশৃঙ্খলতা প্রতিরোধকল্পেই ইসলাম নৈকিত শিক্ষা এবং প্রতিরোধ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে।

অধুনা ও অমুসলিম সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং জাহেলিয়াত গোটা দুনিয়া আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। অনৈসলামী জীবন পদ্ধতি, ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও ধ্যান-ধারণা জগতের সাংস্কৃতিক আবহাওয়া বিষাক্ত করে তুলেছে। অশ্লীল ও নগ্ন ছবি, নৃত্য-গীত, প্রেমিক প্রেমিকার অবাধ মিলন এবং প্রেম-নিবেদনের দৃশ্য এখন সমাজে প্রায় সকলের নিকটই সহনীয় ও উপভোগ্য হয়ে পড়েছে। নারী হরণ ও নারী ধর্ষণের ন্যায় অপরাধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাচ্ছে।

আর পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার বদৌলতে বিবাহ একটি সেকেলে প্রথা, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেলা নির্দোষ ও প্রশংসনীয় এবং ব্যভিচার এক প্রকার চিত্ত বিনোদন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব পালন অসহনীয় বন্ধন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ এবং স্ত্রী হওয়াটা বিপদ ও স্বামীর আনুগত্য বর্বরযুগের দাসত্ব বলে পরিগণিত হয়েছে। সন্তান জন্মদানে সাধারণত অনীহার সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রেমিক প্রেমিকা সেজে থাকাই জীবনের পরম সার্থকতা বলে মনে করা হচ্ছে।

অবস্থা যখন এমন সঙ্গীন হয়ে পড়েছে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা দমন ও নারী শালীনতা সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা ইসলাম প্রদান করেছে, পরিস্থিতি এতে কিছুটা শিথিলতার অনুমতি দেয় বলে আমরা মনে করিনা; বরং অধিকতর কড়াকড়িই দাবি করে বলে আমার বিশ্বাস।

পূর্বেই বলা হয়েছে, যৌন বাসনা একটি সহজাত প্রবৃত্তি। ইসলাম একে সংযত করে কল্যাণমূলক কাজে লাগাতে চায়; বিনষ্ট করতে চায় না। এ উদ্দেশ্যে সাধনের জন্যই ইসলাম বিবাহ প্রথা চালু করেছে এবং যৌন নোংরামী বন্ধ করেছে।

সর্বোপরি আমরা বলতে পারি ইসলাম পর্দাপ্রথা চালুর মাধ্যমে নারীর শালীনতা ও সম্ভ্রম রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহারঃ

আল্‌হামদুলিল্লাহ। বহুদিনের একটি ইচ্ছা পূর্ণ হইল। নারী সম্পর্কে লেখার পরিকল্পনা পূর্ব হতেই ছিল। আর তাই **"নারীর অবস্থার উন্নয়নে ধর্মের ভূমিকা"** শীর্ষক শিরোনামটি বেছে নেই। আল্লাহ তায়ালার নিকট অশেষ শুকরিয়া আমিও একজন নারী হিসেবে নারীকে ইসলাম কিভাবে মর্যাদা প্রদান করেছে তা ফুটিয়ে তোলার ক্ষুদ্র প্রয়াস খানি মহান রাব্বুল আলামীন আমার হাত দিয়ে সমাপ্ত করেছেন।

নারী প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বের একটি বিষয়। বিভিন্ন সভ্যতা, ধর্ম ও দর্শন নারীকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে থাকে। আমারর গবেষণার অভিসন্দর্ভখানিতে আলোচনা করে দেখানো হয়েছে যে, এদের কোনটাই তাকে যথাযথ মর্যাদা দিতে পারে নাই। কেবল ইসলাম তাকে সেই মর্যাদা দান করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান বা অবগতির অভাবে মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে। আর আমার গবেষণা কর্মে ইসলাম ধর্মই যে একমাত্র নারীকে মর্যাদার সঠিক আসনে আসীন করেছে তা প্রমাণ করার চেষ্টাই করেছি।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার দরবারে লাখ-লাখ শুক্‌রিয়া যে-তিনি আমাকে **"নারীর অবস্থার উন্নয়নে ধর্মের ভূমিকা"** শিরোনামের বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে ইসলাম ধর্মে নারীর যে অবস্থান তা লিখারও তাওফীক দান করেছেন। তাছাড়া ইসলাম বিদ্বেষীগণ ইসলামের বিরুদ্ধে প্রপাগন্ডা, মিথ্যাচার চালিয়ে বলে যাচ্ছে যে, ইসলাম নারীর প্রতি অবিচার করছে-এর প্রতিবাদে বিগত কয়েক দশক যাবৎ ইসলামী লিখক, প্রবন্ধকার ও চিন্তাবিগণ গ্রন্থ রচনা এবং বিভিন্ন সম্মেলনে-সেমিনারে বক্তব্য উপস্থাপন করে যাচ্ছে, আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তাদের কর্মকান্ডের সাথে সংযোজিত হলো।

অন্যদিকে ইসলামের বিরুদ্ধে এ মিথ্যাচারে প্রভাবিত হয়ে, মুসলিম যুবকরাই ইসলামের বেশী বিরোধিতা করছে। যাদের ইসলাম সম্পর্কে এতটুকু পরিমাণ জ্ঞানও নেই। আর মুসলিম বিশ্ব ইংরেজ ও সাম্রাজ্যবাদী আদিপত্যের সময় থেকে ইসলামের শত্রুদের মুখোমুখি হবার চেয়ে, অজ্ঞতা হেতু মুসলিম যুবকদের মুখোমুখিই হয়েছে বেশী।

তাই আমি আশা করবো যে, আমার এ গবেষণা সন্ধর্ভটি ইসলামী চিন্তাবিধগণের চিন্তার উত্তাল স্রোত ধারার সাথে আমার এ ক্ষীণ ধারা টুকু যুক্ত হয়ে ইসলামের বিজয় কেতন পত্‌পত্‌ করে উড্ডীয়মান রাখতে সচেষ্ট হবে। মুসলিমনারী সম্পর্কে ষড়যন্ত্র ও মিথ্যার অপনোদনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলেই আমার বিশ্বাস।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীনকে সর্বদা বিজয়ী রাখেন যদিও অনেকে তা বুঝতে অক্ষম।

আল্লাহ্‌ জাল্লাহ্‌ শা'নহু সকল মহৎ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

যে সমস্ত হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে

আল্-কুরআনুল কারীম

আল্লামা জালালুদ্দিন মহল্লী, আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহ) ঃ জালালাইন শরীফ, হামিদিয়া লাইব্রেরী, তারিখ বিহীন।

আজিজুল হক, সায়খুল হাদীস, মাওলানা ও আজাদ, আবূল কালাম, মাওলানা (অনুঃ) ঃ বোখারী শরীফ, (১-১০ খন্ড) মীনাবুক কর্ণার (১ম সং. ২০০৭)

আবদুল আল-মুমিন, হযরত মাওলানা (অনুঃ) ঃ মেশকাত শরীফ, ঢাকা, শামীম পাবলিসার্স-২০০৬।

আবূ তাহের মেছবাহ, মাওলানা (অনুঃ) ঃ হিদায়া, ঢাকা, ১ম সং. ২০০১।

আল-ফারগানী আল-মারগানানী, ঃ হিদায়া, (বেদায়া ব্যাখ্যা গ্রন্থ সহ) বৈরুত, দারুল ফিকহ্, ১৯৮০।

ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আল ইসমাঈল বুখারী ঃ সহীহ্ বুখারী, বৈরুত, তারিখ বিহীন
সহীহ আল্ বুখারী, রিয়াদ, দারুস সালাম-২০০০।

ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্ন আশ'আস ঃ সুনান, আবূ দাউদ, (৫ম খন্ড) সিরিয়া, দারুল হাদীস (১ম সং.) ১৯৭৩

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ঃ আল মুসনাদ আহমদ, (৩য় খন্ড) মক্কা, দারুল হায, (২য় খন্ড) ১৯৭৮

ইমাম আবূ 'ঈসা' মুহাম্মদ বিন 'ঈসা তিরমিযী ঃ সুনান, (৪র্থ খন্ড) মাতবা'আ, মুস্তাফা, তারিখবিহীন।

আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজা ঃ সুনান, (২য় খন্ড) বৈরুত, দারু ইহদইত তুরাম, (১ম সং.) তারিখ বিহীন।

ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাস আল কুশায়রী ঃ মুসলিম, সহীহ, বৈরুত, (২য় খন্ড, দারু ইহদইত, তুরাস, তারিখ বিহীন

শাইখুল ইসলাম বুরহানুদ্দিন আবূল হাসান আলী ইবনে আবূ বকর। হেদায়া, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা-১২১১

ইমাম নাসাঈ, আহম্মদ বিন শুআইব ঃ কিতাবু "ইশরাতিন নিসা, কায়রো মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৯৮৮ ইং

ইবন কাসীর, ইসমা'ঈল বিন 'উমর ঃ তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, কায়রো,দারুশ, শা'আব।

ওয়ালী উল্লাহ, দেহলভী, শাহ ঃ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্, মাকতাবা-ই-থানভী, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া, ১৯৮৬ খ্রীঃ

ইবন হাজার 'আসকালানী ঃ ফাতহুল বারী (শরহ্ সহীহিল বুখারী) বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, তারিখ বিহীন।

ইবন হাযম, যাহিরী, আলী বিন আহমাদ বিন সা'ঈদ ঃ আল-মুহাল্লা; কায়রো, মাকতাবাতু দারিত তুরাস।

ইমাম নাসাঈ, আহম্মদ বিন শু'আইব ঃ কিতাবু ইশরাতিন নিসা, কায়রো মাকতাবাতুস সুন্নাহ-১৯৮৮ইং।

কুরতুবী, মুহাম্মদ বিন আহ্মদ, ঃ আল-জমি'উ লি আহ্ কামিল কুরআন, কায়রো, দারুল কিতাবিল আরাবী-১৯৯৭ ইং।

মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (অনুঃ) ঃ সহীহ সুনান্ ইবন মাজাহ, মাফতাবাতু আরাবিয়াতিল 'আরাবী লি দুয়ালিল খালীজ-১৯৮৬ ইং।

মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল কুশায়রী ঃ সহীহ মুসলিম, কায়রো, ঈসা আল বাবী ওয়া শুরাকাউহু।

হাফিয আবূ আবদির রহমান,আহমাদ বিন শু-আইব ঃ সুনান, মাসাঈ (সুগরা) বৈরুত দারুল, ফিকর-১৯৩০।

হাফিয সুলায়মান বিন আশ'আস সাজাস্তানী ঃ সুনান আবূ দাউদ, আশ'আস সিজিস্তানী, বৈরুত, আল মাকতাবাতুল আরাবিয়াহ্ ।

শাউকানী মুহাম্মাদ বিন 'আলী ঃ নাইলুল আউত্বার শারহু মুন্তাকাল আখবার, কায়রো, মাকতাবাতুত তুরাস।

সূয়ূতী, জালালুদ্দীন বিন আবাদির রাহমান ঃ আদ-দুরারুল মুনতাসিরাহ ফিল-আহাদীসিল শুশতাহারাহ, বৈরুতঃ

		দারুল আরাবিয়াহ্ ১৯৮৪ ইং।
বদরুদ্দীন আইনী,	ঃ	উমদাতুল কারী, শরহে সহীহুল বুখারী, মিশর, মাতবা'আতু-মুসতাফা আল বাবী, ১৯৭২ ইং ,
ইমাম বায়হাকী, আহমাদ বিন 'আলী	ঃ	আস্-সুনানুল কুবরা, বৈরুত, দারুল ফিকর, তারিখ বিহীন,

প্রকাশিত যেসব গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে

আবদুল বাকী, মুহাম্মদ, ড.	ঃ	বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা। (১ম প্রকাশ) ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-২০০৫।
আবদুর রহীম, মুহাম্মদ	ঃ	কালেমা তাইয়্যেবা ঢাকা, বই-কিতাব প্রকাশী, ৯ম সংস্করণ, ১৯৮২ খ্রীঃ
	ঃ	হাদীস শরীফ ১ম খন্ড ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, ২৩তম সংস্করণ, ২০০৫ খ্রীঃ
	ঃ	হাদীস শরীফ ২য় খন্ড ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, ১১তম সংস্করণ, ২০০৫ খ্রীঃ
	ঃ	হাদীস শরীফ ৩য় খন্ড ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৫ খ্রীঃ
	ঃ	পরিবার ও পারিবারিক জীবন ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৮ খ্রীঃ
	ঃ	তাফহীমুল কুরআন (১-১৯) খন্ড, ঢাকা আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৮-১৯৭৯ খিঃ
	ঃ	ইসলামে জিহাদ ঢাকা ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করন-১৯৮৬।
	ঃ	বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রীঃ
	ঃ	ইসলাম ও মানবাধিকার, ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ১৮৮৯ খ্রীঃ
	ঃ	অন্যায় সত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ১৮৮৯ খ্রীঃ
	ঃ	অর্থনৈতিক সুবিচারে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৮ খ্রীঃ
	ঃ	আহকামুল কুরআন, ১ম ও ২য় খন্ড, ঢাকা, ই. ফা. বা. ১ম সংস্করণ ১৯৮৮ খ্রীঃ
	ঃ	ইসলামে নৈতিক দৃষ্টিকোন ঢাকা আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৯ খ্রীঃ
	ঃ	প্রাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলামী সমাজ ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৬ খ্রীঃ
	ঃ	নারী ও আধুনিক চিন্তাধারা ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রীঃ
	ঃ	নারী ঢাকা, সিন্দাবাদ প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৮ খ্রীঃ
আতাউর রহমান, মুহাম্মদ, কাশেমী	ঃ	ইসলামের দৃষ্টিতে নারী শিক্ষা, আল-আতহার একাডেমী, কাজী প্রিন্টার্স, ঢাকা-১৯৯৭ খ্রীঃ

Dhaka University Institutional Repository

আবূ তাহের, মুহাম্মদ, শফিউদ্দীন ঃ মহিলাদের হিজাব কেন
ঢাকা জামেয়া প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ২০০৭ খ্রীঃ

আব্দুল ফারুক, মুফতী ঃ নারীদের সুন্দর জীবন
ঢাকা আলিফ পাবলিকেসন্স, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রীঃ

আবূ তাহের রাহমানী, মাওলানা (অনুঃ) ঃ কুরআন হাদীসের আলোকে পারিবারিক জীবন
ঢাকা বাড পাবলিকেসন্স, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রীঃ

অনুঃ আলম, শামসুল (অনুঃ) ঃ ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা
বাংলাদেশ প্রগ্রেসিভ এন্টারপ্রাইজ, ১ম সংস্করণ ঢাকা, ১৯৯৫ খ্রীঃ

ইউসুফ, মাহমুদুল হাসান, (অনুঃ) ঃ মুসলিম নারী প্রসঙ্গ
দারুল ইহ্সান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা-২০০০ খ্রীঃ

ইবনে হাম্বল, আহমদ ঃ মুসনাদে দারিমী, ষষ্ঠ খন্ড, কায়রো, ১৯৩০ খ্রীঃ

ওবায়দী, ইসহাক ঃ যুগে যুগে নারী, শান্তিধারা প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৭ খ্রীঃ

খান, আব্বস আলী ঃ সাইয়ের আবুল আ'লা মওদূদী, ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রীঃ

খালেক, আব্দুল (অনুঃ) ঃ সৌভাগ্যের পরশমনি
১ম খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
ঃ সৌভাগ্যের পরশমনি ৩য় খন্ড (বিনাশ খন্ড) ই, ফা, বা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৪.
ঃ নারী, ঢাকা দীনী পাবলিকেশন্স, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রীঃ

জালালুদ্দিন উমরী, সাইয়েদ, মাওলানা ঃ ইসলামী সমাজে নারী, অধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

গাযালী (র), ইমাম ঃ ইয়াহ্ইয়া-উল-উলূম, হালাবী প্রেস, কায়রো, ১৯৫৮ খ্রীঃ

দেলোয়ার হোসেন, আবূ মোহাম্মদ, ড. ঃ সভ্যতার ইতিহাস
১ম সংস্করণ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রীঃ

নুরুল ইসলাম, মুহাম্মদ ঃ বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ) ২য় খন্ড,
ঢাকা মম প্রকাশ, ১ম সংস্করন ২০০০ খ্রীঃ

নুরুল হুদা, মোহাম্মদ (অনুঃ) ঃ নারী; ইসলামের দৃষ্টিতে
সিন্দাবাদ প্রকাশনী, ২য় সংস্করন, ঢাকা-১৯৯০ খ্রীঃ

নুরুর রহমান, মাওলানা, (অনুঃ) ঃ কিমিয়ায়ে সা'আদত. ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী-২০০৬।

ফারুক, আকরাম, (অনুঃ) ঃ নারী অধিকার বিভ্রান্তি ও ইসলাম,
ঢাকা, শতাব্দী প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ২০০৭ খ্রীঃ

ফজলুর করীম, মাওলানা ঃ তাকারীর-এ-সহীহ্ বুখারী (১ম খন্ড), ফেরদৌসিয়া লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম-১৯৬৩।

ফজলুর রহমান, এ, কে, এম, মুন্সী, (অনুঃ) ঃ গুনীয়াতুল তালেবীয়া, বাংলাদেশ তাজ (কোং) ১ম সং. ২০০৩।

মানবেন্দু, বন্দ্যোপাধ্যায়-শাস্ত্রী, ড. ঃ মনুসংহিতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলিকাতা, ২০০০ খ্রীঃ

মাজহারুল ইসলাম, অধ্যাপক ঃ পর্দা প্রগতির সোপান
খুরশিদ আরা ইসলাম প্রকাশনা, শেরপুর, ১ম সংস্করণ-১৯৯৩ খ্রীঃ

অনুঃ মঈনুদ্দীন তৈয়াবপুরী, মুফতী, (অনুঃ) ঃ নারী মুক্তি কোন পথে,
বাড পাবলিকেশন, ১ম সংস্করন, ঢাকা-২০০০ খ্রীঃ

মিত্র, সুবল চন্দ্র ঃ সরল বাংলা অভিধান
কলিকাতা, নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ, ৮ম সংস্করণ, ১৯৮৪ খ্রীঃ

মহিউদ্দিন খান, মাওলানা (অনুঃ) ঃ তাফসীর মারেফুর কোরআন, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

শাহ আলম হারীবী, মুহাম্মদ, মীর খন্দ ঃ রওয়াতিস সাফা ফী সীরাতিল আম্বিয়া, ২য় খন্ড, নওল কিশোর প্রেস, লক্ষৌ, ইন্ডিয়া;

শাহনেওয়াজ এ, কে, এম ঃ বিশ্বসভ্যতা, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা ৪র্থ সং.-২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

রহমতুল্লাহ, মাওলানা ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃজাতির মর্যাদা ও অধিকার রইসুল মু' আল্লিমীন সংকলন, ঢাকা ৪র্থ সংস্করন, ১৯৯৯ খ্রীঃ

রহমান, তানযীলুর ঃ মজমু আ'ই কাওয়ানীনে ইসলাম, ১ম খন্ড, করাচী-১৯৬৫ ।

সম্পাদনা পরিষদ ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ২১ খন্ড, ঢাকা ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ খ্রীঃ

সম্পাদনা বোর্ড ঃ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য়' খন্ড, ইসলামী ফাউন্ডেশেন বাংলাদেশ, ১৯৮২ খ্রীঃ

প্রকাশিত যেসব ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে

A.L. Bashu : The Wonder that was India, Fontana, 1971.

Ameer Ali : The Sprit of Islam, Kutub Khana Ishayat. UL-Islam (Reg) Churiwalia. (India)

Alfred Guillaume : The Life of Muhammad, Oxford University. Press-1955.

Abdur Rahim : The principles of Mohammedan Jurisprudence. London-1911.

Asif Fyzee : Out Lines of Muhammadan Law, 2nd Ed. Oxford-1955.

Bible- : The new testament in today's English Version 4th Edition. (Edit) American Bible society, Newyourk-1976.

Bible –Deuteronomy :

Bible –Corinthians (VII) :

Bible-Mark, X :

Bible Genesis :

Bible-1 :

Bible-Timothy. II :

Cleugh, James : Love Locked out. London-1963.

Dr. Westermark : The future of Marriage in western Civilization.

Encyclopaedia Britanica, Vol. IV-V.

Fida Hussain Malik : Wives of the Prophet, Ashraf Publications Lahor, 4th Ed. 1983.

Germaine Greer : Female Eunuch, Mccraw Hill-1971.

Jones, Beveu : woman in Islam, Lucknow.1941.

Klansner, Joseph : From Jesus to Paul, London-1964.

Katrak, Jamshid : Marriage in Ancient Iran, Bombay-1965.

Libra : Woman Hood and the Bible, New York.

Lapiunsky : The Development of Personality in Women.

Lods, Adalphe : Isreal, London, 1948.

Dhaka University Institutional Repository

Moscati, Sabation : Ancient Semitic civilization, London 1957.

Nazhat Afza and Khurshid Ahmad : The position of Women in Islam. Book Publications, kuwait, 1982.

Nazirah Zein Ed-Din Edited by Aziah Ali-Hibri : Woman and Islam, Pergamon Press, Oxford, England.

O'Leary, De Lacy : Arabia Before Muhammad, London 1929.

Prof. Indra : Status of Woman in Mohabharat.

Pospishil, Victor : Divorce and Marriage, London.

Said Abdullah Seif Al-Hatimy : Woman in Islam, Islamic Publication Ltd. Lahor. Pakistan, oct.1979.

Report of the Commission, Marriage, Divorce and The Church, London, 1971.

Rustum and Zurayk : History of the Arabs and Arabic Culture, Beirut 1940.

Shaner, Donald W. : A Christian View of Divorce, Leiden-1969.

Sir Ronald K. Wilson : Anglo-Muhamadan Law, 4th Ed. Londion-1912.

Smith, W : Kinship and Marriage in Early Arabia, London-1907.

Ramish Chandra Majumdar : The Ideal and position of Indian women in Domestic life,

: Great Women of India (Ed) Swami and Mazumdar.

The Jewish Encyclopedia, Vol. XII.

Thomas Bertran : The Arabs, London. 1937.

Ibn Kathir Al-Bidaya, Vol-42.

Al-Qutubi Al-Zami, Vol-5.

U. May OUNG : Buddhist Law, Part-1.

যেসব পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, রিপোর্ট, গেজেটিয়ার ও ভাষণ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে

আবদুল গফুর, অধ্যাপক, সম্পাদিত ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা ঢাকা, ই, ফা, বাং, ১৯৮৪।

আলী মাদানী, হুশাং, সম্পাদিত ঃ আলোর স্মারক, ইমাম খোমেইণী (র)-এর ১ম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে ঢাকা, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯০ খ্রিঃ

আবদুল মতিন, মুহাম্মদ ঃ মানবাধিকার, সচেতনতা সহায়িকা। ঢাকা, সি, আর, ডি প্রকাশক, সেপ্টেম্বর-১৯৯৯।

আবূ রিদা (সম্পাদক) ঃ ইসলাম ও নারী (ইসলামী গবেষণা পত্রিকা) ১ম বর্ষ, বিশেষ সংখ্যা, লেখা প্রকাশনী, কলকাতা, (ফ্রেব্রুয়ারী, ১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধ

আবদুর রহীম, মুহাম্মদ ঃ মার্কসবাদ ও ইসলা, মাওলানা আবদুল রহীম (রহ.) স্মরনিকায় উপস্থাপিত, ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামী যুবশক্তি, ১৯৯১ খ্রি.

ঃ ইতিহাসের গতিশীলতায় হিজরাত ও জিহাদের অবদান আলোর পথিক সংকলনে উপস্থাপিত। ঢাকা, বাংলাদেশ জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া, ১৯৯০ খ্রি.

ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা ঢাকা, সাপ্তাহিক জাহানে নও, ১৯৯০ খ্রি.

ঃ উন্নয়ন ও ইসলামী প্রেক্ষিত, ইসলামী অর্থনীতি শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থে উপস্থাপিত ঢাকা, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর, ২০০৪ খ্রি.

পত্র-পত্রিকা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা ঃ ঢাকা, ইসলামিক ডেশন বাংলাদেশ, (এপ্রিল-জুন), ১৯৮৪ খ্রি.

নিউজ লেটার ঃ ঢাকা, কালচারাল কাউন্সেলরের দপ্তর, ইরান দূতাবাস, ২৮তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, (মার্চ-এপ্রিল)-২০০৬।

উম্মাহ ডাইজেস্ট ঃ ঢাকা, অক্টোবর, ১৯৮৭ খ্রি.

দাওয়াত ঃ ইসলামী ঐক্য আন্দোলন বুলেটিন ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ২০০৫ খ্রি.

মদীনা ঃ ঢাকা, অক্টোবর, ১৯৮৭ খ্রি.

জাহানে নও ঃ ঢাকা, ৯ মার্চ, ১৯৯০ খ্রি.

জিহাদ ঃ ঢাকা, ৫ অক্টোবর, ১৯৯০ খ্রি.

সংস্কার ঃ ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ খ্রি.

দৈনিক জনতা ঃ ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ১৫, ১৯৮৮ খ্রি.

দৈনিক আদাজ ঃ ঢাকা, ২ অক্টোবর, ১৯৮৭ খ্রি.

দৈনিক ইত্তেফাক ঃ ঢাকা, ২৬ মার্চ, ১৯৯০ খ্রি.

দৈনিক ইনকিলাব ঃ ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০ খি.

আর্য্য গেজেট ঃ ইন্ডিয়া, ২২ নভেম্বর, ১৯৩০.

The Daily Observer : Dhaka, 2nd October, 1987.

Thomas J. Cottle : The Sexual Revolution and the young. The New York times Magazine. 26th November, 1972.

--------- সমাপ্ত ---------